রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে কল্লোলগোষ্ঠী ও আধুনিকতাবাদী সাহিত্য আন্দোলন

(THE KALLOL GROUP AND THE MODERNIST LITERARY MOVEMENT IN THE VIEW OF TAGORE)

এম.ফিল ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ-২০১৪

তত্ত্বাবধায়ক:

আবুল কাসেম ফজলুল হক

সংখ্যাতিরিক্ত অধ্যাপক

বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

গবেষক:

মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম

এম.ফিল গবেষক

রোল নং ০৪

রেজি নং ৩০১

শিক্ষা বর্ষ: ২০০৯-২০১০

বাংলা বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

মার্চ, ২০১৪

gLeÜ

শিরোনাম: রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে কল্লোলগোষ্ঠী ও আধুনিকতাবাদী সাহিত্য আন্দোলন।

গবেষক: মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম

গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক: আবুল কাসেম ফজলুল হক

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে নবযুগের সূচনা হয়েছিল কল্লোল পত্রিকার প্রকাশের মাধ্যমে। এরই ধারাবাহিকতায় কালি কলম, প্রগতি, কবিতা প্রভৃতি পত্রিকাকে কেন্দ্র করে আধুনিকতাবাদী সাহিত্য আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের প্রয়োজনে কল্লোলগোষ্ঠীর ভূমিকা যথেষ্ঠ গুরুত্বের দাবীদার। এরা রুপ-রীতির দিক থেকে বাংলা সাহিত্যে নতুনত্ব ও উৎকর্ষের পরিচয় দেয়া আর অন্যদিকে জীবন সর্ম্পকে নৈরাশ্যবাদ ও নেতিবাদকে রুপায়িত করেছে। রবীন্দ্রনাথের সাথে তাদের কখনও নৈকট্য ছিল কখনও বা দূরত্ব ছিল। এখানে রবীন্দ্রনাথের আধুনিকতাবাদী শিল্পদৃষ্টি ও অন্যান্য শিল্প সাহিত্যিকদের মনকে যেভাবে আড়োড়িত করেছে সে ভাবনা ভাষ্যকে উপস্থাপনের প্রয়াস চালানো হয়েছে।

c_g Aa¨vq:

বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতাবাদী সাহিত্য ভাবনা চিন্তা কীভাবে অনুপ্রবেশ করল তার চিত্র উপস্থাপনের জন্য পশ্চিমা দেশীয় সাহিত্য ভাবনা কয়েকজন কবি, সাহিত্যিকের ভাবনা তুলে ধরা হয়েছে। সেই সাথে আধুনিকতা, আধুনিকতাবাদ নিয়েও মতামত উল্লিখিত হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহিত্য সম্পর্কিত মত ও ত্রিশোত্তর কবিদের চিন্তাকে সংক্ষেপে দেখানো হয়েছে।

(ক) পরিচ্ছেদে কল্লোল পত্রিকা বাংলা সাহিত্যে কী নিয়ে এলো,কেমন তার প্রভাব-প্রতিক্রিয় হল তার চিত্রালেখ্য দেয়া হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

(খ) পরিচ্ছেদে প্রগতি, কালি কলম প্রভৃতি পত্রিকার ভূমিকা নিয়ে ষাটের দশকে যে আলোড়ন সৃষ্টি করা হয়েছে তার কথাই বলা হয়েছে।

(গ) পরিচ্ছেদে ঢাকায় আধুনকিতাবাদী সাহিত্য আন্দোলনের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া হিসেবে যা করেছে তার চিত্রভাষ্য দেয়া হয়েছে। প্রতিক্রিয়ায় শনিবারের চিঠির সজনীকান্তের দাসের ভূমিকা অগ্রনী ছিল। নীরোদচন্দ্র চৌধুরীসহ আরো অনেক চিন্তা ভাবনা দেখানো হয়েছে।সেই সাথে রবীন্দ্রনাথের সাথে অতি আধুনিকতাবাদী সাহিত্যিকদের বিরোধের প্রেক্ষিতে বিচিত্রা ভবনের সালিশি বৈঠকের কথা ফুটে উঠেছে। প্রাসঙ্গিকভাবেই

(ঘ) পরিচ্ছেদের আধুনিকতাবাদীর প্রতি রবীন্দ্রনাথের মনোভাবের চিত্র অনেক পূর্ব থেকে যাচাই করা হয়েছে। সেক্ষেত্রে সাথে তার চিঠি-পত্র-প্রবন্ধ নিবন্ধের মাধ্যমে মতামত ব্যক্ত করেছেন তাও তুলে ধরা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের রচিত কাব্য, উপন্যাস, গল্প, নাটকে আধুনিকতাবাদীদের প্রতি কীরকম মনোভাব রচিত হয়েছিল তারও চিত্র উপস্থাপনের প্রয়াস চালানো হয়েছে।

wØZxq Aa¨vq:

আধুনিকতাবাদী সাহিত্য আন্দোলনের পুরোধা বুদ্ধদেব বসুর কবিতা পত্রিকার ভূমিকার কথা খুবই সুচারুভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে ঢাকায় আধুনিকতাবাদী সাহিত্য আন্দোলনের স্যাড জেনারেশন, স্বাক্ষর ও কণ্ঠস্বর পত্রিকার ভূমিকার ইতিহাস বলা হয়েছে।

(ক) পরিচ্ছেদে আধুনিকতাবাদী সাহিত্য আন্দোলনের প্রবক্তরা যে তাদের সাহিত্যকর্ম নিয়ে বেশ উত্তেজিত থাকতো এবং উচ্চকিত প্রশংসা করত তারই বিবরণ সংক্ষিপ্তাকারে দেয়া হয়েছে।

(খ) পরিচ্ছেদে আধুনিকতাবাদী লেখকদের মানসপ্রবনতার বৈশিষ্ট্যাবলী তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। উপসংহারে আধুনিকতাবাদের বৈশিষ্ট্যাবলী মূর্তায়িত করার প্রচেষ্টা করা হয়েছে। আধুনিকতাবাদ আমাদের মধ্যে কিভাবে হয়েছে এবং কতটা যুক্তিযুক্ত বলে হয়েছে তারই আলোকপাত করা হয়েছে। এতে পঞ্চ পাণ্ডবের ভূমিকাও সংক্ষেপে ব্যক্ত হয়েছে। আধুনিকতাবোধ দেশীয় প্রেক্ষিতে কীভাবে প্রযুক্ত হলো তার কথা উপস্থাপিত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

PZ_ Aa¨vq

(ক) পরিচ্ছেদে পাশ্চাত্যে আধুনিকতাবাদ থেকে উত্তরাধুনিকতাবাদে যেভাবে রুপান্তর হল তার আনুপুর্বিক বর্ণনা দেয়া হল।

(খ) পরিচ্ছেদে বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতাবাদ থেকে উত্তরাধুনিকতাবাদে কোন পথে বিবর্তিত হল তার দৃষ্টান্ত সহযোগে আলোচনা করা হয়েছে। সর্বশেষ চতুর্থ অধ্যায়ে বাংলা ভাষায় আধুনিকতাবাদী সাহিত্য আন্দোলনের ফলে যে নতুন রূপরীতির পরীক্ষা চলছে তারই ইতিবৃত্ত দেয়া হল। এগুলো যথাসাধ্য ভালমত করে উপস্থাপন করতে সচেষ্ট হয়েছি।

M‡elK:
মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম
এম.ফিল গবেষক
রোল নং ০৪
রেজি নং ৩০১
শিক্ষা বর্ষ: ২০০৯-২০১০

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

mwPcÎ

মুখবন্ধ----------ii-iv

প্রত্যয়নপত্র------ v

সূচিপত্র---------- vi

c_g Aa¨vq: 7-152

ভূমিকা: ইউরোপে আধুনিকতাবাদী সাহিত্য আন্দোলন ও বাংলায় কল্লোলগোষ্ঠীর আত্মপ্রকাশ ৭-৫৩

ক) কল্লোল পত্রিকা ও তার প্রভাব---------- ৫৪-৭১

খ) প্রগতি, কালি-কলম প্রভৃতি কল্লোলের সহযোগী পত্রিকাসমূহের ভূমিকা----- ৭২-৯১

গ) ঢাকায় আধুনিকতাবাদী সাহিত্য আন্দোলনের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া---------- ৯২-১০৩

ঘ) আধুনিকতাবাদীদের প্রতি রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গি ও মনোভাব---------- ১০৪-১৫২

wØZxq Aa¨vq: 153-167

আধুনিকতাবাদী সাহিত্য আন্দোলনের বিকাশ কবিতা পত্রিকা ও বুদ্ধদেব বসুর ভূমিকা ১৫৩-১৬৭

ZZxq Aa¨vq: 168-190

ঢাকায় স্যাড জেনারেশন, সাক্ষর ও কণ্ঠস্বর প্রভৃতি পত্রিকার ভূমিকা----- ১৬৯-১৮২

ক) প্রচার আন্দোলন---------- ১৮৩-১৮৪

খ) আধুনিকতাবাদী লেখকদের মানসপ্রবণতা---------- ১৮৫-১৯০

PZ_ Aa¨vq: 191-230

উপসংহার---------- ১৯১-১৯৬

(ক) পাশ্চাত্যে আধুনিকতাবাদ থেকে উত্তরাধুনিকতাবাদ---------- ১৯৭-২১৩

খ) বাংলায় আধুনিকতাবাদ থেকে উত্তরাধুনিকতাবাদ---------- ২১৪-২২৫

গ) বাংলা ভাষায় আধুনিকতাবাদী সাহিত্য আন্দোলনের অবদান---------- ২২৬-২৩০

MšcÄx 231

Dhaka University Institutional Repository

মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম আমার তত্ত্বাবধানে "রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে কল্লোলগোষ্ঠী ও আধুনিকতাবাদী সাহিত্য আন্দোলন" বিষয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.ফিল ডিগ্রির জন্য এই অভিসন্দর্ভ রচনা করেছেন। এই অভিসন্দর্ভ বা এর কোন অংশ কোথাও প্রকাশ করা হয়নি এবং কোন ডিগ্রির জন্য কোথাও উপস্থাপন করা হয়নি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.ফিল ডিগ্রির জন্য এটি পরীক্ষণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

(আবুল কাসেম ফজলুল হক)
গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক
সংখ্যাতিরিক্তি অধ্যাপক
বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

c_g Aa¨vq

fwgKv

K) K‡jøwj cwÎKv I Zvi cfve

L) cMwZ, Kwj-Kjg cfwZ K‡jøv‡ji mn‡hvMx cwÎKvmg‡ni fwgKv

M) XvKvq AvawbKZvev‘x mvwnZ¨ Av‡›‘vj‡bi weiæ‡× cwZwµqv

N) AvawbKZvev‘x‡‘i cwZ iex›‘bv‡_i ‘wófw½ I g‡bvfve

fwgKv:

BD‡iv‡c AvaywbKZvev'x mvwnZ¨ Av‡›`vjb I evsjvq K‡jøvj‡Mvôxi AvZ¥cKvk

বাংলা সাহিত্যের সমৃদ্ধি ও পুষ্টিসাধনে পশ্চিমাদেশীয় সাহিত্যের অবদান সর্বজনবিদিত। বিভিন্ন গোষ্ঠী ও সাহিত্যসেবীদের উদ্যোগে বাংলা সাহিত্যের জগতে বহুবিচিত্র বর্ণিল সাহিত্যকর্মের সৃজন হয়েছে। তৈরী হয়েছে বহু সৃজনশীল লেখকের। তাদের লালন-পালন করেছে কিছু মননশীল ও অভিজ্ঞ সাহিত্য পত্রিকা সম্পাদকগণ। বিচক্ষণ এই সম্পাদকগণের প্রজ্ঞার আলোকেই দিকবদল ঘটেছে। বাংলা সাহিত্যের সময় হিসেবে উনিশ শতকের শুরু থেকে বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত সে ধারা পূর্ণ জোয়ারের মত অক্ষুণ্ন ছিল। ক্রমে সে ধারা ক্ষীয়মান বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন' (১৮৭২), 'ভারতী' (১৮৭৭) র প্রভাব শেষে হয়ে এসেছিল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সম্পাদিত নতুন আঙ্গিকে 'বঙ্গদর্শন'। এলো 'প্রবাসী', (১৯০১) 'ভারতবর্ষ', (১৯১৩) 'সবুজপত্র', (১৯১৪) 'নারায়ন', 'কল্লোল' (১৯২৩) ও 'কালি কলম' (১৯২৬)-এর যুগ।

বাংলা সাহিত্যে 'কল্লোল' (১৯২৩) পত্রিকার মাধ্যমে সূচনা হয়েছিল এক নবযুগের। এ পত্রিকাকে কেন্দ্র করে একদল লেখকগোষ্ঠীর উত্থান ঘটে। এর পিছনে অনুঘটক হিসাবে বিভিন্ন কারণ বিবেচনা করা হয়ে থাকে। কেউ কেউ কল্লোলের লেখকগণের যুগটিকে স্বীকার করতে অনিচ্ছুক[১], কেউ বা বলেছেন এরা পলায়নবাদী মানসিকতার অধিকারী।[২] কারো মতে, তারা সর্বগ্রাসী প্রতিভাধারী ব্যক্তিত্ব রবীন্দ্রনাথের অনুকৃত না হবার চেষ্টায় রত হবার বাসনায় ভিন্নপথে চলতে ইচ্ছুক ছিলেন। ক্ষেত্র বিশেষ তারা সাফল্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন। কিন্তু শিল্প সাহিত্য জীবন সম্পর্কে নৈরাশ্যবাদ ও নেতিবাদকে রূপায়িত করার প্রচেষ্টাটি সাহিত্যের কর্ণধার বিবেচিত ব্যক্তিগণ সহজে সাধুবাদ জানাননি। এই নৈতিবোধ ও বৈনাশিকতার ব্যাপারটি সমাজ সভ্যতায় ঐতিহ্যের সুপ্রাচীন থেকে অনুকৃতদের দ্বারা কখনও সংবর্ধিত হয়েছে। কখনও বা তিরস্কৃত হয়েছে। বস্তুত কথিত আধুনিকতাবাদীদের এই অবক্ষয়চেতনা ও নৈতিকতাবাদের প্রতি সংযুক্তি এবং দেশ মৃত্তিকার ঐতিহ্যের প্রতি তাদের দূরবর্তিতা বাংলাভাষী জনগোষ্ঠীর অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতিহীন বলা যায় বাস্তবতাবর্জিত।

কল্লোলগোষ্ঠী যখন বাংলা সাহিত্যে যে রূপকল্প নিয়ে হাজির পশ্চিমা ইউরোপীয় সমাজে আধুনিকতাবাদী সাহিত্যের স্বরূপটি আমাদের জেনে নেয়া আবশ্যক।

আধুনিকতা শব্দের ইংরেজি প্রতিশব্দ হল Modernism। সাম্প্রতিক জ্ঞানের জগতে, সাহিত্যে ও শিল্পকলার জগতে ইংরেজির অনুসরণে আধুনিকতা ও উত্তরাধুনিকতা কথাগুলো খুব উচ্চারিত হচ্ছে। 'আধুনিকতাবাদ' শব্দটি আভিধানিক ও বুৎপত্তিগত অর্থ দিয়ে বুঝতে গেলে প্রকৃত অর্থ পাওয়া যাবে না। সংশ্লিষ্ট মতানুসারীরা কী-অর্থে কোন কথা ব্যবহার করেন, সেটাই আমাদের নর্খবেঞ্জন স্মরণে রাখতে। উদ্দেশ্য ও ফলাফলও বিচার করতে হবে। আধুনিকতার সংজ্ঞার্থ নিয়ে কবি-সমালোচক-পণ্ডিতদের মধ্যে সীমাবদ্ধতা বিদীর্ণ করে বিপুলায়তন, বিচিত্র ও পরিবর্তনশীল অনুভূতিগত ব্যঞ্জনা অর্জন করেছে। 'কবিতা' সম্পর্কে কবি-সমালোচক-পণ্ডিতদের মধ্যে মতান্তর থাকলেও শিল্পের একটি সূক্ষ্ম আঙ্গিক হিসেবে কবিতার একটি সর্বজনীন গ্রহণযোগ্যতা সৃষ্টি হয়েছে। এক্ষেত্রে 'আধুনিক' শব্দটির আভিধানিক অর্থ-অন্বেষণ করা যেতে পারে:

১) আধুনিক, সাম্প্রতিক, ইদানীন্তন, নব্য, বর্তমান কালের। অধুনা শব্দ+ষ্ণিক ভাবার্তে।[৩]

২) আধুনিক [অধুনা (এক্ষণে) + ইক (ভাবর্থে) [ভাবর্থে) [বিণ, ইদানীন্তন; বর্ত্তমানকালনি; অধুনাতন। ২ অল্পকালীন; সম্প্রতি। ৩ নব্য।[৪]

৩) আধুনিক-বিণ, [অধুনা+ইক (ঠঞ) 'তত ভব' অর্থে -----।

৪) অধুনাভব, ইদানীন্তন, অধুনাতন, সাম্প্রতিক। ২। আর্বাচীন, নব্য।[৫]

৫) আধুনিক বিণ, বর্তমানকালীন, সাম্প্রতিক, হালের, অধুনাতন, নব্য। [সং অধুনা+ইক][৬]

৬) আধুনিক [স] ১ বিন হালের। ২ বিন নতুন। ৩ বি এ-কালের[৭]

অভিধানের অধিকতর আশ্রয় গ্রহণ সম্ভব, কিন্তু এর ফলে আমাদের ধারণায় নবতর কোন প্রত্যয় সংযোজনের সম্ভাবনা স্বল্প। কারণ, প্রতিটি ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে 'আধুনিক' শব্দটি সমকালীনতার সমার্থক হিসেবেই বিবেচিত হয়েছে। কিন্তু 'কবিতা' শব্দটির বিশেষণ হিসেবে তার অব্যবহিত পূর্বে ব্যবহৃত হওয়ার ফলে তিরিশের দশক থেকেই শব্দযুগল অভেদাত্মক একটি পরিভাষা হিসেবেই ব্যবহৃত হচ্ছে; এক অর্থে তা সুনির্দিষ্ট হয়েছে অন্য অর্থে তা বিচিত্র ও অনন্ত অর্থদ্যোতক হয়ে উঠেছে।

এটা স্পষ্ট যে, আধুনিক শব্দবন্ধের একটা কালগত অভিধা নিশ্চয়ই হয়েছে। কিন্তু কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যখন বলেন, 'পাঁজি মিলিয়ে মডার্নের সীমানা নির্ণয় করবে কে?' এটা

কালের কথা ততটা নয় যতটা ভাবের কথা' কিংবা 'নদী সামনের দিকে সোজা চলতে চলতে হঠাৎ বাঁক ফেলে। সাহিত্যিও তেমনি বরাবর সিধে চলে না। যখন সে বাঁক নেয় তখন সেই বাঁকটাকেই বলতে হবে মডারন। বাংলায় বলি আধুনিক। এই আধুনিকটা সময় নিয়ে নয়, মর্জি নিয়ে।'[৮]

যখন তাঁর এ বক্তব্যের সতর্ক বিশ্লেষণে এটা অবশ্যই ধরা পড়ে, আধুনিকতার স্বরূপ উন্মোচনে কবি কালগত দিকটাকে শুধু গৌণই মনে করেননি, তাকে অস্বীকারের চেষ্টাও সম্ভবত তাতে নিহিত।

কিন্তু আসলেই কি ব্যাপারটা তাই? এত সহজ রকমের কিছু? ব্যুৎপত্তির দিক দেখলে, 'আধুনিকতা' কি সাম্প্রতিকতাকে বাদ দিয়ে? অন্যভাবে বললে, যুগধর্মকে অস্বীকার করে আদৌ কি আধুনিকতা অগ্রসর হতে পারে?

এককথায় এর উত্তর হবে, না। পারে না বলেই আমাদের বিবেচনায় 'আধুনিকতা' বিচারে কালিক বিষয়টা প্রথম, যদিও প্রধান নয়। সুমিতা চক্রবর্তীর ভাষায় বলা যায়, "আধুনিকতা শব্দটি আপেক্ষিক। কোনো নির্দিষ্ট কাল-সীমায় তাকে বাঁধা যায় না।:" কিন্তু পরক্ষণেই তিনি মনে করিয়ে দেন, " আধুনিকতা' শব্দটির অর্থ একদিকে যেমন নির্দিষ্ট সময়-সীমা দ্বারা আবদ্ধ নয়, তেমনি প্রতি যুগেই সেই বিশেষ সময়ের প্রগতিমনস্কতার চিহ্নসমূহ সেই যুগের রচনায় থাকবে-এই প্রত্যাশা থাকায় আধুনিকতার ধারণাকে সম্পূর্ণভাবে নির্দিষ্ট কাল-সংস্পর্শহীন-এমন কথাও বলা যায় না।"[৯]

মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহর একটা নাতিদীর্ঘ উদ্ধৃতি উৎকলন করা হলো। তিনি যথার্থই বলেছেন, "আধুনিক শব্দটির সাথে কালগত সম্পর্ক তাকলেও বস্তুত: কাব্যবিচারে এর চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যই বিচার্য: কারণ কাল পরম্পরায় আধুনিকতার এমন কোনো বৈশিষ্ট্য সন্ধান সম্ভব নয়, যা একটি সীমাবদ্ধ সময়-পরিধির মধ্যেই মূর্ত হয়েছে। সুতরাং এক অর্থে সমকালীনতাকে আধুনিকতা বলে ধরে নিলেও এর চারিত্র বৈশিষ্ট্যের দাবি খারিজ হয়ে যায় না। উপরন্তু প্রকৃতি ও চরিত্রের দিক থেকে আধুনিক কথাটির ব্যবহার নানা দিকে থেকেই অর্থবহ এবং ব্যঞ্জনাধর্মী। সুতরাং যে কোনও রচনাকে কালগত অর্থে আধুনিক বলে চিহ্নিত করলেও চরিত্র লক্ষণের দিক থেকে তা যদি পুরানোগন্ধী হয়, তা হলে শুধুমাত্র কালগত

কারণেই তা আধুনিকতার দাবীদার হতে পারে না। কাল পরিধির বিচারে আধুনিক রচনা বস্তুত: এ কালেই সৃষ্টি, কিন্তু এর চারিত্র লক্ষণ শুধুমাত্র সময়কালীন পরিচয়ই বহন করে না, উপরন্তু আধুনিকতা এমন কিছু গুণান্বিত হয়ে প্রকাশ পায় যা চারিত্র ধর্মেই আধুনিক। এই বিশেষ ধর্ম এবং চারিত্রই রচনাকে অন্যান্য যুগের বা সময়-পরিধির সৃষ্টি থেকে পৃথক করেছে এবং সমকালীন জীবনের অন্বয়ধর্মী করে তুলেছে। আঙ্গিকের ক্ষেত্রে অবশ্য আধুনিকতা সময়-কাল নির্ভর, কারণ রচনার মৌল প্রেরণা বা আবেদন সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে ভিন্ন রূপ ধারণ না করলেও রচনার আঙ্গিক বিবর্তন সমকালধর্মী। কিন্তু আধুনিকতার বিচারে আঙ্গিক বিবর্তন সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হলো আঙ্গিক বৈশিষ্ট্যই আধুনিকতার একমাত্র লক্ষণ নয়, এ কারণেই আধুনিক বিষয়বস্তুর পরিবাহক না হয়ে আধুনিকতার আঙ্গিক যদি মধ্যযুগীয় চিন্তাভাবনার বাহক হয় তা হলে তাকে আধুনিক রচনার কোনও মানদণ্ডেই উত্তীর্ণ বলা যাবে না। সুতরাং সাহিত্যে আধুনিকতার প্রশ্নটি এ দৃষ্টিকোন থেকেই সতর্ক পর্যালোচনার অপেক্ষা রাখে, কারণ আধুনিকতার চারিত্রে নির্ণয়ের বিভ্রান্তি মূলত: আধুনিক রচনার মূল্য নির্ণয়ের প্রশ্নটিকে জটিল করে তুলবে এবং মূল্যবোধকে করবে খণ্ডিত। এ কারণে কোন রচনার আধুনিকতা নিণয়ের প্রশ্নে 'আধুনিক' শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থের সাথে উল্লিখিত রচনার চরিত্রগত স্বাধর্মের অনুসন্ধানই সম্ভবত প্রকৃষ্ট উপায়। এ অনুসন্ধানের পেছনে আধুনিক চরিত্রের পটভূমি বিশ্লেষণও অত্যাবশ্যক।"[১০]

প্রসঙ্গত 'আধুনিকতা' ও 'সাম্প্রতিকতা'র স্বরূপ উদঘাটন ও এ দু'টোর মেলবন্ধনের যে চেষ্টা ড. হুমায়ন আজাদ করেছেন, তাও তুলে ধরা হলো। তাঁর ভাষায়, "আমি কোনো কালের আন্তর রূপ উদঘাটনকেই বলতে চাই আধুনিকতা। সাম্প্রতিকতা হচ্ছে কোনো একটি বিশেষ কালের বাহ্যরূপ, আর আধুনিকতা হচ্ছে ওই কালের আন্তররূপ। ... আধুনিকতা এবং সাম্প্রতিকতা পরস্পর সংযুক্ত, তাই সাম্প্রতিকতারহিত আধুনিকতা অসম্ভব, এবং কেবলমাত্র সাম্প্রতিকতাই আধুনিকতা নয়। ... কবিতায় আধুনিকতা ও সাম্প্রতিকতা ক্রিয়াশীল থাকে বক্তব্যে এবং আঙ্গিকে, কবিতার উভয়ভূমিতে। আধুনিকতা ও সাম্প্রতিকতাকে আমি যেমন সংযুক্ত মনে করি, তেমনি সংযুক্ত বলে মনে করি বক্তব্য ও আঙ্গিককে: উভয়ের শুদ্ধ সম্মিলনেই যথার্থ আধুনিক কবিতা সৃষ্টি হতে পারে।"[১১]

শ্রীভূদেব চৌধুরীর মতে, "সাম্প্রতিকতা' আসলে কালবাচক অভিধা, কিন্তু 'আধুনিকতা' একটি 'মর্জি'। আর মানুষ রয়েছে সেই মানসিকতার আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে-মানবিক কৌতূহল, মানবিক জিজ্ঞাসা, মানবিক সমস্যা নিয়ে। চেতনার সর্বাত্মক আলোড়নই আধুনিক মেজাজের সারাৎসার।"[১২]

আজকের এই শতধাভঙ্গুর পৃথিবীতে কেন্দ্রাতিগ সুস্থিরতা আধুনিক মানুষের আরাধ্য নয়, বরং বিচ্ছিন্ন, অনিকেত মানসিকতাই তার ধ্যানের জগৎ-অবধারিত নিয়তি। নৈরাজ্যকর অসহায়ত্ব ও সচেতন আত্মপীড়ন তার জীবনের পরিধিকে করেছে ছিন্নমূল, গন্তব্যচ্যুত; আর তাই অস্তিত্বের গাঢ় ভিত্তিভূমি অন্বেষণে এবং এককালে তার প্রাপ্তিমূলে তাকে নির্মাণে আধুনিক মানুষ প্রতিনিয়ত তৎপর ও পরিশ্রমসন্নিপাতী। ব্যক্তির ক্ষেত্রে যথার্থ আধুনিক তিনিই, যদি কখনো বহির্জগতের আলোড়নে-আঘাতে ভেঙ্গে পড়েন না, নুয়ে পড়েন না, বিনষ্ট হন না; তার বহিরাবয়ব পীড়িত হলেও অন্তর্বৃত্ত সত্তা বা চৈতন্য থাকে চিরভাস্বর, সক্রিয়। আধুনিক কবির জন্যে এটা আরও জরুরি, আরও প্রাসঙ্গিক।

সৌরীন্দ্র মিত্রের ভাষায় বলা যায়, "আধুনিকতার একটা ব্যাপক অর্থ আছে, সেটা হ'ল আধুনার সঙ্গে অর্থাৎ বর্তমানের সঙ্গে চৈতন্যের যোগ। এই অর্থে যথার্থ কবিমাত্রেই আধুনিক কবি এবং যথার্থ কবিতা মাত্রেই আধুনিক কবিতা। বলা যায় আধুনিক না-হওয়াটা যথার্থ কবির পক্ষে সম্ভবই নয়। তার কারণ, সৃষ্টির সঞ্চয় এবং সৃষ্টির বেগ তিনি মনীষা মনসা হৃদয় সংগ্রহ করেন বর্তমানেরই অব্যবহিত সংস্পর্শ বা সংবেদন থেকে। এই জন্য একমাত্র কবিকে বা আর্টিস্টকেই বলা যায় বর্তমানের পোষ্যপুত্র। এই বর্তমানই তো কবির মন প্রাণ ইন্দ্রিয়কে অধিকার করে তাঁকে সৃষ্টি-অভিমুখী প্রবণতা দিয়েছে: একটি বিশেষ মুহূর্তের অথবা একটি বিশেষ কালখণ্ডের দৌত্যে কবির চৈতন্য যখন বতৃমানের সঙ্গে সংগত হয়, তখনই জেগে ওঠে সৃষ্টির স্ফুলিঙ্গ, জন্ম হয় কবিতার।"[১৩] সম্ভাবনার সকল ক্ষেত্রকে কর্ষণ করবার জন্যে তখন আধুনিক মানুষের মতো আধুনিক কবিও থাকেন উন্মুখ।

তাই একদিকে যতটাই থাক তার আত্মদহনের জ্বালা, পীড়ন, অন্যদিকে ততটাই থাকে তাঁর নিবিড় স্বপ্নবোধ ও প্রত্যয়ঘন প্রেমবাসনা। সমস্ত ভাঙনের মধ্যেও জেগে থাকে তাঁর দুর্মর বিশ্বাস।[১৪]

ড. হুমায়ন আজাদ, তার 'আধুনিক বাংলা কবিতার' ভূমিকায় বলেন, তিনটি বিশেষ দিক চিহ্নিত করে বলেন: কয়েক দশক পর পর-সাহিত্য, শিল্পকলা, চিন্তার এলাকায় ঘটে

সংবেদনশীলতার পরিবর্তন, আর আমরা এক শিল্প, সাহিত্য, চিন্তা থেকে পৌঁছি আরেক শিল্প, সাহিত্য চিন্তায়। তবে এ পরিবর্তনগুলো একই মাত্রার নয়, সংবেদনশীলতা বদলের তিনটি মাত্র চোখে পড়ে। প্রত্যেক দশকে প্রত্যেক প্রজন্ম একধরনের বদল নিয়ে আসে সংবেদনশীলতার, নিয়ে আসে প্রজন্মের দশকি ফ্যাশন; তা প্রজন্মের সাথে আসে আর তারই সাথে চলে যায়, এক দশক তার আয়ু। এ বদল কোন মৌল বদল নয়। এর চেয়ে বড় মাত্রার বদল ঘটে কয়েক প্রজন্ম, সাধারনত এক শতাব্দী ধরে, যাতে ঘটে সংবেদনশীলতা ও রীতির গভীরতর ও ব্যাপক বদল, যা স্থায়ী হয় দীর্ঘকাল ধরে। এ-বদল বেশ বড় মাত্রার; এটা সংবেদনশীলতার শতকি পরিবর্তন। কখনো কখনো সংবেদনশীলতার ঘটে এর থেকেও অনেক বড় মাত্রার বদল, বিশাল বদল, সহস্রকে দু-একবার; ঘটে সংস্কৃতির ভয়াবহ ভাঙাগড়া, যার ফলে মহৎ চিরস্থায়ী বলে গণ্য কীর্তিগুলোও হঠাৎ ধসে পড়ে, অতীত পরিণত হয় ধ্বংসস্তূপে, মহৎ সমাধিক্ষেত্রে। এমন বিশাল মাত্রার বদল এতোদিনের সভ্যতা সংস্কৃতি সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলে ধরে, তাকে আর গ্রহণযোগ্য মনে করে না; তাকে বাদ দিয়ে নিজে সৃষ্টি করতে থাকে সম্পূর্ণ অভিনবকে, যা আগে কখনো ভাবনায় আসেনি। আধুনিকতাবাদ এ-তৃতীয় মাত্রার বিশাল বদল ঘটায় সংবেদনশীলতার, সৃষ্টি করে এক অভিনব শিল্পকলা, যার মুখোমুখি অসহায়বোধ করে প্রথাভ্যস্ত শিল্পকলানুরাগীরা।[১৫]

অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হক 'আধুনিকতাবাদ ও জীবনানন্দের জীবনোৎকণ্ঠা' গ্রন্থে অনেক চাঞ্চল্যকর দিক উল্লেখ করে বলেন:

> "বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বিশেষ করে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে ব্রিটেন, ফ্রান্স, জামার্নি প্রভৃতি দেশে উদ্ভূত ও বিকশিত শিল্প সাহিত্য সম্পর্কিত নানা নামের তত্ত্ব মত ও কর্মনীতি একত্রে 'Modernism' নামে অভিহিত হয়েছে। পরে ক্রমে সাহিত্য পরিস্থিতি ও সাহিত্যের স্বরুপ পরিবর্তিত হয়েছে।"

ড. খন্দকার আশরাফ হোসেন বলেন: "আধুনিক বা মর্ডান অভিধাটি বিশ শতকের প্রথম পাদে একটি বিশেষ অর্থ পরিগ্রহ করে শিল্প সাহিত্য, সেই অর্থ আবার গড়ে তোলে একটি শিল্প মতবাদ। যার নাম আধুনিকবাদ"।[১৬] বস্তুত উপরোল্লিখত, পর্যালোচনা আমরা, দেখব যে, মর্ডানইজম শব্দটির অনুবাদ বাংলা আধুনিকতাবাদ শব্দটি সামনে আসে। কেউ

আধুনিকতাবাদ, শব্দটিকে আনতে পারেন। তবে অনেক স্পষ্ট অর্থবোধের জন্য আমি আধুনিকতাবাদ শব্দটিকে ব্যবহার করব।

ইউরোপীয় কাব্যান্দোলনের নন্দনতাত্ত্বিক পর্যালোচনায় ড্রাইডেন-পোপ-জনসন, অ্যাবারক্রম্বে, হাউসম্যানসহ নানা জনের ভিন্ন ভিন্ন অবদান থাকলেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কবি ব্যক্তিত্ব উইলিয়াম ওয়ার্ডস্ত্তয়ার্থ (১৭৭০-১৮৫০)। ১৭৯৮ সালে এস.টি. কোলরিজের (১৭৭২-১৮৩৪) সঙ্গে তাঁর যৌথ-সম্পাদিত গ্রন্থ 'Lyrical Ballads' প্রকাশিত হয়, যা মূলত ইংরেজি সাহিত্যে রোমান্টিক কাব্যোন্দোলন সূচনা করে। ১৮০২ সালে বইটির দ্বিতীয় সংস্করণে যুক্ত হয় ওয়াডসওয়ার্থকৃত 'মুখবন্ধ (Preface)। এর দ্বিতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণে যুক্ত হয় 'What is usually cxlled poetic diction ' শিরোনামে একটি সংযোজনী (Appendix), যা পরবর্তী সংস্করণগুলোতে একাধিকবার পরিমার্জিত হয়েছে। কবিতা কী, তার মূল্য বা উপযোগিতা কি-সে, কবি কে, তিনি কাকে উদ্দেশ্যে করে লেখেন, কবির কাছে কোন ধরনের ভাষা পাঠক প্রত্যাশা করে ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি প্রকৃত কবির যর্থাথ সৃজন প্রক্রিয়ার অন্তঃপুরে আলো ফেলতে সক্ষম হয়েছিলেন।

বস্তুত ঐ মুখবন্ধটিতে ওয়ার্ডওয়ার্থ পূর্ববর্তী দার্শনিক সমালোচক নন্দনতত্ত্ববিদদের দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে নিজের কাব্যসৃষ্টি প্রক্রিয়াকে নিবিড়ভাবে যাচাই করেছেন। কোলরিজের তাগিদেই মূলত ওয়ার্ডসওয়ার্থ নিজের রচিত উনিশটি কবিতাসহ সংকলনভুক্ত কবিতাগুলোকে এডিনবরা ও কোয়ার্টারলি পত্রিকার নিউ ক্ল্যাসিস্ট সমালোচকদের রূঢ় আক্রমন থেকে রক্ষা করা।

কবি ওয়ার্ডওয়ার্থ কবিকে বর্ণনা করেন, একজন সংবেদনশীল, সহৃদয়বাদী প্রাণবান ব্যক্তিসত্ত্বারূপে ঘার আপন সৌন্দর্য প্রভায় মহাবিশ্বের অসীম রহস্য প্রকাশিত হয়। কবি এমন এক মানব যার মাধ্যমে প্রকৃতি ভিন্ন মূর্তিতে প্রকাশিত সেটা মহাবিশ্বের অপার রহস্যই হোক আর মানবীয় রূপই হোক। তার শিল্পসত্যের চিরন্তনতা প্রচেষ্টাই শিল্পসৃষ্টির মূলকথা হিসাবে আবর্তিত।

কবি মাত্রই একজন নির্মানশীল ব্যক্তি নন। পূর্ববর্তী কবি শিল্পকূলদের প্রথানুসরণ করে একজন অনুভবী দ্রষ্টামাত্র। গভীর অনুধ্যানের মাধ্যমেই তার স্বতঃস্ফূর্তর মাধ্যমে বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হয়। কবিদের শক্তিশালী অনুভবের অভিব্যক্তি উম্মোচন, বিপরীতক্রমে সুশান্ত স্মৃতি

অনুভবের এই দু'টি ব্যাপারকে বিংশ শতকের কবি তাত্ত্বিক টি.এস. এলিয়ট 'Tradition and individual talent' প্রবন্ধে 'শান্ত সমাহিত স্মৃতি অনুভবে'র বিরোধিতা করেছেন।

পেনসিলভেনিয়া বিশ্ববিদ্যালয় ও হ্যামিলটন কলেজ শিক্ষা লাভকারী এজরা পাউন্ড ১৯০৮ সালে ভেনিসে প্রথম কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করার মাধ্যমে এক কবি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেন। নব্বইটির মত গ্রন্থ প্রকাশকারী কবি, সমালোচক ও মননশীল বুদ্ধিজীবী হিসেবে এজরা পাউন্ড কবিতা তথা আধুনিক পশ্চিমা সাহিত্যের আন্দোলনের তাত্ত্বিক ভূমিকা অর্জনের বিশেষ ভূমিকা রাখেন। তিনি পোয়েট্রির বৈদেশিক সম্পাদক ছিলেন। তেমনি 'ব্লাস্ট' পত্রিকার নামকরণেও মূখ্য ভূমিকা রাখেন। ১৯১৪ ও ১৯১৫ সালে উইন্ডাম লুইস সম্পাদিত 'ব্লাস্ট' পত্রিকার দু'বছরে দু'টি সংখ্যা বের হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্ববর্তী সময় পাউন্ড কবিতায় ইমেজিষ্ট আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটান, যা বিশ্ব কবিতার প্রেক্ষাপটে যুগান্তকারী ঘটনা। মূলত আধুনিক সাহিত্যে ইমেজিষ্ট ও ভর্টিসিস্ট আন্দোলনের কেন্দ্রীয় চরিত্র তিনি। তিনি সাহিত্যের প্রয়োজনে প্রচুর প্রবন্ধ-নিবন্ধ লিখেছেন। এজরা পাউন্ডের তীক্ষ্ণধী মেধার স্ফুরণ ঘটেছিল তার কবিত্বে, সাহিত্যে সমালোচনায় ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে পৃষ্টপোষকতা ও অভিভাবকতায়। তাঁর অসাধারন সমালোচনা বিষয়ে সর্তক ছিলেন সমকালীন কবিকূল। কাব্যের জন্য নতুন রীতি, গদ্যছন্দ এবং বিষয়ব্যাপ্তির কথা বলেছেন তাঁর পর্যালোচনামূলক মন্তব্যে, ইমেজিষ্ট আন্দোলনের প্রেক্ষিতে এডওয়ার্ডীয় কবিতার শিথিলবন্ধতার নিজস্ব মত কঠোরভাবে ব্যক্ত করেছেন। নবীন কবিদের প্রতিভার পরিধি যেমন সনাক্ত করেন, তেমনি তাদের পরিচয় তুলে ধরেছেন। জগৎখ্যাতি লাভ করেছেন এমন বিখ্যাত কবিদের মধ্যে রয়েছেন রাবার্ট ফ্রস্ট, টি.এস.এলিয়ট, এইচ. ডি. উইলিয়াম কার্লোস উইলিয়ামস, জেমস জয়েস, ই.ই.কামিংস, আর্নেষ্ট হোমিংওয়ে। এই কবিগণ এজরা পাউন্ড দ্বারা প্রবলভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন এজরা পাউন্ডের সামগ্রিক কবিকৃতির চেয়ে তিনি তীক্ষ্ণধী সমালোচক হিসেবে পরিগণিত হন। সমগ্রজীবনে ক্লাসিকীয় শুদ্ধতার অনুসন্ধানে ভ্রমন করেছেন প্রাচীন থেকে সাম্প্রতিকযুগের সাহিত্যে গ্রিক কবি স্যাফো থেকে দান্তে, হোমার থেকে অ্যাংলো স্যাক্সন গীতি কবিতা,

জাপানি হাইকু থেকে চীনা কবিতা পর্যন্ত তাঁর অভিনিবেশ ও অনুরাগ বিস্তৃত ছিল।

এজরা পাউন্ড আমেরিকার আইডাহোতে ১৮৮৫ সালের ৩০ অক্টোবর জন্মগ্রহণ করেন। হ্যামিলটন কলেজে সাহিত্যমগ্ন অধিকাংশ সময় পার করেন ইতালি, ফরাসি প্রভৃতি রোমান্স ভাষার মধ্যযুগ ও রেনেসাঁকালীন সাহিত্য অধ্যয়নের মাধ্যমে। এতে তাঁর মধ্যে সময়ের সাথে চেতনাবোধ জেগে উঠে; যাকে কবি এলিয়ট বলেন, 'ঐতিহাসিক প্রজ্ঞা'। এজরা পাউন্ড ফ্রান্সের বিখ্যাত প্রভাঁস এলাকার চারণ ক্রুবাদুরদের কাব্যপ্রীতি থেকে কবি দান্তে পর্যন্ত কীভাবে ইউরোপীয় কবিতার আর্ন্তজাতিকতা পরিব্যাপ্ত হচ্ছিল সাগ্রহে লক্ষ্য করেন । তরুণ কবি পাউন্ড ১৯০৮ সালে লন্ডনে আসেন। ১৯২০ এর দশকের শুরুতে প্যারিসে বসবাস শুরু করেন। তবে লন্ডনে অবস্থানকালে পূর্বে তাঁর প্রথম প্রকাশিত 'A lume spento' নামে একটি গ্রন্থ ছিল। অচিরেই লন্ডনের সাহিত্যমহলে যোগাযোগ বৃদ্ধি করেন। দেখা হতে থাকে ফোর্ড ম্যাডক্স হোয়েফার (ফোর্ড) ইয়েটসের সান্ধ্য আড্ডায় পেয়েটস ক্লাবে, আইফেল টাওয়ার রেস্তোঁরার দিন শেষের আড্ডায়। তার ফলে এজরা পাউন্ডের যথাক্রমে 'A Quinzaine for this Yule' (১৯০৮), 'Personae' (১৯০৯), `Exultations' (১৯০৯), 'Canzoni' (১৯১১) এই চারটি বই বের হয়। পাউন্ডের এই প্রথমযুগের বইগুলোর সাথে সমকালীন এডওয়ার্ডীয় যুগের কবিতার বৈশিষ্ট্যই বেশি ছিল। বিগত হয়েছেন এমন কবিদের শৈলী বা অতীত ইতিহাসের ও চরিত্রের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করেছেন তাঁর কাব্যের মধ্যে। এজরা পাউন্ড আধুনিকতাবাদী কবিতার প্রাণপুরুষ হলেও স্বীয় কবিতার নতুনত্ব আনার পিছনে সমকালীন কবিদের মধ্যে ফোার্ড ম্যাডক্স ফোর্ড, টি. ই. হিউম, এফ.এস. ফ্লিন্ট, প্রান্সিস ট্রানচারড, এডওয়াক ষ্টোয়ার, ফ্লোরেন্স ফার, জোসেফ ক্যাম্পেল এর অবদান অনস্বীকার্য। উপরোল্লিখিত রেষ্টুরেন্টের কবিসভায় সমকালীন কবিতার গতি প্রকৃতি নিয়ে এই কবিগণ হতাশা ব্যক্ত করতেন। নতুন আঙ্গিকে ভাষা তৈরীর জন্য উম্মুখ হয়েছিলেন। আর এ থেকেই ইমেজিজমের আন্দোলনের কাজ শুরু হয়। বস্তুত আইফেল টাওয়ারকেন্দ্রিক কবিদের সংস্পর্শেই তার কমিমনের চিন্তা-ভাবনার পরিবর্তন ঘটে। এতে তাঁর প্রবাদ-প্রতিম কর্মতৎপরতা ও সাংগঠনিক ক্ষমতাবলে ইমেজিজমের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রচারকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। ১৯১৪ সালে পাউন্ডের সম্পাদনায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইংল্যান্ড থেকে প্রকাশিত হয় চিত্রকল্পবাদী নামাঙ্কিত প্রথম কাব্যসংকলন 'Desh Imagistes'। তারা চিত্রকল্পবাদ কবিতায় চিত্রকলা ও ভাস্কর্যের রূপকে আত্মস্থ করতে

চেয়েছিল। কবিতাকে ভিক্টোরীয় এবং এডওয়ার্ডীয় যুগের সেন্টিমেন্টালিজম, বাগবাহুল্য ও অতিসৌকর্য থেকে মুক্ত করার প্রথম প্রয়াস আসে ইমেজিষ্টদের কাজ থেকে, এই সময়ে ইংল্যান্ড ও আমেরিকায় টেনিসন ও লংফেলোর কবিতার নীতি কথা ও গীতলতাকে আদরনীয় ভাবা হতো। ইমেজিষ্টরা এসে জোর দিলেন ক্ল্যাসিক্যাল সংহতি, স্বল্পবাকতা এবং অপরিচিত এমনকি ভিনদেশি ছন্দ-প্রকরণ ও শৈলীর ওপর। বস্তুত স্বতঃস্ফুর্ততা ও নান্দনিক শৃংখলার সম্বনয়ে হৃদয় ও মননের এক জটিল আর্ন্তবয়নকে দ্যোতিত করাই ছিল চিত্রকল্পবাদের লক্ষ্য। ইংল্যান্ডে ইমেজিষ্ট আন্দোলনের নেতৃত্বদানকারীদের মধ্যে এজরা পাউন্ড, হিলডা ডুলিটল জন, গোল্ড ফ্লেচার ও এমি লাওয়েল ছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক এবং রিচার্ড অ্যালডিংটন এফ. এস. ফ্লিল্ট ও টি. ই. হিউম ছিলেন বৃটেনের অধিবাসী। টি. এস. এলিয়ট কাব্যকলার যে ধারণাটিকে 'অবজেকটিভ কোরেলের্টিভ' নামে উপস্থাপন করেন, পাউন্ডের হাতেই তাঁর সূত্রপাত ঘটেছিল চিত্রকল্পবাদের ব্যাখ্যায়। ১৯১৪ থেকে ১৯১৭ সালের মধ্যে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রথম চার বছরে ইমেজিষ্টরা চারটি বার্ষিক সংকলন বের করেন, পঞ্চমটি প্রকাশিত হয় ১৯৩০ সালে, দলটি ভেঙ্গে যাওয়ার ১৩ বছর পর, কিছুটা পূর্ণমিলনী ধরণে। ১৯১৫ সালে চিত্রকল্পবাদীদের ইশতেহার। এরও আগে ১৯১৩ সালে এফ. এস. ফ্লিন্ট 'Imagisme'এবং এজরা পাউন্ড 'A few don'ts by an magisme' নামের প্রবন্ধে এ আন্দোলনের রূপরেখা পেশ করেন। পাউন্ডের সম্পাদিত কাব্য সংকলনের উল্লিখিত সাহিত্যের নীতিমালাগুলো এরকম:

c_gZ: মুখের ভাষাকে কবিতায় ব্যবহার করা, তবে সব সময় শব্দটি বসানো- যথাযথ শব্দটির কাছাকাছি কোন শব্দ নয়, এমনকি যে শব্দ শুধুমাত্র আলংকারিক তা-ও নয়।

wØZxqZ: নতুন মেজাজকে প্রকাশের উপযোগী নতুন ছন্দ সৃষ্টি করা- কেবল পুরানো মেজাজের প্রতিধ্বনিকারী পুরনো ছন্দের অনুকরণ করে যাওয়া নয়। আমরা বলছি না যে, ফ্রি ভার্সই হবে কবিতার একমাত্র আঙ্গিক, আমরা শুধু স্বাধীন মতচর্চার নীতি হিসেবেই এর জন্য লড়াই করছি। আমরা বিশ্বাস করি, বাধাঁধরা আঙ্গিকের চেয়ে ফ্রি ভার্সে আরো ভালভাবে কবির ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের প্রকাশ ঘটতে পারে। নতুন লয় কবিতার নতুন ভাবনা নিয়ে আসতে পারে।

ZZxqZ: বিষয় নির্বাচনে পূর্ণ স্বাধীনতা দেয়া। উড়োজাহাজ ও যন্ত্রযান সম্পর্কে বাজে কোন লেখাই কখনোই শিল্প হয়ে উঠবে না, আবার অতীতের বিষয়াদি নিয়ে ভালো কিছু লেখা হলেও তা শিল্প হিসাবে বাজে হয়ে যাবে না। আধুনিক জীবনের নান্দনিক মূল্যে আমাদের উদ্দীপ্ত বিশ্বাস রয়েছে, কিন্তু একথা বলতে চাই যে, ১৯১১ সালের একটি উড়োজাহাজের মতো এতো নিস্প্রাণ ও পুরনো ধাচের বিষয় আর হতে পারে না।

PZ_Z: চিত্ররূপ উপস্থাপন করা (এখান থেকেই এসেছে চিত্রকল্পবাদী নামটি) তবে আমরা বিশ্বাস করি যত জমকালো আর ধ্বনিগুনসম্পন্নই হোক না কেন ধোয়াটে কোন নির্বিশেষ বিষয়ের চর্চা না করে কবিতার উচিত বিশেষকে সঠিকভাবে রূপায়িত করা। এ কারণেই আমরা মহাজাগতিক বিষয়ে নিবিষ্ট কবিদের বিপক্ষে এ ধরনের কবিরা শিল্পের আসল সমস্যা এড়িয়ে যেতে চান বলে আমাদের মনে হয়।

cÂgZ: যে কবিতা কঠিন ও স্বচ্ছ তার চর্চা করা যা অস্বচ্ছ ও অনির্দিষ্ট তার নয়।

IôZ: পরিশেষে আমরা অনেকেই বিশ্বাস করি, গাঢ় তাই কবিতার অন্তঃসার।[১৭]

সাধারনভাবে কাঠিন্যের নন্দন হিসেবে চিত্রকল্পবাদ বহুল পরিচিতি লাভ করে। কি বিষয় নির্বাচন কি আঙ্গিক সাধনায় সঙ্গীতের কোমল সূর মূর্ছনায় চেয়ে শিলা ও অস্থির কাঠিন্যই ছিল একজন চিত্রকল্পবাদীর অভিষ্ট। এই কাঠিন্যের সাধনায়ই ভবিষ্যবাদ কিংবা অভিব্যক্তিবাদের মতো অন্যন্য বিশ শতকী শিল্প আন্দোলনের সঙ্গে চিত্রকল্পবাদের যোগসূত্র স্থাপিত হয়।

ইংরেজি সাহিত্যে প্রথম সংগঠিত আধুনিকতাবাদী সাহিত্য আন্দোলন চিত্রকল্পবাদ, সমকালে বস্তুকে আপন স্বরূপে দেখার জন্য একে নানা জ্যামিতিক ফর্মে ভেঙ্গে অবলোকন করার প্রবনতার চর্চা চলছিল। আভা গার্দের কিউবিজমের চর্চাতে এরকম হয়েছে। এজরা পাউন্ড ঠিক তেমনি কংক্রিট দৃশ্যকনাকে পাশাপাশি উপস্থাপন করে একটি বিমূর্ত চিত্র আঁকার কথা বলেন। ইমেজিষ্ট আন্দোলনের সাথে যাদের যুক্ত তারা সবাই যে একই রকম অত্যন্তিকতা বা ঐক্যমত্য পোষণ করতেন তা নয়। ইমেজিষ্টদের সাথে পারস্পারিক মতাদ্বৈতার প্রেক্ষিতে এজরা পাউন্ড এ কিউবিস্ট আন্দোলন থেকে সরে এসে ভার্টিসিজম আন্দোলনে নামে এক নতুন ধারণার সৃষ্টি করেন। পাউন্ডের সাথে মতান্তরের কারণে এমি লা ওয়েলের নেতৃত্বে গড়ে ওঠে পাউন্ড পরবর্তী ইমেজিষ্ট দল, লাওয়েল Some Imagist Poets নামে যথাক্রমে

১৯১৫, ১৯১৬ ও ১৯১৭ সালে তিনটি ইমেজিষ্ট সংকলন সম্পাদনা করেন। বস্তুত ১৯১২ থেকে ১৯১৭ সালের মধ্যে ইংল্যান্ডে এবং তার চাইতেও প্রবলভাবে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গড়ে ওঠা এ কাব্য আন্দোলনের মূল কথাই ছিল শুদ্ধ এবং নিরভরণ কবিতা গড়ে উঠবে একটি মাত্র ইমেজকে ঘিরে। এই একক চিত্রকল্পের সৃষ্টি এবং তার মধ্যে দিয়েই উদ্দীষ্ট বিষয়কে সারবান করে তোলার ক্ষেত্রে ব্যবহার কররতে হবে ভাষার পরিমিত ব্যবহার শব্দের সরাসরি উপস্থাপন এবং অপ্রচলিত ছন্দরীতির।

এজরা পাউন্ড প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্ববর্তী সময় ইমেজিষ্ট আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটান। যা বিশ্ব কবিতার ইতিহাসে যুগান্তাকারী ঘটনা। কিন্তু ইমেজিষ্ট কবিতার 'Hellenic Hardness' হারিয়ে যাচ্ছে বলে তিনি বন্ধুবর লেখক চিত্রশিল্পী উইন্ডহ্যাম ল্যুইসের সাথে মিলে চিত্রকলার এক বিশেষ রীতির প্রত্যয়ের সূত্রপাত করেন। কিউবিষ্ট আন্দোলন হতে সরে এসে Vorticist movement নামে নতুন ঘরনার আন্দোলনের গোড়াপত্তন করেন। তিনি ভর্টিসিজম কথাটি নিয়েছেন Vorter (ঘূর্ণিকেন্দ্র) শব্দ থেকে। ভার্টিসিস্ট চিত্রকলায় দৃঢ়রেখা এবং কড়া রঙের সমাবেশ দর্শকের চোখকে টেনে নেয় ছবির কেন্দ্রস্থলের দিকে। ভার্টিসিস্টদের সাহিত্যের কাগজ Blast উইন্ডহ্যাম ল্যুইসের সম্পাদনায় প্রকাশিত হলে দেখা যায় যে, সেখানে চিত্রশিল্পীদের ছবি লেখার সাথে পাউন্ড ও এলিয়টের লেখা মুদ্রিত হয়েছিল। মূলত পাউন্ডের আজীবন আগ্রহ ছিল প্রাচীন মিথ এবং রিচ্যুয়ালে। ভার্টিসিস্টদের সাথে তাঁর এই বিষয়ে সাযুজ্য তাকে আকৃষ্ট করে। ভর্টিসিস্ট শিল্পীগণ আবেগকে চিত্রকলা, স্থাপত্য, সংগীত ও কবিতার রীতিবদ্ধ কাঠামোর মধ্যে বিমূর্তায়িত করে নিতে চেয়েছিলেন। তাদের এই প্রচেষ্টার মধ্যে ইমেজিজমের মূল ভাবনাকে অন্য শিল্পমাধ্যমে প্রয়োগের সম্ভাবনা পাউন্ড দেখতে পেয়েছিলেন। সকল শিল্পের গতি একটি ঘূর্ণিকেন্দ্রের দিকে যেখানে এসে সব পার্থক্য, সর্ব বিভেদ মুছে যায়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অভিঘাতে ১৯১৫ সালে এই আন্দোলনের মৃত্যু ঘটে। Dictionary of Art এ একে ক্ষণজীবী শিল্পান্দোলন নামে অভিহিত করা হয়েছে। কারো কারো মতে, ইমেজিজম ও ভার্টিসিজজম আন্দোলনের কল্যানেই গুরুত্বপূর্ণ কিছু কবি লেখকের শিল্পকর্মের প্রসার লাভ ঘটে, যার দ্বারা বিশ শতকের ইংরেজি সাহিত্যচর্চায় আধুনিক প্রত্যয় জন্মলাভ করে:

æThese two movement, shich helped being to notice the work of poets and antists like james joyce, wyndham lewis, williom carlos silliams, H.D, Jaclb Dpstein, Richard Al dington, marianne moore, Rabindranath Tagore, Rebert frost, Rebecca west and Henri gaudier brzeska, can be seen as central events in the birth of English Language Modernism"[18]

যেসব রচনার মধ্য দিয়ে এজরা পাউন্ড সাহিত্য শিল্পবোধের প্রকাশ ঘটান তার কাব্যের পরিমান বেশি হলেও বিভিন্ন পত্রিকা ও গদ্যরচনায় তার অভিব্যক্তির প্রকাশ লক্ষণীয়।

(১৯১০) Pavannes and Divisions (১৯১৮), Indiseretions (১৯২৩) antheil and the Treatise on Harmony (১৯২৪), Imaginary lwtters (১৯৩০), ABC of Economics (১৯৩৩), ABC of Reading (১৯৩৪), Make it new (১৯৩৫), Polite Essays (১৯৩৭) ইত্যাদি। বিশ শতকের প্রথমদিকে এলিয়ট, পাউন্ড প্রমুখ ভবিষ্যাভিসারী কবিগণ সংঙ্গবদ্ধভাবে কবিতার ভবিষ্যত নির্মাণে উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ১৯১২ সালে Hilda Doolittle Richard ও পাউন্ড মিলে আধুনিক কবিতার তিন দফা নীতিমালা ঘোষণা করেন;

c_gZ: Direct treatment of the thing uhether subjective or objective.

wØZxqZ: To use absolutely on word that does not contribute to the presentation.

ZZxqZ: As regarding rythm: to compose in the senquence of the musical phrase, not in sequence of a metrome[19]

উল্লেখ্য, সাহিত্য বা কবিতা রচনার এরূপ নীতিনির্ধারনী ব্যাপার বা নির্দেশনা শিল্পের নন্দনতাত্ত্বিক বিবেচনায় তাৎপর্যপূর্ণ। এরূপ নির্দেশনা নির্দিষ্ট কবির শিল্পসূত্র হিসেবে যেমন কাজ করে, তেমনি শিল্পের ভবিষ্যতের সঙ্গে রচনা করে সংযোগ সেতু। ভবিষ্যতের রচয়িতাদের অনুপ্রেরণা বা নির্দেশনা দান করে বিধায় ক্ষেত্র বিশেষে এরূপ ঘোষণা বা ইশতেহার অনেক সময় হয়ে ওঠে সর্বজনীন সার্বকালিক।

বিশ শতকের ইংরেজি কবি, নাট্যকার ও সমালোচক টমাস স্টার্নস এলিয়ট (১৮৮৮-১৯৬৫) দেশি গণ্ডি পেরিয়ে বিশ্বসাহিত্যের জন্য অনুকরণীয় আদর্শ স্থাপন করেছেন। আত্মপরিচয়মূলক এক ঘোষণায় তিনি বলেছিলেন, ‘‘I am a Royalist in politics, an anglo catholic in religion and a classicist in literature’’[২০] সমকালে কবিতা ও নাটক রচনায় তিনি এলিজাবেথীয় রীতির অনুসারী ছিলেন। তবে তা নিছকই ঐতিহ্যপ্রীতিসঞ্জাত অনুসরণ। কারণ, ‘Tradition and individula talent’ প্রবন্ধে তার নিজেরই ঘোষণা:

> ‘‘No poet, no artist or any art, has his complete meaning alone, His significance, hi appreciation is the appreciation of his relation to the dead poets and artists. You cannot value him alone; you must set him, for contrast and comparison, among the dead. I mean the as a principle of aesthetic, not merely historical criticism.’’[২১]

সে কারণে অতীতের প্রতি তার মুগ্ধতা ঐতিহ্যসঞ্জাত। এলিজাবেথীয় রীতির অনুসারী হলেও নিজের কাব্যবোধ তিনি এমনভাবে বিনির্মাণে সক্ষম হন, যা বিশ্বসাহিত্যে প্রবল প্রভাব সঞ্চার করতে সমর্থ হয় আর ক্লাসিসিজমেরও অন্যতম বৈশিষ্ট্য যেহেতু পুরনো রীতির প্রতি আস্থা, উপমা অলঙ্কার আর শব্দ নির্বাচনের প্রয়োজনে পূর্বসূরী ও প্রাচীন কবিদের রচনায় অবগাহন, তাই উপরিউক্ত ঘোষণা দুটো তার কবিমানসের প্রেক্ষাপটে পারস্পরিক বলেই প্রতিপন্ন হয়। সৃষ্টিশীল সাহিত্যের বাইরে সমালোচক তথা নন্দনতাত্ত্বিক হিসেবেও তার ঈর্ষাণীয় অবস্থান প্রমাণ করে William Empson এর নিম্নোক্ত উক্তি:

"I do not know for certain how much of my own mind (Eliot) invented, let alone how much of it is a reaction against him of indeed a consequence of misreading him. He is a very penetrating influnce, perhaps not unlike the east wind" (enwikipedia Eliot) (objective universal symbol) সত্যিকার অর্থেই, এলিয়ট East wind-এর ঝড়ো হাওয়ার প্রভাবে আন্দোলিত করেছিলেন কবিতা বিশ্বকে। তার গুরুত্বপূর্ণ গদ্য রচনার মধ্যে ‘The sacred wood: Essays on poetry and criticism’ (১৯২০), ‘The

second order mind' (১৯২০), 'Selected Dssays', ১৯১৭-৩২ (১৯৩২), 'The use of poetry and the use of criticism' (১৯৩৩), 'Elezabethan essays' (১৯৩৪), 'Essays ancient and modern' (১৯৩৬), 'On poetry and poets' (১৯৫৭) গ্রন্থগুলো উল্লেখযোগ্য।

এসব গ্রন্থভুক্ত কয়েকটা প্রবন্ধই মূলত এলিয়টের কাব্যচৈতন্যের স্মারক তথা নন্দনতাত্ত্বিক দিক-নির্দেশক হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে গত কয়েকযুগ ধরে। নামকরা যেতে পারে 'Tradition and Individual Talent (১৯২০), The metaphysical poets (১৯২১), 'Hamlet and His problems' (১৯৩২), 'From the music of poetry' (১৯৪২), 'The frontiers of criticism' (১৯৫৬), প্রবন্ধগুলোর কথা। এসব প্রবন্ধের মধ্যে 'Tradition and Individual Talent'- এ যে কোন কবি বা তার কবিতার ঐতিহ্যের মধ্য দিয়ে উৎপাদন ও পরিপুষ্টি প্রসঙ্গ এবং 'Hamlet and His Problems'- এ Objective Correlative তত্ত্ব বিশ্বসাহিত্যে তাৎপর্যপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছে। প্রথমোক্ত প্রসঙ্গে এলিয়ট জানান, যে কোন কবিতার মূল্যায়ন প্রকৃতপক্ষে কবির সমকাল ও পূর্ববর্তী মানুষ, ঐতিহ্য ও শিল্পের ঐতিহাসিকভাবে সমন্বিত বিবেচনা হওয়া উচিত। 'Objective Correlative' প্রসঙ্গে এলিয়টের বক্তব্য হচ্ছে, শিল্পের কোনো আঙ্গিকেই শিল্পীর ব্যক্তিগত অভিব্যাক্তি হিসেবে গন্য হওয়া উচিত নয়। কারণ, ব্যক্তির অনুভূতি বিশ্বজনীন প্রতীকের (objective universal symbol) মধ্য দিয়ে অনির্বচনীয়তা লাভ করে শিল্পে।

বিশ শতকের আধুনিক যুগে ইংরেজি সাহিত্যতত্ত্বে এক উল্লেখযোগ্য নাম I A Richards। তিনি নিজে কবি নন, তবে সমালোচক হিসেবে যা খ্যাতির অধিকারী তাতে কবিতা তথা সাহিত্যের তত্ত্বের বিবেচনায় যথাযোগ্য মর্যাদা প্রাপ্য। তার গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থসমূহ হচ্ছে The meaning of meaning, Principal of Literary Criticism, Practcal Criticism. ইত্যাদি। এসব গ্রন্থে রিচার্ডস সমালোচনার ভাষা, শিল্পী ও তার ভোক্তাপ্রিয়তা, মূল্যবোধের সঙ্গে সমালোচকের সম্পর্ক শিল্পে শিল্পীর মনস্তত্ত্ব, আঙ্গিক নির্মাণ ও ভাস্কর্যপ্রতিমতা, ভাষার বিবিধ ব্যবহার ইত্যাদি বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। সাহিত্য

সমালোচনায় তাঁর ব্যবহারিক রীতি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এতে তিনি তার ছাত্রদের পরিচিত অপরিচিত গুরুত্বপূর্ণ-গুরুত্বহীন কবিদের পরিচয় গোপন করে তাদের কবিতার সমালোচনা লিখতে দিতেন এবং প্রতিক্রিয়া লক্ষ করতেন। প্রসঙ্গত, রিচার্ডস শিল্পতাত্ত্বিকের চেয়ে অধিকতর পরিমানে সমালোচনাতাত্ত্বিক। তবুও সাহিত্য সমালোচনার ফাঁকে ফাঁকে শিল্প সাহিত্য সম্পকে তাঁর নিজস্ব ভাবনা ব্যক্ত হয়েছে। I A Rechards তিনি বলেন:

> "It has always been found far easier to divide experiences into good and bad, valuable and reverse, than to discover what we are doing when we make the division. The history of opinions as to what constitutes value. As to why and when anything is rightly called good, shows a be wildering vatiety but in modern times the controversy narrows itself down to two questions. The first of these is whether the defference between experiences which are valuable and those. Which are not can be fully described in psychological terms; whether some additional sistinctive ethical or moral idea of a non psychological nature is or is not required. The secon question concerns the exact psychological analysis needed in order to explain value if no furthe ethical ides is shown to be necessary.[22]

উল্লেখ্য, সাহিত্যপাঠে ভোক্তার সম্ভাব্য মানসিক প্রত্যাশা ও প্রতিক্রিয়ার যথার্থ প্রতিফলন ঘটেছে উপরিউক্ত পঙক্তিতে। রিচার্ডসের ভাবনার আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ নিম্নরূপ:

c_gZ: সমালোচনা হচ্ছে বিভিন্ন অভিজ্ঞতার ভেদ নির্ণয় এবং তাদের মূল্যায়ন। এর জন্য অভিজ্ঞতার প্রকৃতি অথবা মূলতত্ত্ব ও ভাব সংযোগ সম্বন্ধে কিছু ধারণা প্রয়োজন।[২৩]

wØZxqZ: যোগাযোগই লেখকের একটি মূল লক্ষ্য। তবে এটা প্রায় অবচেতন মনে নিহিত থাকে।[২৪]

ZZxqZ: তিনি শিল্পের জন্য শিল্প' তত্ত্বের বিরোধী। সাহিত্য ও শিল্পকে সবকিছু থেকে বিবক্ত রাখার পক্ষপাতী নন তিনি।

PZ_Z: গদ্য ও পদ্যের উৎপন্ন ফল ভিন্ন। সংগীতই সুচারুতম শিল্পাঙ্গিক।

cÂgZ: কবিতা তখনই মন্দ হয় যখন লেখক পাঠক আন্তর যোগ ক্রুটিপূর্ণ থাকে।

lôZ: কবিতায় রিচার্ডস চার ধরনের অর্থের কথা বলেন : শ্রবণ কথন ইত্যাদি ইন্দ্রিয় ক্রিয়া (sence) অনুভূতি (feeling) সুর (tone) ও উদ্দেশ্য (intention)।

mßgZ: বৈজ্ঞানিক ভাষা যেখানে সত্য বিবৃত করে, কবিতা সেখানে প্রকাশ করে ছন্দ বিবৃতি।

AógZ: সমগ্রের বিচার করতে চাইলে সাহিত্যের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচার করতে হবে।

বিশ্ব কবিসাহিত্যে ফরাসি প্রতীকবাদের রয়েছে গুরুত্ব প্রভাব। উনিশ শতকের ফ্রান্সে প্রতীকবাদ বিকশিত হয় মূলত চারজন কবির কাব্যপ্রচেষ্টাকে ঘিরে। তাঁরা হলেন: শার্ল বোদলেয়ার (১৮২১-১৮৬৭), স্টেফান মালারেমে (১৮৪২-১৮৯৮), পল ভেরলেন (১৮৪৪-১৮৯৬) ও জাঁ আরতুর র‍্যাবোঁ (১৮৫৪-১৮৯১) প্রতীকবাদের 'করণকৌশল' ও 'রূপান্বেষার ক্ষেত্রে লক্ষণীয় যে; কোনো সুনির্দিষ্ট সুসম্বন্ধ দার্শনিক সংশ্রয় (System) নেই, আছে বিবিধ বিচিত্র বিক্ষিপ্ত দার্শনিক উচ্চারণ ও আকাঙ্খা। সেকালের বিখ্যাত সমালোচক ব্রনতিয়ের যিনি অত্যন্ত সংকীর্ণভাবে গৃহীত এক অন্যতম পুরোহিত হয়েও প্রতীকবাদের প্রতি প্রত্যাশিত বৈরিতা প্রদর্শনে বিরত ছিলেন, তাঁদের অনেক উৎকেন্দ্রিকতাও ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখেছিলেন। যেহেতু তারা, তাঁর দৃষ্টিতে এক চিন্তাশ্রয়ী কাব্য নির্মাণে অভিলাষী হয়েছিলেন।"[২৫]

সদ্য আগত যন্ত্রযুগে ইউরোপের যে কবিরা সমাজের সঙ্গে কবির বিচ্ছেদ বিষয়ে প্রথম সুতীব্রভাবে সচেতন হন, তাঁদের মধ্যে প্রধান শার্ল বোদলেয়ার (১৮২১-৬৭)। সমাজের সঙ্গে কবির বিচ্ছেদের অর্থ কেবল কবিতাকে কোন কিছুর হাতিয়ার না করে বরং সৌন্দর্য স্নিগ্ধ কাব্যাকারে গড়ে তোলা। কবিতার সেই অর্ন্তগত সৌন্দর্যের প্রণোদনায় বোদলেয়ারের কবিতায় প্রতিষ্ঠা পেল আর্টের আধুনিক ধারণা। তাঁর কবিতায় রূপায়িত হলো প্রকৃতির সঙ্গে চিত্তের সেই দ্বন্দ্ব, শিলার (১৯৫৯-১৮০৫) যার তত্ত্বের দিক প্রকাশ করেছিলেন। তাই বোদলেয়ারের কবিতা কৃত্রিমের বন্দনায় মুখর; ভূষণের ধাতু ও রত্নদাম, বসনের রেশম ও সাটিন সুরা আর তরুপল্লব নেই, চারদিকে শুধু ধাতু, পাথর ও লেলিহান রত্নমনির কারুকার্য, জল পর্যন্ত তরলিত সোনা, আর কালোর মধ্যেও বহু বর্ণ বিচ্ছুরিত এই সব চিত্রকল্পের সাহায্যে সবলে প্রত্যাখ্যাত হ'লো প্রকৃতি, ঘোষিত হলো প্রতিভার পীড়া, নিঃসঙ্গতা ও মহিমা। তার শৌখিনতা dandyisn তাতেও আছে এমন এক জগতের আলেখ্য, যা স্মপূর্ণরূপে রচিত, স্বতন্ত্র ও অস্বাভাবিক নারী সেখানে ঘৃণ্য কেননা মূর্তিমতী প্রকৃতির নামই নারী, আর

ঘৃণ্য সমাজসংস্কারক, যেহেতু তিনি ঘনিষ্ঠভাবে জীবনের সঙ্গে যুক্ত থাকনে। এই জীবনে (বা সমাজে) কবির আর স্থান নেই একা সে উদ্বাস্তু, দেশ, জাতি ও স্থিতিহীন এখন সে সার্থক হতে পারে শুধু নিজের মধ্যে সম্পূর্ণ হয়ে, প্রকৃতির বিরুদ্ধে নিষ্ঠুরভাবে প্রতিভার শক্তিকে দাঁড় করিয়ে।[২৬]

ফলে বোদলেয়ারের মহৎ কবিদৃষ্টি পতিতা, জুয়াড়ি, ভিখারী প্রভৃতি অন্ত্যজদের মধ্যে কবিতার প্রতিমূর্তি গড়ে তোলে। সমকালীন ফরাসি চিত্রকলায় সার্কাসের সস্তা নট-নটি প্রিয় হয়ে ওঠার প্রেক্ষাপটও এই। সামাজিক জীবনে শিল্পী নিশ্চয়ই তাদের ভাগ্যের অংশভাক না হয়ে পারেন না। আধুনিককালের গুরুত্বপূর্ণ কবিদের মতো কোন কাব্যান্দোলন গড়ে তোলা তার পক্ষে সম্ভব হয়নি। কিন্তু প্রবল আধুনিকেরা এক বাক্যে স্বীকার করেন, নবযুগের বোধ ও বোধির আততি তারা গ্রহণ করেন বোদলেয়ার থেকে্। নিম্নোক্ত বক্তব্য বিবেচ্য;

> "ইতিহাসের কালানুক্রমে প্রথম আবির্ভাব ঘটেছিল ফরাসি কবি শার্ল বোদলেয়ারের উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকের একেবারে গোড়ায়;' ঐ শতকেরই সপ্তম দশকের মাঝামাঝি সময়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন ইয়েটস; আর নবম দশকের প্রায় শেষ প্রান্তে আবির্ভূত হয়েছিলেন এলিয়ট। কাব্য সাধনার বিচারে বোদলেয়ার পুরোপুরি উনবিংশ শতকের কবি, আর এলিঅট পুরোপুরি বিংশ শতকের। ইয়েটস এ দু'য়ের মাঝামাঝি দুই শতকেই আছেন প্রায় আধাআধি। কাব্যতত্ত্বের ব্যাপারেও ইয়েট একটা যোগসূত্র, পুরোপুরি উনবিংশ এবং বিশ শতকের দুই প্রজন্মের মাঝখানে তাঁর উজ্জ্বল অস্তিত্ব। ইয়েটসের সজ্ঞান ঋণ মূলত: ভেরলেন ও মালার্মের কাছে, এলিঅটের উত্তমর্ণ লাফর্গ করবিয়ের। অথচ ইয়েটস এবং এলিঅট উভয়েই ঋণী, হয়তো বা অজান্তেই, বোদলেয়ারের কাব্যরীতি ও প্রবণতার কাছে। আর সেই দিক দিয়ে দেখতে গেলে সমগ্র ব্যাপারটাই উল্টে যায়। কাব্যতত্ত্বের নিরিখে শুরুবাদের বিতর্কে না গিয়েও বলা চলে বোদলেয়ার যেন ইয়েটস এবং এলিঅট নামক পরবর্তী দুই প্রজন্মের এক অমোঘ যোগসূত্র।"[২৭]

১৮৫৭ সালে বেরোয় বোদলেয়ারের বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ 'Les fleursdu mal' বা ক্লেদজ কুসুম। বিচিত্র মাত্রা ছন্দ ও বিন্যাসের ১০১টা লিরিকের মধ্যে যেমন গদ্যভাষ্য সমনিম্ব কবিতা ছিল, ছিল প্রচুর সনেটও। তার গদ্যরচনার মধ্যে আছে, Le spleen de Paris (১৮৬৯), Poe's Tales-Histoires extraordinaires (১৯৫৬) ও Nouvelles HIstoires

extraordinaires (১৯৫৭)। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বোদলেয়ারের কবিতাই তার কাব্যতত্ত্বের আকর। তার স্বকীয় শিল্পরীতি নির্দেশ করার জন্য আলাদা কোনো গদ্যগ্রন্থ প্রয়োজনীয় মনে হয় না। বরং তার কবিতার রীতি ও তার অন্তর্গত আস্বাদ বিশ্বসাহিত্যে দান করে অভিনব ও চিরায়ত প্রণোদনা। তার কবিতাই;[২৮]

বোদলেয়ার সব প্রচলে বৈপরীত্য আমাদের চেনা উপমায় কোমলে কঠোর অসাধারন সহাবস্থানে উদ্ভাসিত কবিসত্তা। ক্লাসিক রীতিতে রোমান্টিকতার এক অদ্ভুত সমন্বয়। বুদ্ধদের বসুর মতে;

"ক্লাসিক রীতি সত্ত্বেও অথবা সেই জন্যই বোদলেয়ারই প্রথম রোমান্টিক, তাঁর কবিতা রোমান্টিকতার কামস্কাটকা নয়-কৈলাস; রোমান্টিক ও আধুনিক কবিতার মধ্যস্থলে তিনি অনন্যভাবে অবস্থিত। তার রচনায় রোমান্টিক উচ্ছাস যেমন নেই, তেমনি নেই আধুনিক দুর্বোধ্যতা; তার প্রতিটি রচনা প্রাঞ্জলতার দৃষ্টান্তস্থল, অথচ ঘন ও গভীর আকারে ক্ষুদ্র হয়েও ইঙ্গিতে সদূর প্রসারী।[২৯]

জীবনের বিচিত্র ও অভিনব আনন্দের পাশাপাশি সব মানুষ দুঃখী। বোদলেয়ার বোধ করেছেন মানুষ দুঃখী, তাই যে জানুক তার দুঃখ। মানুষ পাপী, তাই সে জানুক তার পাপ। তেমনি মানুষের রুগ্নতা, মুমূর্ষ হওয়া সত্ত্বেও তার অমৃতাকাঙ্খা। ডস্টয়েভস্কির উপন্যাসের মতো বোদলেয়ারের সমগ্র কাব্যে নিরন্তর ধ্বনিত হয়েছে। তিনি বুঝেছেন, এ বাণী সবাই জানবে না, জানতে পারবে না বা চাইবেও না; কিন্তু কবিরা জানুন। এই জ্ঞানেই আধুনিক সাহিত্যের অভিজ্ঞান। সে কারণেই ক্লেদজ কুসুমে অমৃতের সন্ধান করেন বোদলেয়ার। সে-সন্ধানের সূত্র ধরে বোদলেয়ার কাব্যরীতিতে এনেছিলেন অভিনব পরিবর্তন:

> "কাব্য বিষয়ে, কাব্য স্বভাবে, কাব্যতত্ত্বে কাব্য প্রকরণে কাব্যচ্ছলে, কাব্য ভাষায় বলতে গেলে কবিতার এমন কোন দিক ছিল না যা তার প্রতিভার যাদুখস্পর্শে নতুনভাবে সঞ্জীবিত হয়নি, কিংবা নতুন সম্ভাবনার পথ খুঁজে পায়নি। যদিও কাব্য প্রকাশের মতোই তার অন্যান্য ব্যাপারেও তেমন কোন ঢাক ঢোল পেটানোর আয়োজন ছিল না। প্রচার তো দূর অস্ত।"[৩০]

সুতরাং ক্লাসিক রোমান্টিক সহাবস্থান, প্রতীক, প্রাঞ্জলতা, গদ্য পদ্যের সাযুজ্য, আবেগমুক্তি বীভৎসতা সব কিছু নিয়ে কাব্যতত্ত্বে বোদলেয়ার অভিনবত্ববাদী, প্রচল ভেঙ্গে নতুনের অভিসারী। তাঁর কাছে কবিতা কেবল কবিতাই। তার বাণী গ্রহণ ভেঙ্গে নতুনের অভিসারী তার কাছে কবিতা কেবল কবিতাই। তার বাণী গ্রহন করে ধন্য স্বদেশী মালারমে, ভেরলেন, র‍্যাবোঁ তো বটেই, সাগরপাড়ি দিয়ে ইয়েটস এলিয়টসহ সব আধুনিক কবিগণ। সে জন্যই বুদ্ধদেব বসুর মতে Les fleursdu mal এর প্রকাশকাল ১৮৫৭ ই 'আধুনিক কবিতার জন্মক্ষণ'।[৩১]

সাহিত্যের স্বভাব বিচেনায় বলা হয়েছে ষ্টেফান মালার্মে নিস্তাপ, পল ভেরলেন কোমল এবং জা আরতুর র‍্যাঁবো উদ্বেল। এদের সঙ্গে আধুনিক বিশ্বের কবিদের মিলিয়ে বুদ্ধেদেব বসু বলেন;

"কবিতায় সাড়া দিতে পারলেই তাঁর কবিতায় সাড়া সাদা যায়; কিন্তু মালার্মে ভাষ্যনির্ভর এলিয়ট পাণ্ডিত্যের মুখাপেক্ষী এমনকি ইয়েটস অথবা রিলকেরও কোন কোন শ্রেষ্ঠ রচনা তাদের জীবনী অথবা দর্শন না জানা পর্যন্ত, চাবি লুকিয়ে রাখে। তর্কাতীত এই কবিদের গৌরব, এবং এও স্বীকার্য যে দুর্বোধ্যতা শুধু জ্ঞানার্জনের দ্বারা অতিক্রম তাকে শেষ পর্যন্ত, কবিতার একটি দুর্বলতা বলে আমরা মানতে বাধ্য।[৩২]

কিন্তু আধুনিকতার প্রণোদনায় এসব কবি কবিতাকে শেষ পর্যন্ত 'চিরায়ত দৃষ্টির কবিতাই' করে তুলেছেন। কবিতা রচনা ও তার তাত্ত্বিক পরিপ্রেক্ষিত নির্মাণে বিশ্বজুড়ে অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় কিছু নাম আছে, যাদের ওপর আলোচনা এ গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত করা যাচ্ছে না। অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় এমন কিছু নামের মধ্যে আছে ইংরেজ কবি-তাত্ত্বিক ড্রাইডেন-পোপ-জনসন-অ্যাবারক্রমে-হাউসম্যান-ম্যাথু আরনল্ড (১৮২২-১৮৮), বিশ শতকের মহৎ প্রতিভা উইলিয়াম বাটলার ইয়েটস (১৯৬৫-১৯৩৯), উনিশ শতকের মার্কিন কবি লেখক এডগার অ্যালেন পো' (১৮০১-১৮৪৯) ফরাসি পল ভেরলন (১৮৪৪-১৮৯৬), পল এলুয়ার, জার্মান যোহান ওলফগ্যাঙ গ্যোটে (১৭৪৯-১৮৩২), রাইনার মালিয়া রিলকে (১৮৭৫-১৯২৬), বের্টোল্ট ব্রেখট (১৮৯৮-১৯৫৬) এবং আমেরিকাসমূহ, আফ্রিকা ও রুশ অন্যান্য কবি। বিশ্বজুড়ে যুগে যুগে নিজেদের অবদানে কীভাবে সমৃদ্ধ করার আন্দোলনে ব্রতী এসব কবি তাত্ত্বিকের ওপর

আনুপূর্বিক আলোচনা প্রত্যাশিতও বটে। সেক্ষেত্রে তিরিশের বাঙালি কীভাবে দের সঙ্গে বিশ্ব ঐতিহ্যের মহারথিদের একরকম আনুপূর্বিক যোগসূত্র রচনা সম্ভব হত। তবে, বাংলা কবিতার বিনির্মাণে কল্লোলগোষ্ঠী ও তিরিশের কবিদের শিল্পপ্রচেষ্টায় তাদের প্রাসঙ্গিকতা বিবেচনায় আপাতত সে আলোচনা সন্নিবেশিত হল না।

স্টিফেন মালারমে আধুনিক ফরাসি কবিতার অন্যতম পুরোধা। সাংগঠনিকতাবাদেরও অন্যতম প্রবক্তা। আধুনিক প্রতীকবাদী কথাটার সত্যিকারভাবে যদি কোন ঐতিহাসিক ও দার্শনিক অর্থ থেকে থাকে তবে তার কৃতিত্ব মালারমের। উনিশ শতকের প্যারিসে সাহিত্যের আড্ডা, তত্ত্বের উদ্ভাবনা ও কবিতার নতুন পথ নির্মাণে তেমন কাউকে পাওয়া যায় না। ১৮৬৭-তে মারা যান বোদলেয়ার, ১৮৭৪ বা ৭৬-এ নিরুদ্দিষ্ট হন র‍্যাবোঁ, অস্থির ছন্নছাড়া ভেরলেন পরিব্রাজনে সদা ব্যস্ত। সত্যিকার অর্থে ওই সময় ফরাসি কবিতার নেতৃত্বের জায়গাটা প্রায় শূণ্য। মালারমে নিজ যে খুব উৎসাহী ছিলেন, এমন নয়। বরং এসব কাজ স্বাভাবিক বিকাশের পথে অন্যদের জন্য তিনি রেখে দিয়েছিলেন। কিন্তু,

“ The hermetic preciseness of his later verse made him the object of a cult. Two of his longer pieces, the icily poised Herodiate (1864) and the sensuously textured prelude a l'apres midi dun faune (1865) celebrate the hidden virtues of defement and absence against the vulgarity of possession and plentitude ”[৩৩]

তার সনেট ও এলিজিগুচ্ছ অনুভববেদ্য ভাষা ও অন্তর্গত গীতিধর্মী সংবেদনে উপভোগ্য হয়ে ওঠে। সমকালীন কবিতায় বাক্যতাত্ত্বিক ও রূপকধর্মী বিরূপতা ভেঙে এক ধরনের সাঙ্গীতিক মূর্চ্ছনা আনেন মালারমে। কবিতায় তিনি অনুবেদনকে প্রকাশ করতে সমর্থ হন। (জাহাঙ্গীর তারেক) রচিত ‘প্রতীকবাদী সাহিত্য’ গ্রন্থ অবলম্বনে কাব্যতাত্ত্বিক আলোচনায় মালারমের গুরুত্বপূর্ণ কিছু ঘোষণা ও উক্তি:

১) অতিশয় অভিনব কাব্যাদর্শ থেকে বেরিয়ে আসা অতিশয় জরুরি। এ ঘোষণা তাৎপর্যপূর্ণ এ কারণে যে কোন আঙ্গিকই শেষ পর্যন্ত আর অভিনব থাকে না। সুতরাং তা থেকে বেরিয়ে আসাই কবির অন্বিষ্ট। কবির অভিনবত্বেও চাই গতির সঞ্চার।

২) কাব্যাদর্শ সম্পর্কে তার ঘোষণা চিত্রিত করা, বস্তুকে নয়, বস্তু উদ্ভুত অভিঘাতাকে। সমস্ত কথাই লুপ্ত হওয়া চাই সংবেদনের সজীবতার সামনে।

৩) সুন্দর ছাড়া আর কিছুই নেই, এবং তার একটি মাত্রই পরোৎকৃষ্ট অভিব্যাক্তি আছে কবিতা। বাদ বাকি যা কিছু সবই মিথ্যা।

৪) কবিতার জন্য মস্তিস্কের ওপর আরোপ করতে হয়েছে পরম শূণ্যতার অনুভব। বিশ্বলোকের সঙ্গে কবিতার অন্তরঙ্গ অনুবন্ধ বিদ্যমান।

৫) কবিতা 'ক্ষণকালমাত্রস্থায়ী অন্তর্মুদ্রাকে চিহ্নিত ও লিপিবদ্ধ করবার এক অন্তরঙ্গ অন্যন্য ভঙ্গি আবিস্কার।'

৬) উৎকৃষ্ট শব্দের সুশৃঙ্খল সুসমন্বয় কবিতার শর্ত।

র‍্যাবোঁ সম্পর্কে বলা হয়েছে æOne of hte most revolutionary figures in 19th cent. Literature" যিনি মাত্র ১৬ বছর বয়সে সব রকম প্রচলিত ফর্ম ও রীতি অস্বীকার করেন। এমনকি পারিবারিক শাসন অগ্রাহ্য করে কাব্বালিক ও আলকেমিপন্থী মতবাদে দীক্ষিত হয়ে ওঠেন। তাঁর কবিতায় সমকালীন সমাজ, রাজনীতি ও ধর্মবোধ সূক্ষ্ম-স্বকীয় ব্যঞ্জনসহ দৃশ্যমান হয়ে ওঠে। ১৭ বছর বয়সে তার বিখ্যাত কাব্য 'Le Bateau ivre' প্রকাশিত হয়। এ গ্রন্থ মানুষের অন্তর্গত বাস্তবতার অজানা তন্ত্রীতে আলো ফেলতে সক্ষম হয়, যা দুই প্রজন্মের লেখকদের মধ্যে সেতুবন্ধন হিসেবে বিবেচিত হয় :

A hymn to the quest of unknown realities which became a sacred text for the next two generations of writers. between 1771 and 1773 the period of his association with verlaine and his sojourns in England he undertook a programme of the disorientaion of the senses in order to try to turn himself into a voyant or seer. This resulted in his most original work. two collections of prose poems. les illumiations which explored the visionaty possibilities of his experiment and une saison en enfer recoding its moral and psychological failure.[34]

মাত্র ১৯ বছর বয়সে তাঁর কবিজীবনের সমাপ্তি ঘটে এবং তিনি গৃহত্যাগী হয়ে নিরুদ্দেশ হন। এ সময়ের মধ্যে তাঁর রচনা হচ্ছে দুটো ছোট কাব্য, কিছু খণ্ড কবিতা, একটা জবানবন্দি ও কিছু চিঠিপত্র। ১৮৭০-১৮৭৪ এ মোট প্রায় পাঁচ বছরে রচিত সামান্য কিছু রচনাই তাকে বিশ্বকাব্যের মহাবিস্ময় হিসেবে স্বীকৃতি দান করে। তার কারণ সম্পর্কে আলাউদ্দিন আল আজাদ জানান:

> র‍্যাবোঁকে অন্তত খানিকটা বুঝতে হলেও জানতে হবে ফরাসি সিম্বলিষ্ট কাব্যকে, ভেরলেনের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব তার সমস্ত জীবন। বৃহত্তর পাঠক সমাজে তিনি পরিচিতি হতে শুরু করেছেন তখন সবেমাত্র। ভেরলেন তাঁর চেয়ে দশ বছরের বড়ো মালার্মে বারো বছরের এবং লাফর্গ ছোট ছ'বছরের। তারা সম্মান পেয়েছেন অনেক আগে। তবু র‍্যাবোঁকে নিয়ে আজ যতো কাজ হচ্ছে তা সংখ্যার দিক থেকে লাফর্গ সম্বন্ধীয় গবেষণার বহুগুণ বেশি, এবং ভেরলেন ও মালার্মে সম্বন্ধীয় গবেষণায় বহু বিংশতিগুন বেশি। তার জীবন সমন্ধে সমস্ত প্রহেলিকার সমাধান আজো হয়নি। আর কাব্য সম্বন্ধে যে প্রহেলিকা পনেরো থেকে উনিশ বছর বয়স পর্যন্ত যে ছেলে কবিতা লিখেছিলো, সে কি করে এই রকম কবিতা লিখতে পারলো সে প্রহেলিকার সমাধান কখনো হবে না।[৩৫]

উল্লেখ্য, উদ্ধৃত বক্তব্য 'নরকে এক ঋতু' গ্রন্থের ভূমিকায় লোকনাথ ভট্টাচার্যকৃত মন্তব্য অনুসরণে বলে আলাউদ্দিন আল আজাদ স্বীকার করেছেন। মোটকথা, প্রায় অর্ধশতক আগে কৃত ও অনুকৃত এ মন্তব্য আজো প্রাসঙ্গিক। র‍্যাবোঁ ফরাসি প্রতিকবাদী কবি। এই প্রতীবাদের বৈশিষ্ট্য ছিল অগ্রজ রোম্যান্টিক ও অনুজ পরাবাস্তবাবাদীদের মতো প্রচলিত সমাজ ও পূর্বসূরীদের বিরুদ্ধে অনাস্থা। তবে প্রতীকবাদের বৈশিষ্ট্য বলে স্বীকৃত বেশ কিছু বিষয়ে র‍্যাবোঁর মধ্যে স্পষ্টভাবে পাওয়া যায় না। যেমন, 'অস্পষ্টতার অন্বেষা', রেখাবিন্যাসে সস্ত উচ্চাবচতা ও 'অমসৃণতা অপনোদন', 'রঙের জ্বল জ্বলে তীব্রতার বদলে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ তারতম্যে বর্ণসম্পাত', 'পদ্য কি গদ্য চরণের সাঙ্গীতিকতা', 'অলঙ্কারবহুল বা ললিতকোমল স্বপ্নিল কবিতা রচনা'। বরং র‍্যাবোঁর মধ্যেই প্রথম দেখা গেল একজন কবিকে, যিনি ইহজাগিতিক ইন্দ্রিয়সংবেদন ও বস্তনিচয়ের ভেতর প্লেটোনিক কিংবা সুইডেনবার্গীয় অন্য এক জগতের প্রতিষঙ্গ আবিস্কার করার দাবি জানিয়েই ক্ষান্ত হলেন না, প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হলেন বাস্তবকে একেবারে অতিক্রম করে গিয়ে, নির্মমভাবে বলি দিয়ে, তাকে নবরূপে গড়তে।[৩৬]

র‍্যাঁবো যাকে বলা হয়েছে, অলোকদ্রষ্টা কিশোর, মূলত দুটি চিঠি থেকে তার কাব্যদৃষ্টির পরিচয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সাহিত্য বিবেচনায় ওই চিঠির বিশেষত্ব তথা তার কাব্যতত্ত্ব নিম্নে আলোচিত হল:

১) কবির আত্মোৎসর্গ করার বা উৎসন্ন হওয়ার এবং প্রথমেই নিজেকে সমাজের প্রান্তদেশে স্থাপন করার দৃঢ় সংকল্প। পূর্ববর্তী ভিইনি, গোতিয়ে, বোদলেয়ার যে অনাস্থা স্থাপন করেছিলেন সমাজের প্রতি, কবির অধিকার বিষয়ে যে মনোভাব পোষণ করেছিলেন র‍্যাবোঁ এখানে তা অঙ্গীকা করে নিয়েছেন। তিনি মনে করেছেন, কবিকে ঝাপ দিতে হবে পঙ্ককুণ্ডে, একাকার হতে হবে ক্লেদে, কর্দমে ঝুকি নিতে হবে নিজের পন্থায় শহীদ হাবার, সমাজের পাপক্ষয়ের জন্য আত্মহুতি দেবার, সে সমাজ নিজ বিবেককে ঘুম পাড়াতে চায় তাকে সামাজচ্যুত করতে হবে।[৩৭]

২) বক্তৃতাবিলাস সম্পর্কে তিনি ব্যক্ত করেছেন তার অকপট অবজ্ঞা। আত্মগত কবিতার প্রতি তার ঘৃর্ণাও অকৃত্রিম ও উচ্চকণ্ঠ। আত্মগত কবিতা বলতে র‍্যাবোঁ বুঝিয়েছিলেন নিজের আবেগ অনুভূতি অভিযোগের অব্যবহিত প্রকাশ, নিজের কথা বলবার তার সীমাহীন ব্যাকুলতা, যেহেতু কবির বিচারে কেউ যদি মনে করে যে কবি শুধু কবিই, তিনি অর্থাৎ পাঠক নন একই সঙ্গে, তবে তো সে স্বভাবত মূঢ়[৩৮] প্রসঙ্গত, ভিক্টর হুগো এক রচনায় কবির নিজের কথা বরার সপক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করেছিলেন। কিন্তু র‍্যাবোঁর দৃষ্টিতে এরূপ আত্মকেন্দ্রিক কবিতা বিশ্বাস ও সঙ্কীর্ণ।

৩) র‍্যাঁবোর মতে, কবি বস্তুর মধ্যে নিজেকে নিঃশেষ হারিয়ে ফেলবেন না। বস্তুর মধ্যে নিজেকে লীন করে বিশ্বব্রক্ষান্ডের কণামাত্র হওয়ার আগ্রহ তাঁর থাকবে না। কবির ভূমিকা হচ্ছে, যে বস্তুপুঞ্জকে অন্যেরা নিস্প্রাণ বলে বিশ্বাস করে, তাঁর নিজের ভাষায় তা তর্জমা করা এবং অন্য মর্ত্যজীবীর তুলনায় তিনি অধিকতর অন্তরঙ্গভাবে অনুভব করেছেন, এমন কোন মহাজাগতিক শক্তিকে প্রকাশ করা'[৩৯] সে জন্য র‍্যাবোঁ কবিকে অন্যদের থেকে দূরে ভিন্নরূপে আলোকদর্শীতে পরিণত করার কথা বলেছিলেন। র‍্যাবোঁ রোমান্টিকদের অনুভবের ব্যর্থতা প্রসঙ্গে জানান, শিল্পকর্ম হবে গায়কের গীত ও উপলব্ধি চিন্তা। কবিকে নিজের সম্পর্কে জ্ঞান অর্থাৎ পূর্ণজ্ঞানের অধিকারী হতে হবে। তিনি অনির্ণেয়কে নির্ণয়

করবেন। কারণ, বিশ্বজননীর আত্মায় যে ভুরি ভুরি অজ্ঞেয় বস্তুজ্ঞান বিরাজিত, তা নিরূপিত করাই কবির দায়িত্ব। এর চেয়ে ক্ষুদ্রতর দায়িত্ব কবির সাজে না।

৪) অত্যন্ত অনমানীয়ভাবে এ বিস্ময়কর কবি কিশোর কাব্যরূপায়নের সঙ্গে সম্পৃক্ত করেন ভবিষ্যতের দাসত্বমুক্ত নারীকে। নারীও আবিস্কার করবে তার নিজস্ব জ্ঞানাতীতকে, যা পুরুষের অনুসংহৃত জ্ঞানানীত থেকে আলাদা। পুরুষরা গ্রহণ ও উপলব্ধি করবে নারীর এ আবিস্কারকে।

৫) র‍্যাবোঁর চিঠির সবশেষ মর্মবাণী হচ্ছে, কবিতা নিজেই সে সৃষ্টিশীল সত্তা যা নিজেই তৈরী করে নেবে তাঁর প্রয়োজনীয় উপায় উপকরণকে।

আধুনিক ফরাসি তথা বিশ্বসাহিত্যে লুই আরগার (১৮৯৭-১৯৮২) অবদান অত্যন্ত শ্রদ্ধেয়। আধুনিক কাব্যের মুক্তিচেষ্টার পটে আরাগঁ ইতিহাসচর্চা ও ঐতিহ্যে আস্থাবান। এ সাম্যবাদী কবির প্রতিরোধ ও প্রেম তাই স্বপ্রতিষ্ঠি হবার চেষ্টায় মূল্যবান। আরাগঁর বিখ্যাত এলসার চোখ নাম কবিতাগ্রন্থের সমালোচনামূলক ভূমিকায় এই সত্য প্রকাশিত:

ভাষার গভীর চর্চা ছাড়া, প্রতিপদে ভাষার পুনর্নির্মাণ ছাড়া কাব্য অসম্ভব। তার জন্যে ভাষার নির্ধারিত সীমা, ব্যাকরণের নিয়ম, বাক্যের কানুন বারবার ভাঙতে হয়। কবিদের পক্ষে এই-ই ত মুক্তির পথে দীর্ঘ উত্তরণ। এবং এই মুক্তিতেই এই প্রকৃতি স্বাধীনতাতেই সম্ভব আমার যথাযথতার প্রয়াস, এই দীর্ঘ পথ প্রায় পঞ্চাশ বছরের অতিক্রম ছিল, বরাবরই এ সমর্থহীন ছিল, উগোর হাতে ধ্রুপদি পদ্যের ভাঙ্গাগড়া থেকে প্রতীকীদের মুক্তছন্দ অবধি ভেরলেনি ভ্রান্তি আর সেইসব মিল বা যমঘটিত কসরতের পরে (দে ১৯৯৭ : ২৫৩)

আধুনিক বিশ্বকবিতার স্বরূপনির্মাণে, তত্ত্বায়নে আরাগঁর উক্তিসমূহের গুরুত্বপূর্ণ ও প্রভাসঞ্চায়ী ভূমিকা আছে। তিনি সেই আধুনিক কবি কাব্যের আভিজাত্যের প্রয়োজনে দুর্বোধ্যতা সৃষ্টি করতেও যিনি কুণ্ঠিত হন না। এ কথা আরাগঁই বলতে পারেন, একটি কবিতা লোকে যতো বেশি বোঝে তা ততো কম কাব্যিক হয়।

অন্যত্র তিনি বলেন:

"কাব্যের ইতিহাস আর টেকনিকের ইতিহাস। যারা আমাদের নীরব করতে চায় তারা সেই শ্রেণির নিকৃষ্ট লেখক, যারা কিছুই নির্মাণ করেনি, যারা শুধু গোটা কয়েক ছক টেনে প্যাচ

> কষেই ক্ষান্ত হয়। আমি তো আজ অবধি কবিতার প্রতিটি অঙ্গ বিষয়ে না ভেবে, আগের লেখা আর পড়া কাব্যাবলী বিষয়ে সচেতন না হয়ে কোন কবিতা লিখিনি।"[৪০]

আধুনিক কবিতান্দোলনে আরাগঁ এত গভীরভাবে অংশগ্রহণ করেছেন যে, কবিতার সমসাময়িক রূপে ক্লান্ত হয়ে দীর্ঘ বহু শতকের উত্তরাধিকার অনুসন্ধান করেছেন। তবে তা নিজস্ব কাব্যভাষা নির্মাণের চেষ্টায়। তিনি মনে করেছেন, লোকোত্তর ভাষার অভিজ্ঞতার সন্ধানে একাগ্র হওয়ায় এমন পথ ধরা সম্ভব নয়, যা অন্যের পক্ষে সার্থক হলেও তার নিজস্ব সাধনায় পরধর্মী। শেষে তিনি বলেছেন যে, তার কণ্ঠরোধ করা যাবে না:

> আমার গান চলবে, সেও তো নিরস্ত্র মানুষের একটা অস্ত্র, কারণ সে মানুষেরই গান, যার পক্ষে জীবনই যথেষ্ট প্রেরণা। আমি গাই, কারণ ঝড়ের সে শক্তি নেই যে সে আমার গানকে ডুবিয়ে দেয়, আর কাল যদি তোমরা তাই করো, তাহলে আমার প্রাণও নিও, কিন্তু গান আমার চলল অনির্বাণ।[৪১]

আরগঁর দেশে প্রায় সত্তর বছর ধরে চলেছে আধুনিক কাব্যের পরীক্ষা। তিনি নিজে বিখ্যাত লেখক, কর্মী, সাংবাদিক। সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েতের বাইরে সাম্যবাদী কবিদের মধ্যে এলুআরের পর তিনি গুরুত্বপূর্ণ। কাব্যের স্বকীয় গতি, ইতিহাস এবং আত্মসচেতন কবিরস্বরূপের আলোচনা তার মধ্যে বিশেষ পরিণতি পেয়েছে। বাংলা কাব্যে ফরাসি সাহিত্যের সমাগোত্র নয়। তবু প্রগতিশীল সাহিত্য বিচারে তাঁর আত্মজ্ঞানের সাক্ষ্য মূল্যবান।

আধুনিক বিশ্ব বিভিন্ন মাত্রিক তত্ত্বে উচ্চকিত। নানা জ্ঞানকাণ্ডের মতো এ যুগে সাহিত্যকেও বিভিন্ন দৃষ্টিকোন থেকে ব্যাখ্যা করার প্রবণতা লক্ষণীয়। আধুনিক বিজ্ঞান প্রসারের পাশাপাশি, দর্শন তথা মানবিদ্যার নানা জ্ঞানকান্ডের গুরুত্বপূর্ণ ও অভিনব দিগন্ত উম্মোচনের ফলে সাহিত্য রচনা ও সমালোচনায়ও এসেছে ভিন্ন ভিন্ন মাত্রা। এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে কার্যকর ও সূক্ষ্ম ভুমিকা রেখেছে চিত্রশিল্পের বিচিত্র সব ধারনা ও আন্দোলন। এসব ধারণা সাহিত্যেও চিত্রশিল্পের সমান্তরাল গতিবেগ সঞ্চারে সক্ষম হয়েছে। বিভিন্ন দার্শনিক প্রত্যয়, ভাষাবিজ্ঞানের বিবিধ প্রসঙ্গ, রাজনীতির তত্ত্ব ও কল্যাণমূলক আবহ, মনোবিজ্ঞান সমাজবিজ্ঞান নৃবিজ্ঞান ফলিত বা প্রাণবিজ্ঞানের আবিস্কার ইত্যাদি বিষয়ে সাহিত্যের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে আন্তঃশৃঙ্খলা সূত্রে (Multi disciplinary approach)। এসব জ্ঞানকাণ্ডের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের প্রসঙ্গ সাহিত্যে প্রভূত গুরুত্ব ও উচ্চতায় আলোচিত হয়েছে। ফলে

দেকার্তে, কান্ট, ফয়েরবাখ, ক্রোচে, মাইকেলেঞ্জেলা, রদ্যা, মার্কস-এঙ্গেলস, ফ্রয়েড-এডলার-ইয়ূং, লেভিস্ট্রস, যেকবসন, স্যসুর, শার্লে, ভিটগেনস্টেইন, চমস্কি, দালি-পিকাসো, কিয়ের্কেগার্ড, সার্তে, দেরিদা, লাকা, ফুকো, গ্রামশি, রোলাঁ বার্থ, সাইদ, স্পিভাক প্রমুখের নাম সাহিত্য ও সাহিত্যতত্ত্বেরর সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আধুনিক ইংরেজ সমালোচক টেরি ঈগলটনের কথাও এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

বাংলা সাহিত্যে রূপ রীতি সম্পর্কিত সচেতন আলোচনা আধুনিককালের। প্রাচীন ভারতীয় আলঙ্কারিকদের পর দীর্ঘদিন এ বিদ্যার বিশেষ উৎকর্ষ বা চর্চার প্রচেষ্টা তেমন একটা পরিলক্ষিত হয় না। বৈদিক বা সংস্কৃত ভাষায় খ্রিস্টপূর্বকাল থেকে সাহিত্যদর্পণকার বিশ্বনাথ কবিরাজ পর্যন্ত যা হয়েছে তা মূলত শাস্ত্র ও অনুশাসননির্ভর আলোচনা। তা-ও সাহিত্যতত্ত্ব সম্পর্কিত আলোচনার জন্য আমাদের অপেক্ষা করতে হল খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতক অবধি। সাহিত্যতত্ত্ব সম্পর্কে প্রথম সচেতন ব্যক্তি বলতে হবে মধুসূদনকেই। এর পূর্বে বিক্ষিপ্ত যা কিছু ভাবনার পরিচয় মেলে তাকে বৈয়াকরণিক ও মেকি ক্লাসিকপন্থী আখ্যা দেওয়া হয়েছে[৪২] উনিশ শতকের মধ্যভাগে বিদেশি আদর্শে সাহিত্য রচনা করতে গিয়ে রূপ রীতির ভাবনায় মধুসূদন বেশ ভাবিত হয়েছেন এবং বিভিন্ন চিঠিপত্রে তার ভাবনার প্রতিপক্ষ হিসেবে Mr. Vishvanath of the Sahityadarpan এর প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন। তা সত্ত্বেও বাংলা ভাষা বিকশিত হওয়ার পর এ প্রচেষ্টা প্রথম পরিলক্ষিত হয় মধ্যযুগীয় কবি আলাওলের মধ্যে। রাগশাস্ত্র বা ব্যাকরণ বিষয়ে তাঁর আগ্রহ, এমনকি গ্রন্থ রচনার কথাও জানা যায়। তবে কবি ও কাব্যে সম্পর্কে তার দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় মেলে পদ্মাবতী কাব্যে :

"কাব্য সিন্ধু শব্দ মুক্তা কবি সে ডুবারু।
বহুযত্নে ডুবি তোলে রতন সচারু।"[৪৩]

প্রসঙ্গত উদ্ধৃত অংশে আলাওলের কবিমানস বিশ্লেষণে তাকে শব্দবাদী কবি বলে মনে করা যেতে পারে। ফরাসি প্রতীকবাদী কবি মালারমে'র মতোই তিনি শব্দনির্বাচনের ওপর জোর দেন। আমাদের প্রাত্যাহিক জীবনের অতল শব্দসমুদ্রে থেকে কবি ডুবুরির দক্ষতায় বেছে বেছে মানিক রতন সংগ্রহ করার মতোই শব্দ নির্বাচন করেন। এই শব্দেই কবিত্ব।

আলাওলের পর অন্নদা মঙ্গল এর কবি ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর (? ১৭৫৯) তার মানসিংহ ভবানন্দ উপাখ্যানের বন্দনা অংশে বলেন :

শিখিয়াছি যেই মত বর্ণিবারে পারি।
কিন্তু সে সকল লোকে বুঝিবারে ভারী।
না রবে প্রসাদগণ না হবে রসাল।
অতএব কহি ভাষা যাবনী মিশাল।

উদ্ধৃত অংশে কবি নিজস্ব শিক্ষার অনুবর্তী কাব্যভাষা ব্যবহার না করে সবার বোধগম্য ভাষা ব্যবহার করার কথা বলেছেন। মোটকথা, কাব্যতত্ত্বের বিচারে তিনি পাঠক তথা জনসাধারণের বোধগম্য প্রাঞ্জল ভাষা ব্যবহার করার রীতিতে বিশ্বাসী।

ভারতচন্দ্রের পর ইংরেজি ভাষাবিলাসী মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩) অবশেষে বুঝলেন 'মাতৃভাষা রূপ খনি, পূর্ণ মণিজালে।[৪৪] আধুনিককালে বুদ্ধদেব বসুও তার ভাষা, কবিতা ও মানুষ্যত্ব প্রবন্ধে অনুভব করলেন, ভিন্ন ভাষায় আর যা কিছুই সম্ভব হোক, সৃষ্টিশীল রচনার জন্য মাতৃভাষাই একামাত্র মাধ্যম:

মানুষ পরভাষায় প্রায় যে কোন কাজই চালাতে পারে, পারে না শুধু কাব্য, নাটক, উপন্যাস লিখতে, সৃষ্টিশীল সাহিত্য রচনা করতে। কেন পারে না? যেহেতু সাহিত্য যেখানে সৃষ্টিশীল সেখানে মানুষের সমগ্র অন্তরাত্মা সক্রিয় হয়ে ওঠে শুধু তার বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়বোধ ও হৃদয়বৃত্তি নয়, তার নির্জ্ঞান মন, তার আত্মায় অধিষ্ঠিত নরক ও স্বর্গ, তার পূর্বপুরুষের ধূসর স্মৃতিপুঞ্জ। সেই আদিম ও আবিল অন্ধকার থেকে যদি কোন স্বচ্ছা মণি আমরা ছেকে তুলত চাই, চাই কোন স্মৃতি, আবিস্কার বা অবিজ্ঞানকে ছিনিয়ে আনতে, সে কাজ সম্ভব হতে পারে একমাত্র সেই ভাষাতে, যা আমাদের অবচেতনের অন্তরঙ্গ এবং যার মধ্যে পরতে পরতে জড়িত হয়ে আছে আমাদের সমস্ত পূর্বপুরুষের বহুযুগব্যাপী জীবনসূত্র। এবং এই কাজেই কবি করে থাকেন; সচেতন জীবনের সঙ্গে অচেতনের ঘটকালি করেন তিনি; আমাদের বন্য বিশৃঙ্খল স্বপ্নসত্ত্বাকে চিন্ময় রূপ দান করেন, চৈতন্যকে পূর্ণতা দেন স্বপ্নযামিনীর সংস্পর্শে এনে। মানুষের এই একটি কাজ, যা ভাষা বিনা সম্ভব হয় না, এবং বিশেষ ব্যক্তির পক্ষে বিশেষ ভাষায় ভিন্ন সম্ভব হয় না।[৪৫]

আধুনিক বাংলা সাহিত্যে সাহিত্যের রূপ রীতি নিয়ে প্রথম সচেতন প্রবক্তা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-৯৪)। উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যে তিনি কেবল অত্যন্ত সফল

সাহিত্যিক নন; বরং সাহিত্য রচয়িতাদের জন্য পথপ্রদর্শকও। অবশ্য তার প্রদর্শিত পথ পরবর্তীকালে শিল্পের বিবেচনায় নন্দিত বা নিন্দিত বা নিন্দিত যা-ই হোক না, সাহিত্যের বিবিধ বিষেয়ে তার প্রাজ্ঞ অভিমত উত্তরকালে সবিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। সে কারণে, একজন সৃষ্টিশীল সাহিত্যকের পাশপাশি তিনি বাংলা সাহিত্যের আদি তাত্ত্বিকও বটে, যদিও তত্ত্বসাধনা তার অভীষ্ট ছিল না কখনো। উনিশ শতকের বাংলাদেশে বিদেশিয়ানার প্রভাবে সদ্য আধুনিকতার পথে হাঁটি হাঁটি পা পা সংস্কৃতিতে তিনি স্বভাবত পাশ্চাত্য মতবাদ হৃদয়ে ধারণ করেছেন। বিবিধ প্রবন্ধের উত্তরচরিত আলোচনায় তিনি সৌন্দর্য সৃষ্টিকেই কাব্যের মূখ্য উদ্দেশ্যে বলে স্বীকৃতি দিলেও এক বিশাল পশ্চাদপপদ জনপদে সামাজিক শ্রেয়োবোধের প্রেষণাও তাকে বহন করতে হয়েছে। তাই লক বেন্থামাদি দার্শনিকদের উপযোগবাদ তাকে মুগ্ধ করেছিল তাই সমাজ সংস্কারক ঋষির মতোই নবীন লেখকদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন:

> "যদি মনে করিতে পারেন যে, লিখিয়া দেশের বা মনুষ্যজাতির কিছু মঙ্গল সাধনা করিতে পারেন, অথবা সৌন্দর্য সৃষ্টি করিতে পরেন, তবে অবশ্য লিখিবেন। যাহারা অন্য উদ্দেশ্য লেখেন তাহাদিগকে যাত্রাওয়ালা প্রভৃতি নীচ ব্যবসায়ীদিগের সঙ্গে গণ্য করা যাইতে পারে"[৪৬]

বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যতত্ত্বের মূলবিষয়গুলো নিম্নরূপে বিবেচনা করা যেতে পারে:

c_gZ: বঙ্কিমচন্দ্র প্লেটোর মতোই সাহিত্যকে ঈশ্বরের সৃষ্টির অনুকারী বলে ভাবেন। ঈশ্বরানুগত্য বা ধর্মীয় বিষয়ে উদাসীন সাহিত্য তার বিবেচনায় অগ্রহণযোগ্য। তাই পাঠকের উদ্দেশ্যে তিনি উপদেশ দিতেন ভালবাসনে:

> যাহারা কবির সৃষ্টি পদার্থের লোভে সাহিত্যে অনুরক্ত, তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, ঈশ্বরের সৃষ্টির অপেক্ষা কোন কবির সৃষ্টি সুন্দর? বস্তুত: কবির সৃষ্টি, সেই ঈশ্বরের সৃষ্টির অনুকারী বলিয়াই সুন্দর। নকল কখন আসলের সমান হাইতে পারে না। ধর্মের মোহিনীমূর্তির কাছে সাহিত্যের প্রভাব বড় খাটো হইয়া যায়।[৪৭]

সে কারণে তিনি সাহিত্যকে ধর্মের অনুকারী ও অগ্রবর্তী ভাবেন।

wØZxqZ: সাহিত্য সাধনা অর্থলাভ বা যশের নিমিত্তে হওয়া অনুচিত। অর্থ হয়তো কখনো কখনো আসে; কিন্তু অর্থ যশের পেছনে লেখকের মনোযোগ বঙ্কিমচন্দ্র সমর্থন করেন না; যশের জন্য লিখিবেন না। তাহা হইলে যশও হইবে না, লেখাও ভাল হইবে না।

লেখা ভাল হইলে যশ আপনি আসিবে।[৪৮] তিনি মনে করেন, সাহিত্যে বিদ্যা ফলানোর চেষ্টা বিরক্তিকর। লেখকের ভেতর বিদ্যা থাকলে তা এমনিতেই প্রকাশিত হবে। যে কোন রচনায় তিনি উদ্ধৃতি ব্যবহার করার বিরোধী। কারণ, এতে লেখকের চিন্তার প্রতিফলন ঘটে না।

ZZxqZ: বঙ্কিম সৌন্দর্যপ্রিয় হলেও নৈতিকতা, সামাজিক কল্যাণ ও ধর্মীয় উৎকর্ষের বহান হিসেবে সাহিত্যকে দেখতে চেয়েছেন। তিনি বলেন, যাহা অসত্য, ধর্মবিরুদ্ধ, পরনিন্দা বা পরপীড়ন বা স্বার্থসাধন যাহার উদ্দেশ্যে সে সকল প্রবন্ধ কখনও হিতকর হইতে পারে না, সুতরাং তাহা একেবারে পরিহার্য। সত্য ও ধর্মই সাহিত্যের উদ্দেশ্য। অন্য উদ্দেশ্যে লেখনি ধারণ মহাপাপ।[৪৯]

PZ_Z: বঙ্কিমচন্দ্রের মতে, লেখা হঠাৎ করে না ছেপে কিছু দিন রেখে দিলে ধীরে ধীরে তা উৎকর্ষের বোধ বাড়ে লেখকের মধ্যে। এভাবে কোন লেখা পরিণতির পথে ধাবিত হয়। সাময়িক সাহিত্য ক্ষতিকর বলে তার অভিমত। কারণ, সাময়িক সাহিত্য লেখকের অধিকারবোধের ব্যাপারে উপেক্ষিত হয়। যার যে বিষেয়ে দখল বা অধিকার নেই, সে বিষয়ে তিনি অনধিকার চর্চায় রত হতে পারেন।

cÂgZ: তিনি অনাবশ্যক অলঙ্কার ব্যবহার করার পক্ষপাতী নন। কারণ, প্রসঙ্গক্রমে লেখার প্রয়োজনেই অলঙ্কার ব্যবহৃত হবে। লেখার ধরণই অলঙ্কার আমদানি করে, অন্তত সৎ লেখকের ক্ষেত্রে। বাহুল্য অলঙ্কারে লেখকের আগ্রহ সাহিত্যজনোচিত বলে তিনি মনে করেন না। সরলতাকেই তিনি শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার বলে মনে করেন।[৫০]

lôZ: সাহিত্যরচনায় অনুকরণ দূষণীয় বলে তিনি মনে করেন।

mßgZ: প্রমাণযোগ্য নয় এমন কথা সাহিত্যে ব্যবহার করার বিরোধী তিনি।

রবীন্দ্রনাথের সারস্বত কাব্যতত্ত্বে বহিরঙ্গ বিবেচনা যান্ত্রিক বা অভ্যাসিকভাবে প্রাধান্য পায় না। তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভাবনে অন্তর্গত বিষয়কে। অন্তরের প্রয়োজনেই বহিরঙ্গ রূপলাভ করে। তিনি সাহিত্যকে আনন্দ হিসেবেই দেখতে আগ্রহী। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যতত্ত্ব ব্যাখ্যায় প্রসঙ্গে বিষ্ণু দে বলেন:

"প্রকাশচেষ্টার মূখ্য উদ্দেশ্য প্রয়োজনের রূপ নয়, বিশুদ্ধ আনন্দরূপকে ব্যক্ত করা। তার তত্ত্বজগতে সত্য ও তথ্য অসংলগ্ন, বিরোধী, তাই আনন্দরূপকে ব্যক্ত করার প্রয়োজনও যে

এক প্রকার প্রয়োজন, সে তর্ক তোলা নির্বুদ্ধিতামাত্র। রবীন্দ্রনাথের ব্যাখ্যা আনন্দদায়ক রচনা, অন্তত আমার মতো লোকের কাছে, যে এই রাবীন্দ্রিক হাওয়াতেই প্রাণ পেয়েছে।"[৫১]

'সাহিত্য' 'সাহিত্যে স্বরুপ', 'আধুনিক সাহিত্য' ইত্যাদি গ্রন্থে সাহিত্য বা শিল্প সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের স্বকীয় শিল্পদৃষ্টির প্রকাশ ঘটেছে। অবশ্য সামগ্রিক রবীন্দ্ররচনাবলীর পরতে পরতে কবির নন্দনদৃষ্টি তথা সাহিত্যবিষয়ক ভাবনার পরিচয় লুকিয়ে আছে। সেসব পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে উদঘাটন করে বর্তমান আলোচনায় কল্লোলগোষ্ঠী তথা তিরিশের কবিদের শিল্পদৃষ্টির বিবেচনায় প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক বিবর্তন প্রক্রিয়ার পরিচয় জানা। রবীন্দ্রনাথ যেহেতু অবলম্বন গ্রহণ-বর্জন বিরোধিতায় তিরিশের কাব্যভাবনার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বাতিঘর সে কারণে, তার সাহিত্যতত্ত্বের মূলসূত্র সমূহের সঙ্গে পরিচিত হওয়াই এ আলোচনার উদ্দেশ্য। রবীন্দ্র সাহিত্যতত্ত্বের কয়েকটা মূলসূত্র নিম্নরূপ:

GK: mwn‡Z¨i ¯i/c: সাহিত্যে স্বারুপ্য নিয়ে বর্তমান গবেষণায় বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্র দৃষ্টিভঙ্গি উল্লেখযোগ্য। তিনি একে দেখেছেন 'সারস্বত স্রষ্টার দুর্লভ শক্তি' হিসেবে[৫২] সাহিত্যে শব্দের ধাতুগত অর্থ বিবেচনা করে রবীন্দ্রনাথ মনে করেছিলেন সহিতত্ব থেকেই রসসাহিত্যের উৎপত্তি। সহিতত্ব হচ্ছে মিলন, সান্নিধ্য, ঘনিষ্ঠতা। সাহিত্যের উদ্দেশ্য প্রবন্ধে তিনি বলেছিলেন, সাহিত্য অর্থেই একত্র থাকিবার ভাব মানবের সহিত থাকিবার ভাব মানবকে স্পর্শ করা, মানবকে অনুভব করা।[৫৩] প্রথম যৌবনেই (১৮৮৭ সালে ভারতীতে লেখা উদ্ধৃত প্রবন্ধ) রবীন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন, সাহিত্যে অর্থাৎ মিলনই হচ্ছে সারস্বত সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য। কিন্তু এ মিলন কার সঙ্গে কার সে যে কেবল ভাবে ভাবে ভাষায় ভাষায় গ্রন্থে গ্রন্থে মিলন তাহা নয়, মানুষের সহিত মানুষের অতীতের সহিত বর্তমানের, দূরের সহিত নিকটের অত্যন্ত অন্তরঙ্গ যোগসাধন ব্যতীত আর কিছুর দ্বারা সম্ভব নহে"।[৫৪]

'B: mwn‡Z¨ D‡Ïk¨: সাহিত্যে চিরকাল মানুষকে সঙ্গ দেয়, আনন্দ দেয়। এরূপ সঙ্গ ও আনন্দ আরো অনেক কিছুই দেয়। তবে সেসবের উদ্দেশ্য তা নয় সর্বদা। সাহিত্যে তা করলেও তার উদ্দেশ্য এমনটা তা নিশ্চিত করে বলা সম্ভব নয়। বরং যা বলা যায়, সাহিত্যে বা আর্ট স্বতঃস্বাধীন; তা নিজেই একটা সত্তা। এ উদ্দেশ্য বা উপযোগিতার প্রশ্ন সর্বৈব বা অবিতর্কিত নয়। যেটা রবীন্দ্রনাথ বলেন " সাহিত্যের অর্থই হল সম্মিলন,

একত্র থাকবার ভাব। সহিতত্ব অর্থাৎ সকলের সঙ্গে মিলিত হয়ে থাকবার আকাঙ্খা সাহিত্যে কথাটার তাৎপর্য। সাহিত্যে প্রভাবে হৃদয়ে হৃদয়ে শীতাতপ সঞ্চারিত হয়, বায়ূ প্রবাহিত হয়, ঋতুচক্র ফিরে, গন্ধ গান ও রূপের হাট বসিয়া যায়।[৫৫] তাই তিনি দেখেন: পর্যবেক্ষণকারী মানুষ বিজ্ঞান রচনা করে[৫৬] কিন্তু কেন করে সে প্রশ্ন অস্পষ্ট। তিনি মনে করেন " সাহিত্যে আমরা সত্য চাইনে, চাই মানুষ"[৫৭]

wZb: mwn‡Z¨ ev¯ÍeZv: সাহিত্যে বাস্তবতার প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা বিস্তর। বর্তমান গবেষণায় কল্লোলগোষ্ঠীর শিল্পমানস অন্বেষণ সূত্রে প্রসঙ্গটা আলোচিত হয়েছে। কথা হচ্ছে, সাহিত্যে বাস্তবতা প্রাসঙ্গিক নয়। কিন্তু সে বস্তবতা যেন সমকালীনতায় আক্রান্ত হয়ে সীমাবদ্ধ হয়ে না পড়ে। সাহিত্যের প্রয়োজন সমকালীন বাস্তবতাকে সর্বকালীন, সর্বজনীন ও চিরায়ত করে তোলা। সাহিত্যের বাস্তবতা রবীন্দ্রনাথের কাছে নির্বাচন সাপেক্ষ। তিনি বলেন, বাস্তবই হচ্ছে মানুষের জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে নিজের বাছাই করা জিনিস। নির্বিশেষে বিজ্ঞানে সমান মূল্য পায় যা তা। সেই বিশ্বব্যাপীী যা তা থেকে বাছাই হয়ে আমাদের আপন স্বাক্ষর নিয়ে আমাদের চারপাশে এসে ঘিরে দাড়ায় তারাই আমাদের বাস্তব।[৫৮] সুতরাং রবীন্দ্রনাথের কাছে সাহিত্যে বাস্তবতার রয়েছে ভিন্নতর ভাবনা ও ব্যঞ্জনা। সে ভাবনা গ্রহণ সূত্রেই সাহিত্যে বাস্তবতার ব্যাপারটা যাচাই করার প্রয়োজন আছে।

Pvi: cKvkZË: সাহিত্যে প্রকৃতপক্ষে লেখকের আত্ম প্রকাশ। এ রীতি প্রাচীনকালে ছিল, আছে আজও। তবে প্রাচীনকালে বিষয়ের সঙ্গে বিষয়ী একাত্ম হয়ে যেত; আর আধুনিককালে শিল্পী নিরাসক্তভাবে দূরে অবস্থান করেন। প্রাচীন সাহিত্যে প্রকাশের মধ্যে জীবনের মূলতত্ত্বের প্রকাশ লক্ষ্য করা যেত। অন্তপ্রকৃতি; বহির্জগতের জ্ঞান, ও আজন্ম সংস্কার জীবনের অন্তঃস্থ কেন্দ্রে মিলিত হয়ে ঐক্যলাভ করত। এ ঐক্যই মূলতত্ত্বরূপে ব্যাখ্যাত হয়েছে। জীবনে মূলতত্ব লেখকের হৃদয়ে বাস করে তাকে প্রেরণা দিলেও প্রকাশ হল সাহিত্যের প্রথম সত্য। এর পরিনাম হল ইন্দ্রিয় মন ও আত্মার সমষ্টিগত মানুষকে প্রকাশ করা। কারণ, সমগ্র মানুষকে প্রকাশের চেষ্টাই সাহিত্যের প্রাণ। 'সাহিত্যে' গ্রন্থের বিশ্বসাহিত্যে প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেন যে, সাহিত্যে প্রকাশিত হয় প্রাচুর্য যা প্রয়োজনের মধ্যে নিঃশেষ হয় না। এ ঐশ্বর্যই হল রস যার

বন্যা সাহিত্যে ঢেউ তুলে কলধ্বনি করে চলে যায়। প্রকাশ তত্ত্ব সম্পর্কে তিনি আরো বলেন, নিজের পূর্ণ প্রকাশে আনন্দ। গুণী যেখানে গুণী, মা যেখানে মা, সেখানে কাজ তাদের যত কঠিন হোক, সেখানে তাদের আনন্দ। আনন্দ দুঃখকে আত্মসাৎ করে নিতে পারে।[৫৯] এ আনন্দ হল সৃষ্টি বা প্রকাশতত্ত্বের শেষ কথা। এ কথারই সমর্থন পাওয়া যায় সত্যেন্দ্রনাথ রায়ের মন্তব্যে সৃষ্টির প্রেরণা আর প্রকাশের প্রেরণা একই কথা। তার মূলে রয়েছে মানুষের আত্ম সম্প্রসারণের প্রেরণা সীমাহীন আত্মোপলব্ধির ক্ষুধা। এই আত্মোপলব্ধিতেই আনন্দ। এইখানেই সত্য, এইখানেই আনন্দ।[৬০]

cvP: mvwn‡Z¨ Dc‘vb: সাহিত্যের উপাদান কী এ প্রশ্নে সাধারন মানুষও নিশ্চয়ই সহজভাবে জবাব দেবে জীবন ও বিশ্বসৃষ্টির যাবতীয় কিছুই সাহিত্যের উপাদন। সাহিত্যের উদ্দেশ্য প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, সহিতত্বই সাহিত্যের প্রধান উপাদান; সে বিচ্ছিন্নকে এক করে, এবং যেখানে ঐক্য সেইখানে আপন প্রতিষ্ঠাভূমি স্থাপন করে। যেখানে একের সহিত অন্যের, কালের সহিত কালান্তরের গ্রামের সহিত ভিন্ন গ্রামের বিচ্ছেদ, সেখানে ব্যাপক সাহিত্যে জন্মিতে পারে না।[৬১] প্রথম যৌবনেই সাহিত্যে উপাদান সন্ধানে তিনি আতের খবর' বের করে আনার কথা বলেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে, সাহিত্য বিশুদ্ধ নিরবলম্ব হতে পারে না, দেশ কাল যুগ জীবনের মধ্যেই তার তার উৎপত্তি, বিকাশ, বিনাশ। আর তার মতে সবই যেহেতু নিয়মের ফল; সাহিত্যও নিয়মের ফল সাহিত্যে দেশের অবস্থা এবং জাতীয় জীবনের প্রতিবিম্ব। সাহিত্যে সৃষ্টি, উপলক্ষ, উপাদান ইত্যাদি বিষয় নিয়ে রবীন্দ্রনাথ নানাবিধ মত প্রকাশ করেছেন। এখানে তার সামান্য ছোয়াই কেবল দেওয়া সম্ভব। তার বেশি চেষ্টা করা আপাতত পরিহার্য।

Qq: †mŠ›‘hZË: সৌন্দর্য সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের মনোভাব পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে। উত্তরচরিত এ তিনি বলেছেন, সৌন্দর্যসৃষ্টিই কাব্যের মুখে উদ্দেশ্যে।[৬২] অবশ্য এ সৌন্দর্য অর্থে শুধু বাহ্যপ্রকৃতির রূপ বা শারীরিক সৌন্দর্য নয়, সকর প্রকারের সৌন্দর্যকে বুঝতে হবে। স্বভাবানুকারীরা ব্যতীত সৌন্দর্য জন্মে না। সৌন্দর্য বস্তুভিত্তিক হলেও তা স্বভাবাতিরিক্ত[৬৩] সুতরাং যা প্রকৃত তা অসম্পূর্ণ, দোষ সংস্পৃষ্ট, পুরাতন এবং অনেক সময় অস্পষ্ট। সৌন্দর্য তাই প্রশান্ত মূহূর্তে পূর্ব অনুভূত আবেগের প্রকাশ। সে

কারণে প্রকৃতির সঙ্গে তার বিষমতা থাকা স্বাভাবিক। সৌন্দর্যের কারণ প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেন, যে সুন্দর তার মধ্যে বিষমতা কিছু নাই। তাহার আপনার মধ্যে আপনার পরিপূর্ণ সামঞ্জস্য : যে সুন্দর, কেবল যে তাহার নিজের মধ্যে সামঞ্জস্য আছে তাহা নয়, সৌন্দর্যের সামঞ্জস্য সমস্ত জগতের সঙ্গে। সৌন্দর্য জগতের অনুকুল। জগতের মধ্যে যে সুষমা ও ঐক্যবোধ আছে তার সঙ্গে সৌন্দর্যের মিলন ঘটে। সৌন্দর্যের বোধ জগতের সবার সঙ্গে আত্মীয়স্থাপন করে। জগৎতকে করে তোলে আনন্দের কেন্দ্রবিন্দু।[৬৪]

mvZ: mwn‡Z¨ ‘tLev‘: ব্যক্তিগত দুঃখ উচ্ছাসে সাধারনত সাহিত্য হয় না। তাতে চোখের জল সাহিত্যেকের শিল্পদৃষ্টিকে ছাপিয়ে যায়। ব্যক্তিগত দুঃখ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ নিজেও বলেছিলেন, দুঃখের দিনে লেখনিকে বলি লজ্জা দিও না/ সকলের নয় যে আঘাত তা ধরো না সবার চোখে। প্রসঙ্গত, মানুষের ব্যক্তিগত দুঃখের সংবাদে যে কারো হৃদয় করুণায় বিগলিত হয়। কিন্তু সাহিত্যে শোকবিধুর করুণরস থেকেও পাঠক লাভ করে বিশেষ আনন্দ। সে কারণে, রবীন্দ্রনাথ ব্যক্তিগত দুঃখ ও কাব্যের দুঃখবাদকে আলাদা করেই দেখতে চেয়েছেন। তার মতে, সাহিত্যসৃষ্টি শিল্পসৃষ্টি সেই প্রলয়লোকে যেখানে দায় নেই, ভার নেই, যেখানে উপকরণ মায়া; তার ধ্যানরূপটাই সত্য যেখানে মানুষ নিজের মধ্যে সমস্ত আত্মসাৎ করে আছে। অন্যত্র রবীন্দ্রনাথ বলেন: রামলীলাতে মানুষ যোগ দিতে যায় খুশি হয়ে, লীলা যদি না হত তবে বুক যেত ফেটে’। অর্থাৎ রামলীলায় রসের উপলব্ধি ঘটে বলে মানুষ আনন্দ পায়। করুণরসে অন্তর দ্রবীভূত হলে অশ্রুজল গড়িয়ে পড়ে। এর কারণ দুঃখানুভব নয়।[৬৫] প্রকৃতপক্ষে, দুঃখের এ অনুভবও আনন্দের।

AvU: mwn‡Z¨ beZ: এ কথা সবাই স্বীকার করবেন যে, রসগ্রাহী পাঠকের সংখ্যা বৃদ্ধি না পেলে সাহিত্যের মান অবনত হতে থাকে। পাঠকের গুণে সাহিত্যেও গুণান্বিত হয়। যুগ উর্পযুক্ত সাহিত্যেসৃষ্টির অনুকূল হয়। যুগের কারণে উপযুক্ত সাহিত্যেপ্রতিভা অনেকের মধ্যেই দেখা দেয়। রবীন্দ্রনাথও বলেন, যেখানে আর্টের উৎকর্ষ সেখানে গুণী ও গুণজ্ঞদের ভাবের উচ্চশিখর। সেইখানে নানা রসের মেঘ জমে উঠে।[৬৬] এভাবে নবত্ব সঞ্চার হয় সাহিত্যে। অন্যত্র রবীন্দ্রনাথ বলেন, সাহিত্যের যুগ বলতে কী বোঝায়

সেটা বোঝাপড়া করবার সময় হয়েছে। কয়লার খনি বা পানওয়ালীদের কথা অনেকে মিলে লিখলেই কি নবযুগ আসে? এই রকমের কোন একটা ভঙ্গিমার দ্বারা যুগান্তরকে সৃষ্টি করা যায়, এ কথা মানতে পারব না সাহিত্যের মতো দলছাড়া জিনিস আর কিছু নেই। বিশেষ একটা চাপরাশপরা সাহিত্য দেখলেই গোড়াতে সেটাকে অবিশ্বাস করা উচিত[৬৭] প্রসঙ্গত, নতুন মত ও পথের সন্ধানে এভাবেই সাহিত্যে আসে প্রগতি, আসে কথিত নবত্ব।

bq: mwn‡Z¨ jxjvev‘: রবীন্দ্রনাথের মতে, সাহিত্যের অভাবে আমাদের মধ্যে পূর্বাপরের সজীব বন্ধন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। (ঠাকুর ১৯৪৫ : ২১২) । সহিতত্ব সাহিত্যের উপাদান বলে এর ফলে সৃষ্টি হয় ঐক্য। খুব সরল কিছু যেমন তাতে যুক্ত হয়, বিষমও তাতে প্রবেশলাভ করে সাদরে। এমনি করিয়া বাহিরকে অন্তরে ও অন্তরকে বাহিরের সামগ্রী করিবার একান্ত ব্যাকুলতা হৃদয়ে কিছুতেই ঘুটে না।”[৬৮] তাই রবীন্দ্রদৃষ্টিতে সাহিত্য হচ্ছে লীলা। পাশ্চাত্য দেশে জীবনকে বলা হয় সংগ্রাম। আামদের দেশে তা লীলারূপে ব্যক্ত। জীবনে বেঁচে থাকার এক কারণ নির্ণয় অসাধ্য ইচ্ছে সবার মধ্যে আছে। তাই সে সংগ্রাম করে। স্বেচ্ছায় বরণ করে নেয় দুঃখ: প্রকৃতি চলে তার স্বাভাবিক নিয়মে। তার কোনো ব্যতিক্রম নেই। কিন্তু মানুষ অনবরত প্রকৃতিতে আপন ইচ্ছের অধীন করার চেষ্টায় রত। সে ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটে সাহিত্যে। ফলে লীলার প্রকাশ সাহিত্যেও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। অবশ্য এর প্রকাশ ও ব্যাখ্যা ব্যক্তিসাপেক্ষ। সাহিত্যে এ লীলাবাদ রবীন্দ্রনাথের কাছে এক আদরণীয় প্রসঙ্গ। লীলার মধ্যেই তার জীবন ও সৃষ্টির বিপুল রহস্য নিহিত।

‘k: im I i|c: ভারতীয় অলঙ্কারশাস্ত্রে বলা হয়েছে, বিভাবাদিযোগে লৌকিক ভাব অলৌকিকতা প্রাপ্ত হয়। এই ভাব বাচ্যার্থের অতীত ধ্বনিগত ব্যঞ্জনা এনে দেয়। রবীন্দ্রনাথের মতে, রস অনুভববেদ্য ও তার মাধ্যমে আত্ম সাক্ষাৎকার ঘটে। রসমাত্রেই অর্থাৎ সকলরকম হৃদয়বোধেই আমরা বিশেষভাবে আপনাকেই জানি, সেই জানাতেই বিশেষ আনন্দ”[৬৯] তবে রস ও রূপের মধ্যে পারস্পারিকতা আছে। সে পারস্পারিকতা দ্বারাই সাহিত্যের মাত্রা নিরূপিত হয়। মানুষ আত্মিক প্রেরণায় সৃষ্টি করে। সে নির্মাণ করে ব্যবসায়ের প্রয়োজনে, সৃষ্টি করে আত্মার প্রেরণায়। মানুষের

> সঙ্গে মানুষের নিবিড় সম্পর্ক সম্পর্ক হলো আত্মার ও তা হলো সৌন্দর্য কল্যাণ ও প্রেমের সম্বন্ধ (সান্যাল, ২০০৫ : ৯৩)। এতে বোঝা যায় রস ও রূপের সম্পর্ক।

বাংলা সাহিত্যে কাব্যান্দোলনের সূচনা ১৯২৩ সালে 'কল্লোল' (১৩৩০ বাংলা) পত্রিকা প্রকাশের মধ্য দিয়ে। প্রথমদিকে এ পত্রিকার সম্পাদক দিলেন দীনেশরঞ্জন দাশ, সহ-সম্পাদক গোকুলচন্দ্র নাগ; পরে সম্পাদক হন অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত (১৯০৩ ?) ইতোমধ্যে রবীন্দ্র পরবর্তী উল্লেখযোগ্য কবিদের মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৮২-১৯২২), যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত (১৯৮৭-১৯৫৪), মোহিতলাল মুজমদার (১৮৮৮-১৯৯২২), কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬) প্রমুখ বাংলা সাহিত্যে আবির্ভূত হয়েছেন। এ কথা নতুন নয় যে, তিরিশের কাব্যান্দোলনের মূল প্রণোদনা ছিল রবীন্দ্র বিরোধিতা। রবীন্দ্র বিরোধিতার এ প্রেক্ষাপটে কোন ব্যক্তিগত বিরোধ নয় বরং কবিতার রূপ রীতির। রবীন্দ্র বিরোধিতার প্রেক্ষাপট অবশ্য নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত (১৮৬১-১৯৪০) সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার (১৮৬৬-১৯৩১), দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৬৩-১৯১৩) প্রমথনাথ রায় চৌধুরী (১৮৭২-১৯৪৯) প্রমুখের দ্বারা আগেই তৈরী ছিল। হিতবাদী পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প ছাপা হত নিয়মিত। এক পর্যায়ে পাঠকের প্রত্যাশা সূত্রে পত্রিকার পক্ষ থেকে গল্পের ভাব, ভাষা আরো লঘু করার দাবি জানান হলে বিরোধের সূত্রপাত হয়। (১৮৯১)। এ বিষয়ে বর্ণনা পাওয়া যায় ভূদেব চৌধুরী বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস গ্রন্থে:

> "প্রাথমিক পর্যায়ে রবীন্দ্ররচনার বিমুখতা ব্যক্তিগত প্রতিপাক্ষিকতার চেয়ে সাহিত্যেক আদর্শ প্রেরণার দ্বারাই বেশি প্রভাবিত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ কেবল বাংলা কাব্য কবিতাতেই নয়, বাংলা সাহিত্যের সকল ধারাতেই ভাব এবং ভাষার এক নতুন মাত্রা যোজনা করেছিলেন। কবিকল্পনার ক্ষেত্রে বাস্তবিকতার চেয়ে বস্তুর অন্তর্নিহিত স্বরূপকে সন্ধান করা ছিল তাঁর কবি মনের সহজ প্রবণতা; অনেকটা সেই সূত্রেও ভাষাকে বাগর্থের বন্ধনমুক্ত এক স্বতন্ত্র তাৎপর্যে প্রতিষ্ঠিত হতে হয়েছিল। কাব্যে সাহিত্যে এই স্পষ্টতা ও সহজবোধ্যতার দাবি নিয়েই রবীন্দ্র বিরোধিতার একটি সুনির্দিষ্ট এবং কিছুটা সমবেত আয়োজন শুরু হয় সাহিত্যে পত্রিকাকে অবলম্বন করে। পত্রিকার সূচনা ১২৯৭ সালে, পরবর্তী বর্ষে সে পূর্ণায়তন হয়ে ওঠে; সে ঘটনা রবীন্দ্রনাথের হিতবাদী সাপ্তাহিক ছেড়ে সাধনা নামক মাসিক পত্রিকা প্রকাশের প্রায় সমকালীন।"[৭০]

সাহিত্যেক ব্যক্তিগত বিরোধ উল্লিখিত ব্যক্তিবর্গের কারো কারো সঙ্গে তার আগে থেকেই ছিল। সাহিত্যক মতাদর্শগত বিরোধ অনেকেই ব্যক্তিগত স্থূল বিষয়ে আমদানি করেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ নিজের লক্ষ্যে অবিচল ছিলেন। ১৯১৩ সালে নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তিসহ দেশে বিদেশে তার অপ্রতিহত প্রভাব প্রতিষ্ঠা হলে সে সব বিরোধ দুর্বলের আস্ফালনে পরিণত হয়। এক পর্যায়ে রবীন্দ্র অনুসারী ক;জন কবি ভিন্নমাত্রায় সাহিত্যেচর্চায় মনোনিবেশ করেন। লক্ষণীয় বিষয়, রূপ রীতি প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের চর্চিত পথ থেকে সরে এসে তারা নজর কাড়তেও সক্ষম হন। এ প্রসঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথ, যতীন্দ্রনাথ, মোহিতলাল এবং নজরুলের নাম করতে হয়। অবশ্য তাদের প্রচেষ্টা কল্লোলের অগ্রবর্তী। কল্লোল প্রকাশের পর একদল উদ্যামী মেধাবী তরুণ রবীন্দ্ররীতির বিরোধিতা ও বাংলা কবিতার নতুন পথের সন্ধানে আত্মনিয়োগ করেন। এদের মধ্যে জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯-১৯৫৪), সুধীন্দ্রনাথ দত্ত (১৯০১-১৯৬০) অমিয় চক্রবর্তী (১৯০১-১৯৮৬), অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত (১৯০৩-?) প্রেমন্দ্রে মিত্র (১৯০৪-?), অজিত দত্ত (১৯০৭-১৯৭৮), বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-১৯৭৪), বিষ্ণু দে (১৯০৯-১৯৮২) প্রমুখের নাম উল্লেখ করা যায়।

রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশায় বিগত শতকের বিশের দশকে (সূচনা বিন্দু ১৯২৩) তথা বাংলা সাল বিচেনায় ১৩৩০ বিধায় তিরিশের দশক হিসেবে ব্যাপক পরিচিতি প্রাপ্ত কবিরা নিজস্ব অবস্থান থেকে, কখনো সঙ্ঘবদ্ধভাবে বাংলা কবিতার ভিন্নপথ নির্মাণে ব্যাপৃত হন। এ সময়ের বর্ণনা পাওয়া যায় সুমিতা চক্রবর্তীর বক্তব্যে:

> "রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কবিতার ধারায় যে কবিরা এসেছিলেন বিশের দশকে বিশ্ব সাহিত্যের বিভিন্ন দিক এবং যুদ্ধোত্তর ইয়োরোপের নতুন সাহিত্যে চিন্তা সম্পর্কে খুবই সচেতন ছিলেন তারা। তাদের পাঠ পরিধিও ছিল যেমন বিস্ময়কর, তেমনি সেই বৈদগ্ধ্যের চিহ্নও তারা অপ্রকাশ রাখতেন না সে কবিতাতেই হোক বা প্রবন্ধে। এই কবিদের অনেকেই কাব্যতত্ত্ব নিয়েও কিছুটা ভেবেছিলেন। সে ভাবনায় উয়োরোপীয় কাব্যতত্ত্বের ধারণা গৃহীত হয়েছিল।"[৭১]

তিরিশের এ কাব্যান্দোলনে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের 'কল্লোল' সুধীন্দ্রনাথ দত্তের 'পরিচয়' ও 'কালি কলম' বুদ্ধদেব বসুর 'প্রগতি' ও 'কবিতা' ইত্যাদি পত্রিকার কার্যকর ভূমিকা রয়েছে। উল্লিখিত কবিদের মধ্যে অধিকতর দীপ্তমান পাঁচজনের সৃষ্টিশীল রচনা ব্যক্তি ও সৃষ্টিশীল রবীন্দ্রনাথের প্রতি প্রবল ভক্তি ও মুগ্ধতা সত্ত্বেও বাংলা কবিতাকে ভিন্নতর প্রেক্ষাপটে দাড়

করাতে সক্ষম হয়। দ্রৌপদী রূপ এক কাব্য সত্ত্বাকে কেন্দ্র করে তাদের সামষ্টিক প্রচেষ্টা একসঙ্গে মহাভারতের পৌরাণিক চরিত্রের আদলে পঞ্চপাণ্ডব অভিধায় চিহ্নিত করার জনপ্রিয় ব্যাপারও সুদীর্ঘকাল ধরে লক্ষগোচর হয়ে আসছে। এ পাঁচ কবি হলেন, জীবনানন্দ দাশ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, অমিয় চক্রবর্তী, বুদ্ধদেব বসু ও বিষ্ণু দে। তারা যে এক সঙ্গ সঙ্ঘ করে ইশতেহার ঘোষণা করার মাধ্যমে কবিতার সেবায় নিয়োজিত হলেন এমন নয়। বরং কাজের ধরণ, অন্তর্গত প্রণোদনা ও অভীষ্ট বাংলা সাহিত্যের এক সুনির্দিষ্ট জায়গায় নিয়ে তাদের দাঁড় করিয়েছে। তারা পাঁচজনই ইংরেজি সাহিত্যে মেধাবী ছাত্র ছিলেন। যুগ স্বভাব আর ভেতরের তাগিদে তৈরী করে নিয়েছিলেন প্রবল এক পাঠ চৈতন্য। তবে তাদের জন্ম বেড়ে ওঠা শিক্ষা ও বসবাস এ রকম বহুক্ষেত্রে বিষমতা ছিল। ঐক্য আরেকটা জায়গায় ছিল, তারা সবাই পেশায় ইংরেজি সাহিত্যের শিক্ষক অধ্যাপক। প্রথম জীবনের অপরিচয়ের দূরত্ব অতিক্রম করে শেষ পর্যন্ত স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হলেও তাদের আন্তর সম্পর্ক যে খুব মধুর ছিল এমনটা যেমন করার কোন কারণ নেই। এ বিষয়ে কিছুটা পরিচয় মিলবে অরুন সেনের রচনায়, যা তিরিশের কবিদের পারস্পারিক সম্পর্ক বিষয়ে এক টুকরো আলোকপাত। তিরিশের প্রেক্ষাপট বুঝতে সহায়ক এ উক্তিতে বিষ্ণু দে সম্পর্কে অরুন সেন বলেন:

> "বুদ্ধদেব বসু-র সঙ্গে প্রগতিতুতো সম্পর্ক, প্রগতি উঠে গেলও, তিনি কলকাতায় চলে আসার পরও রয়ে যায়। তাই ১৯৩৩ সালে 'উর্বশী ও আর্টেমিস' যখন বেরোয়, তখন প্রকাশক হিসেবে নাম থাকে বুদ্ধদেব বসু-র। এর দু' বছর পরেই বুদ্ধদেব বসু বের করেন কবিতা প্রথম থেকেই বিষ্ণু দে তার সক্রিয় সহযোগী। 'কবিতা'তে লেখাই শুধু নয়, কবিতার সংগঠনে ও প্রচারেও তার কমবেশী ভূমিকা ছিল। বুদ্ধদেব বসু-র যেমন পরিচয় বিষয়ে কুণ্ঠা ছিল, তেমনি সুধীন্দ্রনাথও তখন বুদ্ধদেব বসু-র কবিতা ও কবিতা পত্রিকা বিষয়ে নির্দ্বন্ধ ছিলেন না। বিষ্ণু দে-র কাছে প্রয়োজন ছিল এই দুই পত্রিকারই।"[৭২]

এভাবে দেখা যায়, কেবল সমন্বতি প্রচেষ্টায় নয়, বরং মত ও পথের মিলন দ্বন্দ্ব সংঘাতেও তিরিশের কবিরাসহ কল্লোলগোষ্ঠী বাংলা কাব্যের নতুন দিনের অন্বেষণ করেছেন।

তিরিশের উক্ত পাঁচজন কবিসহ কল্লোলের প্রায় সবারই সাহিত্যে রচনায় হাতেখড়ি হয়েছিল কবিতা রচনার মাধ্যমে। জীবনানন্দ দাশ ও বুদ্ধদেব বসুর জন্ম পূর্ববঙ্গে, একজনের বরিশালে, অন্যজনের কুমিল্লায়। বুদ্ধদেবের আদি পিতৃনিবাস বিক্রমপুর, বেড়ে ওঠা নোয়াখালিতে; ঢাকা

বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্র ছিলেন। পাশ করে বেরোনোর পর পর এক পর্যায়ে চলে যান কলকাতায়। জীবনানন্দের বেড়ে ওঠা বরিশালে, তবে উচ্চ শিক্ষা কলকাতায়। বাকিদের সবাই কলকাতা বা আশপাশে ছাত্রজীবন অতিবাহিত করেন। জীবনানন্দ অন্নসংস্থানের প্রয়োজনে জীবনের বড় অংশ কাটিয়েছেন মফস্বলের বিভিন্ন কলেজে, এক পর্যায়ে কলকাতায়ও। পারিবারিক আভিজাত্য ছিল সুধীন্দ্রনাথের। অমিয় ও বুদ্ধদেব দেশ বিদেশ, বিশেষত ইয়োরোপ আমেরিকায় শিক্ষা গবেষণা ও অধ্যাপনাসূত্রে বর্ণাঢ্য জীবন কাটিয়েছেন। ব্যক্তিগত জীবন একেক জনের একেকভাবে বৈশিষ্ট্যমন্ডিত। তবে তাদের মস্তিস্কে বাংলা কবিতার নতুন দিনের স্বপ্ন ছিল বিধায় যিনি যেখানে ছিলেন রবীন্দ্রত্তোর বাংলা কবিতার পরিবর্তন, বিনির্মান ও সৃষ্টির ভিন্নতর উচ্চতার সাধনায় প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। তাদের অবলম্বন ছিল স্বদেশ ও সংস্কৃতি, ঐতিহ্যের জায়গায় ছিল ভারতের বিস্তৃত ইতিহাস, উদাহরণ হিসেবে ছিল বিশ্ব। উল্লিখিত বিষয়গুলোর সঙ্গে সম্পৃক্ত নানা প্রসঙ্গ নানাভাবে যাচাই বাছাই ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে বাংলা কবিতার ভবিষ্যত নির্মান করেছেন তারা। এ কথার বড় সাক্ষ্য তাদেরই কবিতাই। তাদের উপাদানের এ বৈচিত্র্যের মধ্যে যুক্ত ছিল কবির সত্যিকারের সাধনা। কবিতার সৃষ্টি ও সাধনা সম্পর্কে সচেতন দৃষ্টিভঙ্গির কারণে সময়, কবিতা ও সংস্কৃতিকে আপন নিয়মে গন্তব্যে পৌঁছে দেয়। আর সেখান থেকে অন্যখানে তার বিবর্তন চলে স্বাভাবিক নিয়মে। কল্লোলগোষ্ঠী ও তিরিশি কবিকূল বাংলা কবিতাকে ভিন্ন পথে চালিত করেছেন; অন্তত দেশীয় পরিপ্রেক্ষিতে থেকে বিচ্যুত করার কারণে। কল্লোলগোষ্ঠী ও তিরিশের দশকে সংঘটিত সৃষ্টিশীল পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা বর্তমান গবেষণার মৌল বিবেচ্য বিষয়:

কল্লোলগোষ্ঠী ও তিরিশের কাব্যচৈতন্য নির্মাণে উল্লিখিত কবিদের সামনে বিবৃত প্রেক্ষাপটের পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন সমকালীন বিশ্বসাহিত্য ও বাংলার গুটিকয় সফল কবি ব্যক্তিত্ব। দেশে রবীন্দ্রনাথ, বিদেশে ডব্লিউ বি ইয়েটস, টিএস এলিয়ট, এজরা পাউন্ড, গ্যেটে, লিকে, বোদলেয়ার, মালার্মে, র‍্যাবোঁ, আরাগঁ প্রমুখ। এদের মধ্যে পাঁচজনেরই মানস গঠনে দুটি নাম মূখ্যভাবে কাজ করেছে; প্রথমজন দেশী রবীন্দ্রনাথ, অন্যজন ভিনদেশী এলিয়ট। তদুপরি, অমিয় পাউন্ডের প্রতি বিশেষ দুর্বলতা পোষণ করেন, সুধীন্দ্রনাথ মালারমের প্রতি আস্থাবান, বুদ্ধদেব প্রাচীন ভারত ও বোদলেয়ার তাড়িত, বিষ্ণু দে'র মধ্যে লক্ষ করা যায় এক রকম

আরাগঁপ্রীতি। তাদের সৃষ্টিশীল সাহিত্য রচনার বাইরে সাহিত্যতত্ত্বের পথনির্দেশক বিশ্লেষণী সমালোচনামূলক নিবন্ধ-প্রবন্ধ তথা গদ্যরচনায় প্রতিফলিত শিল্পদৃষ্টির প্রেক্ষাপটে নিম্নোক্ত উক্তি বিবেচ্য;

> "রবীন্দ্রনাথের কাব্য জগতে পাউন্ড বা এলিয়ট সহজে স্থান পান না, সে বাছ বিচারের অসহিষ্ণুতা যেমন ঐতিহাসিক কথা স্বাভাবিক তেমনি স্বাভাবিক তৎসত্ত্বেও তাদের মতো ইউরোপীয় কবিদের সঙ্গে আবার তার একটা ব্যাপ্ত অর্থে, যুগগত শতাব্দীগত তুলনীয়তা আমাদের শিল্পসাহিত্যে ,সংস্কৃতিতে আমাদের ইতিহাসের মানসে রবীন্দ্রনাথ প্রবলভাবে, বিস্তৃতভাবে আধুনিকতার আর্কেটাইপ, মৌলিক প্রতিনিধি; এমনকি দেশোত্তরভাবে উচ্ছ্রিত তার আধুনিকতা, তার সত্ত্রাসংকটের সৃষ্টিমুখর ব্যাপ্ত আততির ক্লান্তহীন গায়ত্রীতে।"[৭৩]

মোটকথা কল্লোলগোষ্ঠীসহ তিরিশ কবিরা বাংলা কবিতার আধুনিকতাবাদের নতুন আর্কেটাইপ সৃষ্টিতে সক্ষম হলেন। আধুনিক বাংলা সাহিত্যে প্রকৃতপক্ষে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালির মননর্চচার ফসল। তাতে তাদের মানুসিক শক্তি, প্রতা ও প্রতিক্রিয়ার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। উনিশ শতকে কথিত জাগরণ চেষ্টার অবক্ষয় ও হতাশা দিনে দিনে বিক্ষোভ রূপ নেয়। সামগ্রিকভাবে কোনো দেশ যে গতিতে এগিয়ে যাবার কথা, উনিশ শতকের সশ্ববনার পরও তা না হওয়ায় উদ্দাম তারুণ্যের সংক্ষুব্ধ হয়ে ওঠারই কথা। এ ব্যাপারটাই বিশ শতকের গোড়ার দিকের বাঙ্গালি সামজকে আলোড়িত করে থাকতে পারে। এই সচেতনতা দিনে দিনে শিল্পচৈতন্য জারিত হয়ে এক পর্যায়ে সমৃদ্ধি খুঁজবে এটাই স্বাভাবিক। তিরিশের পাঁচজন কবি রবীন্দ্রবিদ্বেষী নন; বরং তার সৃষ্টি ও চৈতন্যে ছিল তাদের অন্তহীন মুগ্ধতা মানে তাতে বিলীন হয়ে যাওয়া নয়। বাংলা সাহিত্যে বর্তমানের অনুপুঙ্খরূপ তারা অবগত ছিলেন। অতীতটা তাদের সম্যক সহৃদয় ভাবনায় ছিল। বিশ্বসাহিত্যের বর্তমান ও অতীত দিনের সামগ্রিক চেহারা অবগত ছিলেন তারা। নিজের সৃষ্টিশীলতা বেলায় স্বকীয়তার বোধ তাদের প্রজ্ঞানের অংশ ছিল ফলে কল্লোলের ইতিবাচক লক্ষ্যটুকু তারা অপব্যয়িত হতে দেননি।

জীবনানন্দ দাশের সৃষ্টিতে কল্লোলের পরিবর্তন প্রচেষ্টা সৃষ্টির মহৎ তাৎপর্যে অভিব্যক্ত হয়। তার লক্ষণ সম্পর্কে ইতিহাসবিদের মূল্যায়ন জরুরী।

> প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ইউরোপে আধুনিক চেতনার যে নতুন মাত্রা উম্মোচিত হয়েছিল, তার অনুভব বাংলার নিসর্গ মদিরতা আর বাঙ্গালি মানুষের ঘরোয়া জীবন মন্থনঘেরা কারুণ্যে সংবেদিত

> হয়েছে তার কবিতায়। বিশ শতকীয় তরুণ মনের বৃন্তচ্যুতি জনিত সংশয় অবসাদ অবদমন জীবনানন্দের কবিতায় এক অপহৃত প্রত্যাশা আক্ষেপে গুমরে ফিরেছে। মগ্ন চৈতন্যের গভীরে পরাবস্তব অতৃপ্তির এক মর্মান্তিক বেদনাবিদ্ধতা সে কবিতার অন্তর্লগ্ন হয়ে আছে। প্রকাশের শৈলীতে আছে অদরা মাধুরীময় সংকেত ব্যঞ্জনা।[৭৪]

উদ্ধৃত কবিচৈতন্য যার শক্তি তিনি যদি তার স্বয়ম্প্রকাশে, অন্তর্গত শিল্পদর্শনের বিবৃতকরণে সমর্থ হন, তবে তা সবিশেষ মূল্য বহন করতে পারে। জীবননান্দের প্রবন্ধসমূহে সে সমৃদ্ধ শিল্পদর্শনের পরিচয় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

কল্লোলের উদ্যম ও উৎসাহ নতুন মাত্রা পেয়েছিল 'পরিচয়' (১৯৩১) ত্রৈমাসিক পত্রিকাকে আশ্রয় করে। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ও বিষ্ণু দে পরিচয় গোষ্ঠীর মূখ্য ব্যক্তিত্ব। এ গোষ্ঠীর কবিতা প্রথম থেকেই অবদমনপীড়ার উচ্ছাসে স্ফীত। তারা ছিলেন মননশীলতা, স্থৈর্য ও নতুন ধরনের সংকেতবহানতার পক্ষপাতী। তারা রবীন্দ্রনাথের অনুরাগী হয়েও নিজস্ব প্রেরণা ও সৃষ্টিশীলতার তাগিদে রবীন্দ্রনাথ থেকে উত্তীর্ণ হতে চেয়েছিলেন। সুধীন্দ্রনাথ বাংলা কবিতাকে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন ইউরোপীয় চৈতন্যের কাছাকাছি। সে জন্য মালারমের প্রতি তার অনুরাগ ছিল প্রকাশ্য। কবিতায় সুধীন্দ্রনাথ শব্দের শক্তি পরীক্ষায় মনোযোগী হয়েছিলেন। আভিধানিক শব্দের সচেতন প্রয়োগের যে আপাত কাঠিন্য তিনি আনয়ন করেন, তা ছিল এক রকম নিরীক্ষা প্রবণতার প্রকাশ। ধ্রুপদী আদর্শের প্রতি আস্থা, কবিতার আবয়য়িক বিশিষ্টতার সাধনা এবং আপাত রূপকাঠিন্যর অন্তরালে বিশ শতকী বিনষ্টিবোধের চাপপ্রকাশে ব্যাপক পরিসরে সংহত আর্তির উদ্ভাসই তার কবিভানার অবিজ্ঞান হয়ে উঠেছিল। তিনি মালারমেকে যেমন অনুষঙ্গী করেছেন, তেমনি রবীন্দ্রনাথকে হৃদয় ধারণ কবিতা তথা শিল্পের স্বরূপ স্বভাব নিয়ে ভাবিত ছিলেন। তার ভাবনার সে প্রকাশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে তার রচিত প্রবন্ধসমূহে। এসব প্রবন্ধে দেশি বিদেশি সাহিত্যের সমালোচনা ও কাব্যভাবনার অন্তর্গত সুর বিশ্লেষণ সূত্রে তার স্বকীয় শিল্প দৃষ্টি স্পষ্টগোচর হয়ে উঠেছে।

অমিয় চক্রবর্তী অন্যদের মতো গোষ্ঠী পর্যায়ভুক্ত কবি নন। রবীন্দ্র উত্তরণের কোনো আত্যন্তিক বা প্রকাশ্য উৎকণ্ঠাও নেই তার মধ্যে। বরং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সচিব থাকার সুবাদে তার রবীন্দ্রনুরাগ মজ্জাগত। অন্তগর্ত চেতনা ও মননের বিশিষ্টতাই তাকে অন্যদের চেয়ে আলাদা করেছে। তাঁর কবিতা তিরিশের নতুন রীতির ক্ষেত্রে ভিন্নতারসঞ্জারী। জীবনের

অন্তরে প্রবাহিত রহস্যকে আধ্যাত্মিক চেতনায় সমর্পিত করে একজন কবির হৃদয়ধর্মকে ভিন্নতর তাৎপর্য সঞ্জীবিত করেন তিনি। তিনি ছিলেন ইংরেজি ও ইউরোপীয় সাহিত্যে বুৎপন্ন পণ্ডিত। ইংরেজি সাহিত্যের মেধাবী ছাত্র, অক্সফোর্ডের গবেষক এবং কর্মসূত্রে বিদেশে দীর্ঘ অবস্থান তার ভাবনার জগতকেই কেবল সমৃদ্ধ করেনি। বরং সমকালীন পাশ্চাত্য বিশ্বে সাহিত্যের রূপ রীতি নিয়ে যারা নিরন্তর পরীক্ষা নিরীক্ষায় নিয়োজিত ছিলেন তাদের আন্তরিক সাহচর্য কবিধর্মের আনুপূর্বিক বিশিষ্টতায় তাকে সমৃদ্ধ করেছে। এসব বিষয় তাঁর মধ্যে ভাবনার যে জগৎ নির্মান করেছে তার প্রকাশ ঘটেছে মূলত ইংরেজি ভাষায় রচিত তার বিপুল প্রবন্ধরাশিতে। বাংলায় তিনি কম গদ্য লিখেছেন। তবে যেটুকু লিখেছেন তাতে তার সমৃদ্ধ শিল্পদর্শন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সুমিতা চক্রবর্তীর মন্তব্য উদ্ধৃত করা যেতে পারে:

> "শিল্প সাহিত্যে বিষয়ক প্রবন্ধগুলিতে অমিয় চক্রবর্তী নিজের শিল্পাদর্শ ও কাব্যাদর্শ ব্যক্ত করেছেন। তার নিজের রচনা বুঝতে এই লেখাগুলি সাহায্য করে আমাদের। দেশ কাল সমাজবিষয়ক লেখাগুলিতে বহুদেশ ঘোরা চিন্তাশীল ও হৃদয়বান মানুষটি প্রতিফলিত হন। ব্যক্তি বিষয়ে লেখা প্রবন্ধগুলিতে শুভবোধসম্পন্ন মানুষ ও লেখকদের প্রতি তার শ্রদ্ধা প্রকাশ পায়। সব প্রবন্ধেই তার সূক্ষ্ম সাহিত্যেবোধ বিস্তৃত ও উদার জীবনবোধ সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতা ও প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের পরিচয় আছে। নরম আলোর মত ছড়িয়ে আছে সংস্কৃতিমান একটি মনুষের নম্র কিন্তু দৃঢ় ব্যক্তিত্বের দ্যুতি।"[৭৫]

তিরিশের কাব্যান্দোলনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব বুদ্ধদেব বসু। তাঁর এ গুরুত্ব কেবল সৃষ্টিশীল সাহিত্যে রচনায় নয়, বরং কবিতাপ্রেমিক ও সাহিত্যের সক্রিয় নিবেদিত সংগঠক হিসেবে। জীবনব্যাপী সৃষ্টিশীল সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করে গেছেন তিনি। যৌবনের উষালগ্নে 'প্রগতি' পত্রিকার মাধ্যমে সেই যে জড়ালেন সাহিত্য কবিতার সঙ্গে, আমৃত্যু সাহিত্যই ছিল তাঁর ধ্যান জ্ঞান। পরে কবিতা পত্রিকার প্রকাশনাসহ নবীন কবিদের উদ্বোধিত করার মাধ্যমে আধুনিক কবিতার সবচেয়ে সক্রিয় সুহৃদে পরিণত হন তিনি। তিনি নিজে বিচিত্র রীতির সাহিত্য রচনা করেন, কিংবা সাহিত্যের পৃষ্টপোষকতা করে ক্ষ্যান্ত হননি। বরং প্রচীন ভারত, সমকালীন ও চিরায়ত বিশ্বসাহিত্য বিশষেভাবে সমকালীন বাংলা সাহিত্যের প্রতির্ষ্ঠিত ও একেবারে অনকোরা নবীন কবিদের ওপর নিবিষ্ট সমালোচনার মাধ্যমে উৎসাহ প্রদান করেছেন। এ কারণে তার গদ্য রচনার পরিধি বিপুল সব রচনা উদ্ধার করা রীতিমত

গলদঘর্ম ব্যাপার। পাশাপাশি তাঁর ছিল অত্যন্ত সমৃদ্ধ ও মননশীল পাঠক মন। ফলে তাঁর রচনায় যে চিন্তার জগৎ সৃষ্টি হয়েছে, তা শিল্প সাহিত্যের স্বভাব ও স্বরূপ সম্পর্কে ঈর্ষণীয় কুশলতার অধিকারী।

বিষ্ণু দে'র কাব্যভাবনার মূখ্য প্রভাবক এলিয়ট, রবীন্দ্রভক্তি তার শোণিততে। মার্কসবাদকে শিল্পের স্বরুপে বুঝে দেখতে অনুরাগী ছিলেন। তিনি সে কারণে কবিতায় তীক্ষ্মধী মনন যেমন তাঁর প্রবণতা, তেমনি কবি প্রতীতির বিবর্তন যেন তা কবি চৈতন্যের জন্মান্তর পর্যায়ভুক্ত। সে প্রতিতির গভীরে মার্কস ও রবীন্দ্রনাথ তার চৈতন্য উদ্বোধিত করেছেন নিগূঢ়ভাবে। কিন্তু কোনো কিছুকেই নির্বিবাদে গ্রহণ করার পক্ষপাতী তিনি ছিলেন না। বরং পরীক্ষা নিরীক্ষা বা বোঝাপড়ার সংবেদ্য আততি তার চৈতন্যর অংশ ছিল। সে কারণে দেখা যায়, উত্তরকালে মার্কসবাদের প্রতি উচ্ছাস বা মার্কসবাদী সাহিত্যে সমালোচনা তার অকুণ্ঠ সমর্থন লাভ করেনি। বরং মার্কসের উক্ত দ্বারাই তিনি মার্কসবাদী সমালোচকদের উচ্ছাসের বিরোধিতা করেছেন। এলোমেলো জীবন ও শিল্পসাহিত্য গ্রন্থের টমাস স্ট্যর্নস এলিঅট প্রবন্ধে বিষ্ণু দে বলেন:

এলিঅটের কাছে বাংলা লেখকদের ঋণগ্রহণ মূখ্যত এই আত্মসচেতনতার ক্ষেত্রে। আত্মসচেতনতা হয়ে উঠল কবিমার্গে প্রত্যক্ষ সত্ত্বাসম্পন্ন। ঋণের অন্যান্য দিক এরই জ্ঞাতি সম্পর্কীয়, যথা, বিশেষ কবিতা ভালো কাব্য হয় তখনই যখন তা বিশেষ একটি ভালো কবিতাও বটে। সাহিত্যের ইতিহাস যে স্বকীয় রচনায় ও তার বিবেচনায় প্রাণবান ব্যাপার যে বোধও এলিঅটের সাহায্যে তীব্র হল। তিনি আমাদের সাহিত্যে অর্থাৎ একপ্রকার কর্মের বীক্ষায় ব্যাপ্তি ও গভীরতা বর্ধন দুই করেন। অজ্ঞাতাসারেই এলিঅটের সমালোচনায় মার্কস অঙ্গীকৃত, তার কাব্যের মুক্তিতে সাম্যবাদীর আরম্ভ, যদিও য়ত সে সত্য তিনি জানেন না বা মানেন না।[৭৬]

তার দীর্ঘায়তন গদ্য রচনার অন্তরে প্রবাহিত শিল্পচৈতন্য আলোচনার প্রেক্ষাপটে বিষ্ণু দে'র এসব বিশিষ্টতা স্মর্তব্য।

রবীন্দ্রোত্তর পূর্ব বাংলা সাহিত্যের সমৃদ্ধির ভিন্নতর উচ্চতায় দণ্ডায়মান। সমকালে জগতের রূপ-রস আকণ্ঠ পান করে রবীন্দ্রনাথ যে রূপ উচ্চতায় আসীন হয়েছিলেন, সংস্কৃতির নিজস্ব

প্রয়োজনেই তা থেকে ভিন্নতা অনুসন্ধান করা জরুরী ছিল সে কাজ সুচারুভাবে সম্পন্ন করেন রবীন্দ্র পরবর্তী প্রজন্ম; বিশেষত তিরিশের পাঁচ বিশিষ্ট বাঙালি কবি জীবনানন্দ দাশ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, অমিয় চক্রবর্তী, বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে। কবিতা রচনার পাশাপাশি বাংলা প্রবন্ধের ধারাকে অন্যান্য বিখ্যাত খ্যতিমান কবিদের মধ্যে বাংলাদেশের কবিগণও রয়েছে। পশ্চিম ও পূর্ব বাংলার কবিগণ বাংলা সাহিত্যের ধারাকে কেবল সমৃদ্ধ করেনি; বরং সাহিত্য শিল্পসত্য সম্পর্কে সৃষ্টি করেছে চিন্তন তথা ভাবুকতার সমৃদ্ধ প্রেক্ষাপট।

Z_¨mÎ:

১. ধনঞ্জয় দাস (সম্পাদিত) মার্কসবাদী সাহিত্য বিচার, কলকাতা, ২০০৩, পৃ. ৭
২. অচুত্য গোস্বামী, বাংলা উপন্যাসের ধারা, কলকাতা, ১৩৭৫, পৃ. ২৩৮
৩. সুবল মিত্র (সংকলিত) সরল বাঙ্গালা অবিধান, ১৯৮৪, কলকাতা
৪. জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস, বাঙ্গালা ভাষার অবিধান, ১৯৮৪ কলকাতা
৫. হরিচরণ বন্দ্যেপাধ্যায়, বঙ্গীয় শব্দকোষ, ১৯৭৮, নিউ দিলণ্ঢী
৬. শৈলেন্দ্র বিশ্বাস, সংসদ বাংলা অভিধান, কলকাতা, ১৯৮৫
৭. বিবর্তনমূলক বাংলা অভিধান, ঢাকা, ২০১৪
৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আধুনিক কাব্য, (সাহিত্যের পথে), ঢাকা, ২০০৯
৯. সুমিতা চক্রবর্তী, আধুনিক কবিতার চালচিত্র, কলকাতা, ২০০৭, পৃষ্ঠা-১
১০. মোহাম্মদ মাহফুজ উলণ্ঢাহ, নজর“ল ইসলাম ও আধুনিক বাংলা কবিতা, ঢাকা, পৃষ্ঠা-২৪-৫
১১. শ্রী ভূদেব চৌধুরী, আধুনিক বাংলা কবিতা: বিচার ও বিশেণ্ঢষণ, কলকাতা, পৃষ্ঠা-৮০
১২. সৌরেন্দ্র মিত্র, বাংলা কবিতা প্রসঙ্গ, পৃষ্ঠা-১২৭-১২৮
১৩. তপধীর ভট্টাচার্য ও স্বপ্ন ভট্টাচার্য, আধুনিকতা: জীবনানন্দ ও পরাবাস্ড়ব, কলকাতা,পৃষ্ঠা-১৫
১৪. ড. হুমায়ন আজাদ, আধুনিক বাংলা কবিতা, ঢাকা, পষ্ঠা-৭
১৫. আধুনিকতাবাদ ও জীবনানন্দের জীবনোৎকণ্ঠা, ঢাকা, ২০০৩, পৃষ্ঠা-১৬
১৬. দীপ্তি ত্রিপাঠী, আধুনিক বাংলা কাব্যপরিচয়, ...১৯, পৃষ্ঠা-১
১৭. এলিঅট, বিষ্ণু দে ও আধুনিক বাংলা কবিতা, ড. বিনয়কুমার মাহাতা, পৃষ্ঠা ৯৫-৬
১৮. সৈয়দ আলী আহসান, আধুনিক বাংলা কবিতা: শব্দের অনুষঙ্গে, ঢাকা, পৃষ্ঠা ১১
১৯. তিনি এ-ও জানিয়েছেন, "রবীন্দ্রনাথের পরে প্রথম নতুন তো রবীন্দ্রনাথ নিজেই।"
২০. আবু সয়ীদ আইয়ুব ও হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত আধুনিক বাংলা কবিতা, পথের শেষ কোথায়, পৃষ্ঠা৭৮। ভূমিকাংশ দ্রষ্টব্য
২১. শ্রীবাসন্ড়ীকুমার মুখোপাধ্যায়, আধুনিক বাংলা কবিতার রূপরেখা, পৃষ্ঠা ১২
২২. অশোককুমার মিত্র, আধুনিক বাংলা কবিতার রূপরেখা (১৯০১-২০০০), পৃষ্ঠা ৮৭
২৩. সত্যপ্রিয় মুখোপাধ্যায়, এলিয়ট ও আধুনিক বাংলা কাব্য, পৃষ্ঠা ৫৫
২৪. দীপ্তি ত্রিপাঠী আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয়, পৃষ্ঠা ৩-৪
২৫. দীপ্তি ত্রিপাঠী, আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয়, পৃষ্ঠা ১৪; আরও দেখুন, অশোককুমার মিত্র, আধুনিক বাংলা কবিতার রূপরেখা (১৯০১-২০০০), পৃষ্ঠা ৮৬
২৬. সৈয়দ আকরম হোসেন (সম্পাদিত) উলুখাগড়া, ১ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ঢাকা ১৪১২, পৃষ্ঠা-১২২-১২৩

২৭. http://en. wikipedia.org.wiki/Ezra-pound
২৮. প্রাগুক্ত।
২৯. http://en.wikipedia.org./wiki/Ts-Eliot
৩০. T.S.Eliot, Tradition and individual Talent.in 20th century poties & poetry. Gray Geddes (ed.) Oxford University press, oxford, 1996, page-810
৩১. প্রাগুক্ত।
৩২. I.A. Richards, Principal of Literary Criticism, London & Newyork, Page-34.
৩৩. মঞ্জুভাষ মিত্র, আই.এ. রিচাউস, নন্দনতত্ত্ব জিজ্ঞাসা, কলাবাগান, ১৯৯৪, পৃ. ১২৬
৩৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৭
৩৫. জাহাঙ্গীর তারেক, প্রতিকবাদী সাহিত্য, ঢাকা ১৯৮৮, পৃ. ১২৬
৩৬. বুদ্ধ দেব বসু, কালিদাসের মেঘদূত, ঢাকা, ১৯৮৮, পৃ. ৬
৩৭. বিনয় কুমার মাহাতা, এলিয়ট ইয়েটস ও বোদলেয়ার, নন্দনতত্ত্ব জিজ্ঞাসা, পৃ. ১১২
৩৮. বুদ্ধদেব বসু, শার্ল বোদলেয়ার ও তাঁর কবিতা, কলকাতা, ১৯৬১, পৃ. ১৪
৩৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৩
৪০. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪
৪১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩৪
৪২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭-৭৫
৪৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৫৯
৪৪. আলাউদ্দীন আল আজাদ, সাহিত্য সমালোচনা ইতিবৃত্ত ও পরিপ্রেক্ষিত, ঢাকা, ২০০০, পৃষ্ঠা ১৪
৪৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭
৪৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯
৪৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০
৪৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০
৪৯. বিষ্ণু দে, প্রবন্ধ সংগ্রহ, প্রথম খ◌ঁ, ধ্র◌ঁবকুমার মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, কলকাতা, ১৯৯৭, পৃ.২৫৩
৫০. বিষ্ণু দে, প্রবন্ধ সংগ্রহ, দ্বিতীয় খ◌ঁ, ধ্র◌ঁবকুমার মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, কলকাতা, ১৯৯৭, পৃ.১৪০
৫১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪০
৫২. আলাওল, পদ্মাবতী, সৈয়দ আলী আহসান সম্পাদিত, ঢাকা, ২০০০, পৃ. ১০৫
৫৩. বুদ্ধদেব বসু, প্রবন্ধ সংকলন, ১৯৮২, কলকাতা, পৃ. ২৫৬
৫৪. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিম রচনাবলী, সাহিত্য সমগ্র (বিষ্ণু বসু সম্পাদিত), কলকাতা, ১৯৮৬, পৃ. ২৭২
৫৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৮
৫৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭২
৫৭. প্রাগুক্ত।
৫৮. প্রাগুক্ত।
৫৯. বিষ্ণুদেব রবীন্দ্রনাথ ও শিল্প সাহিত্যে আধুনিকতার সমস্যা, কলকাতা, ১৯৮৭, পৃ. ৫৮
৬০. অমিত কুমার বন্দোপধ্যায়, সাহিত্য জিজ্ঞাসায় রবীন্দ্রনাথ (দ্বিতীয় খ◌ঁ), কলকাতা,১৯৮০, পৃ. ৭১
৬১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সাহিত্য, কলকাতা, ১৯৫৪, পৃ. ৭৭
৬২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২২
৬৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৭

৬৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৪
৬৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৫
৬৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯
৬৭. সতেন্দ্রনাথ রায়, সাহিত্য তত্ত্বে রবীন্দ্রনাথ, ১৯৯০, কলকাতা, পৃ. ১৮৭
৬৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৫
৬৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮২
৭০. ভবানী গোপাল স্যানাল, রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য তত্ত্ব ও সাহিত্যের পথে, ২০০৫, পৃ. ৪৪
৭১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সাহিত্যের স্বরূপ ১৯৪৩, কলকাতা, পৃ. ৬৬
৭২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সাহিত্যের পথে, ১৯৪৫, কলকাতা, পৃ. ২১০
৭৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩
৭৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩২
৭৫. শ্রীভূদেব চৌধুরী, বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, ১৯৮২, কলকাতা, পৃ. ৪৩২-৪৩৩
৭৬. সুমিতা চক্রবর্তী, কবি আমির চক্রবর্তী, ১৯৯৭ কলকাতা, পৃ. ২৪১
৭৭. অরুন সেন, বিষ্ণুদে-র নন্দন বিশ্ব, ১৯৯৬, কলকাতা, পৃ. ১২
৭৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৫
৭৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪২
৮০. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৬

ক) কল্লোল পত্রিকা ও তার প্রভাব

'কল্লোল' নামের নামের একটি মাসিক গল্প সাহিত্য পত্রিকা ১৯২৩ সালে কলকাতার ১০/২ পটুয়াটোলা লেন'[১] থেকে প্রকাশিত হয়। আট পৃষ্ঠা ডিমাই সাইজে বার ফর্মা থেকে পনের ফর্মা পত্রিকাটির প্রাথমিক মূল্য ছিল চারআনা। সম্পাদক দীনেকর দাশ সহ-সম্পাদক গোকুলচন্দ্র নাগের এ প্রাথমিক লগ্নে বেশ কিছু বৈশিষ্ট্য নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছিল। কিন্তু বিপণন সাহা ও অন্যান্য কিছু আনুষাঙ্গিক কারণে সে চিহ্নগুলো পরিহার করে।[২] সমগ্র বাংলা সহিত্যের অন্যতম পত্রিকাটির গল্পের পাশাপাশি কবিতাও প্রকাশ হতো। অতি আধুনিক লেখক গোষ্ঠীর মূখপত্র হিসেবে কল্লোল পত্রিকার কোনো পত্র সূচনা, মূখপাত্র, ভূমিকা, সম্পাদকীয় নিবেদন ছিল না। কোন বিধিবদ্ধ বা পরিচ্ছন্ন চিন্তা না করে পত্রিকাটি প্রকাশের পথে নামেন। স্বপ্নভিলাসী সাহিত্যনবিশের দুঃসাহসিক প্রচষ্টায় এটি প্রকাশিত হয়। নিজেদের কণ্ঠ দেশের কাছে পৌছানোর স্পর্ধা দেখান।

গোকুলচন্দ্র নাগ ও তাঁর বন্ধুরা মিলে প্রতিষ্ঠা কলকাতায় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ফোর আর্টস ক্লাব, ক্রমে একটি সংগঠন বন্ধুদের মধ্যে দীনেশরঞ্জন দাশ, মনীন্দ্র বসু আর সুনীতি দেবী। এই চারজন মিলে 'ঝড়ের দোলা' নামে একটি বই বের করেছিলেন, চারজনের লেখা চারটি গল্পের সংকলনে তারা একটি মাসিক পত্রিকা বের করা পরিকল্পনা করেছিলেন। সেই পত্রিকারই বাস্তব রূপায়ন "কল্লোল" পত্রিকা। ড: অসিত কুমার বন্দোপধ্যায় মন্তব্য করেন:

কল্লোল পত্রিকায় একদল নবতরুণ সাহিত্যিক ও কবি নতুন সাহিত্য সৃষ্টির তাগিদ অনুভব করলেন যুদ্ধোত্তর ইউরোপের বিশেষত রুশ ও ফরাসি থেকে। তারা এমন সমস্ত সংকীর্ণ গলিপথে যাতায়াত করতে লাগলেন যে, যারা সনাতনী পন্থায় অভ্যস্ত ছিলেন। তারা এতে প্রমাদ শুনলেন"(?) এই লেখকগণ তৎকালীন ইউরোপীয় আদর্শে বাস্তব জীবন, মনস্তত্ত্বের সূক্ষ্মাতীসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ এবং রাজনৈতিক অর্থনৈতিক তাদের রচনার উপজীব্য করেলেন। যদিও বা কল্লোলের প্রথম সংখ্যার 'কল্লোল' কবিতায় দীনেশচন্দ্র দাস মানুষের চিরন্তন দুঃখগাথার প্রতি সহানুভূতির কথাই থাকবো বলে আশাবাদ করেন। বাঙালি সাহিত্যকর্মীরা কোনো কোনো পত্রিকাকে কেন্দ্র করে ছোটখাটো আড্ডা জমিয়েছিলেন। সেই আড্ডার সূত্র ধরেই 'কল্লোল' পত্রিকাকে ঘিরে খুব দ্রুতই একটি আড্ডা জমে উঠে। এ আড্ডায় প্রধানত আসতেন তরুণ সাহিত্যকর্মীরা। কল্লোলের সূচীপত্রে যাদের নাম পাওয়া যায় তা নিম্নরূপ: দীনেশরঞ্জন দাস,

কালীদাস নাগ, কাজী নজরুল ইসলাম, সুধীর কুমার চৌধুরী, বনফুল, রবীন্দ্রনাথ, সুবোধ রায়, প্রমেদ মিত্র যতীন্দ্রনাথ গুপ্ত, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, অমিয় চক্রবর্তী, সুরেশচন্দ্র ঘটক, জসীম উদ্‌দীন, সুনির্মল বসু, তারাশংকর বন্দোপধ্যায়, অন্নদাশংকর রায়, বিষ্ণু দে, সুনীতি দেবী, শৈলজানন্দ, অতুলেন্দু সেনগুপ্ত, গোকুলচন্দ্র নাগ, প্রবোধ স্যানাল, প্রমথ চৌধুরী। প্রমাথ নাগ বিশী, শিবরাম চক্রবর্তী, পবিত্র গঙ্গোপধ্যায়, জগদীস গুপ্ত, দেবন্দ্রনাথ গুপ্ত, অলবেন্দু বসু, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় প্রমূখ। এরা কমবেশী কল্লোলের আড্ডায় সহযাত্রী ছিলেন।এরা 'কল্লোলের দল' নামে পরিচিত ছিল। কল্লোল পত্রিকায় আদর্শ ও উদ্দেশ্য নিয়ে স্পষ্টত কিছুর উল্লেখ ছিল না বিধায় তাতে কিছু কবিতা গল্প, পুস্তকাদি ও পত্রিকার পরিচয়, নানা বিষয়ক চিন্তা, নাট্যলোচনা, সাহিত্য ভাবনা ইত্যাদির মাধ্যমে এর বৈশিষ্ট্যবলী বোধগম্য হয়। যুগধর্মকে প্রকাশের ক্ষেত্রে সমসাময়িককালের চিন্তা-ভাবনা, জীবনের অস্থিরতা বিভিন্ন সমস্যা 'কল্লোল' পত্রিকায় প্রকাশিত হতো। কল্লোলের পত্রিকার অন্যতম লেখক ও পরবর্তীতে অলিখিতভাবে কল্লোল পত্রিকার সম্পাদকের জবানীতে কল্লোলের সুর সম্পর্কে উক্তি বেশ প্রনিধানযোগ্য। "কল্লোল যুগে দুটিই প্রধান সুর ছিল, এক প্রবাল বিরুদ্ধবাদ, দুই বিহবল ভাববিলাস, একদিকে অনিয়মাধীন উদ্দামতা, অন্যদিকে সর্বব্যপী নিরর্থকতার কাব্য। একদিকে সংগ্রামের মহিমা, অন্যদিকে ব্যর্থতার মাধুরী আদর্শবাদী যুবক প্রতিকূল জীবনের প্রতিঘাতে নিবারিত হচ্ছে- এই যন্ত্রনাটা সেই যুগের যন্ত্রনা।.... ম্যালাডি অফ জি. এজ বা যুগের যন্ত্রনা তা "কল্লোলের মুখের স্পষ্ট রেখায় উৎকীর্ণ।"[৩] যুগচিন্তার অনিবার্য পরিণাম হিসাবে একটা বিদ্রোহত্নোক মনোভঙ্গিকে সামনে রেখে কল্লোল পথচলা অব্যহত রাখার চিন্তা ও কর্মযজ্ঞ পরিচালনায় সচেষ্ট ছিল। রবীন্দ্র বিরোধী বলে একটা কথার প্রচারণা ছিল। অচিন্ত্য কুমারের ভাষায়, রবীন্দ্রনাথই বাংলা ভাষার শেষ নয়। তারপরে আর পথ নেই সংকেত নেই, তিনিই সবকিছুর চরম পরিপূর্ণতা। কিন্তু, কল্লোল এসে আস্তে আস্তে সে ভাব কেটে যেতে লাগলো। বিদ্রোহীরা বহ্নিতে সবাই দেখতে পেলুম যেন নতুন পথ, নতুন পৃথিবী, আরো মানুষ আছে, আরো ভাষা আছে, আরো আছে ইতিহাস। সৃষ্টিতে সমাপ্তির রেখাটা টানেননি রবীন্দ্রনাথ তখনকার সাহিত্যে শুধু তারই বহুকৃত লেখনের হীন অনুকৃত হলে চলবে না পত্তন করতে হবে জীবনের আরেক পরিচ্ছেদ: কল্লোলে বিদ্রোহীবাণী উদ্ধত কণ্ঠে ঘোষণা: এ মোর অতুক্তি নয় এ মোর যথার্থ অহংকার, শক্তি আবিস্কার[৪] কল্লোল পত্রিকায় নীতিনির্ধারকগণ প্রতিথযসা

সাহিত্যিকদের স্থান দেওয়া সত্বেও স্বীয় বন্ধু বান্ধবদের শিল্পের দিকটি অবহেলা করে প্রকাশের অনুপযোগী গলা নির্বাচন করতে লাগলো। এর প্রতিক্রিয়ায় 'কালি কলমে' পত্রিকা প্রেমেন্দ মিত্র ও শৈলজানন্দ মুখোপধ্যায়সহ প্রমুখ সম্পাদনা করতে কালি কলম নামের একটি পত্রিকা।

জীবনের আরেক পরিচ্ছেদ কল্লোলের বিদ্রোহবাণী উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা: এ মোর অত্যুক্তি নয় এমোর যথার্থ অহংকার শক্তি আবিস্কার[৫] কল্লোলের বিশিষ্ট লেখক হিসেবে শৈলজানন্দর নাম স্মরণ করেছেন সবাই। রবীন্দ্রনাথ নিজেও লিখেছিলেন: "শৈলজানন্দের গল্প আমি কিছু পড়েছি। দেখেছি, দরিদ্র-জীবনের যথার্থ অভিজ্ঞতা এবং সেই সঙ্গে লেখবার শক্তি তাঁর আছে বলেই তার রচনায় দারিদ্র ঘোষণার কৃত্রিমতা নেই। তার বিষয়গুলো সাহিত্য সভার মর্যাদা অতিক্রম করে নকল দারিদ্রের শখের যাত্রার পালায় এসে ঠেকেনি। নবযুগের সাহিত্যে দেখিনি-দরিদ্র নারায়ণের পূজারির মস্ত একটা তিলক তাঁর কপালে আটা নেই। তাঁর কলমে গ্রামের যে-সব চিত্র দেখেছি তাতে তিনি সহজে ঠিক কথাটি বলেছেন বলেই ঠিক কথা বলবার কারি পাউডারি ভঙয্গীটা তাঁর মধ্যে দেখা যায়নি।"[৬]

শৈলজানন্দের বিষয়ে এই স্বীকৃতির মধ্যেই রবীন্দ্রনাথ তরুণদের বিষয়ে তাঁর আপত্তির কারণকেও জানিয়ে দিচ্ছেন। বস্তুত কল্লোল যা চেয়েছিল শৈলজানন্দ যেন তারই প্রতীক। কিন্তু কল্লোলে শৈলজানন্দ একজনই। কল্লোলের অধিকাংশ লেখকই ছিলেন বয়সে তরুণ। শৈলজানন্দের জন্ম ১৯০১, অজিতকুমার দত্ত-১৯০৭, প্রেমেন্দ্র মিত্র-১৯০৫, অচিন্ত্যকুমার-১৯০৩ আর বুদ্ধদেবের জন্ম ১৯০৮। প্রচলিত স্রোতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ-এক ধরনের রোমান্টিকতা। কল্লোল রবীন্দ্রবিরোধী নয় একথা যেমন সত্য ঠিক ততটাই সত্যি রবীন্দ্রপন্থী নয় তারা। রবীন্দ্রনাথের একক সর্বগ্রাসী উপস্থিতি শঙ্কিত করেছে তাদের কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর এই তরুণ লেখকগোষ্ঠী যে সংকটকে উপলব্ধি করেছিল, যে পরিবর্তমান সমাজের, মূল্যবোধের সহযাত্রী তারা, সে জগৎ রবীন্দ্রচিন্তাবৃত্ত থেকে অনেক দূরে। তাই রবীন্দ্রনাথকে স্বীকার এবং সম্ভ্রম জানিয়ে তারা বিদেশি লেখকদের সাহচর্য চেয়েছিল।

কল্লোল আন্তর্জাতিক লেখকসমাজের স্বপ্ন দেখেছিল। যোগাযোগ করেছিল তখনকার বিশিষ্ট সাহিত্যিকদের সঙ্গে। অর্থাৎ তৎকালীন বিশ্বমননের যোগসূত্রেই নিজেদের গড়ে নিতে চাইছিল তারা। তাই তারা পত্রালাপ করেছে বানার্ড শ, রোমা রোলা, হামসুন, গার্কির সঙ্গে। তাই

অনিবার্য সৃষ্টিকার্য হয়েছে তাদের কাছে বিদেশি সাহিত্যের অনুবাদ। তাই কল্লোলের পাতায় পাওয়া যাবে এধরনের বিশ্বসাহিত্য পরিক্রমার ইতিহাস-পাওয়া যাবে এ ধরনের মন্তব্য:

এই পথে গিয়াছেন গোটে, নীলার, হেইন, ওয়াগনার, রুশো, বিটোভেন, সাঁটু-ব্রিয়া। এই পাওয়া আর না পাওয়ার মাঝে, এই অনন্ত বুভুক্ষার মধ্যে, এই রূপের সম্ভোগে, এই রূপাতীতের স্বপ্নে, এই সীমা ও অসীমের মাঝে বর্তমান ইউরোপীয় সাহিত্যের জন্ম হয়। তাই কল্লোলের এক বছরেরই সাহিত্যের জন্ম হয় (১৩৩৪) আমরা পাই-গ্যাব্রিয়েল ঘ আনুনৎসিয়ো, কবি ফেরদৌসী, সেলমা ল্যাগারলফ, টমাস হার্ডি, ন্যাট হামসুন, পারস্যকবি মুয়িজী ও আনোয়ারী, রোমা রোলা, এইচ. জি. ওয়েলস। অবশ্য, একথা ঠিক, নির্বাচনের বিষয়ে কোনো পরিকল্পনা ছিল না তাদের। কিন্তু বিশ্বসাহিত্য বিষয়ে সচেতনতা কল্লোলের অন্যতম প্রধান ব্রত।

এ প্রশ্ন স্বভাবতই এসে পড়ে কবিতার ক্ষেত্রেও কি তেমন কোনো চরিত্র ছিল কল্লোলের যা দিয়ে তাকে রবীন্দ্রতার বলে চিহ্নিত করা যাবে? হয়তো যাবে না, কারণ বিচ্ছিন্ন কিছু সার্থক কবিতা নিয়ে কোনো সাহিত্য আন্দোলনের স্বাস্তন্ত্র্যকে চিহ্নিত করা যায় না। কিন্তু রবীন্দ্র-আবহ থেকে সরে আসছে যে বাংলা কবিতা, শুধুই অনুচবর্তনে যে মুক্তি নেই যার, প্রথম যুদ্ধোত্তর সংশয়, হতামা আর অনিশ্চয়তায় যে পীড়িত হচ্ছে একদল ভাবুক তরুণ, সেকথা ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে কল্লোলের কবিতার মধ্যে। নজরুল সৃষ্টি যুগের উল্লাসে নিয়ে যেমন দ্বিতীয় সংখ্যাতেই আছে, তেমনি আছে যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, আছে পান্থ কবিতার রচয়িতা মোহিতলাল। আমরা জানি এদের কাছেই সেদিনের তরুণ কবিরা যজন-যাজনের পাঠ গ্রহণ করেছিল।

এছাড়া অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র, সুধীরকুমার রায়চৌধুরী-এরা প্রক্যেকেই রবীন্দ্র-আবহ থেকে মুক্তির আত্মনুসন্ধানের সংকটকে তুলে ধরেছেন তাঁদের কল্লোলের পাতায় আমরা পাই জীবনানন্দ কালে বাংলা কবিতার আধুনিকতার অনিবার্য ভূমিকা যাদের। বুদ্ধদেবের শাপভ্রষ্ট বেরিয়েছে ১৩৩৩-এর কার্তিকে, বেরিয়েছে বন্দীর বন্দনা–এ বছরেরই ফাল্গুন সংখ্যায়। জীবনানন্দের নীলিমা (১৩৩২, ফাল্গুন), মোর আখি জল (১৩৩৩, আষাঢ়), কোহিনুর (১৩৩৩, কার্ত্তিক), শ্মশান (১৩৩৩, পৌষ), দক্ষিণা (১৩৩৩, চৈত্র), সিন্ধু (১৩৩৪, জ্যৈষ্ঠ) –এসব কবিতা প্রকাশিত হয়েছে কল্লোলে। ফলত বাংলা কবিতায় আধুনিকতার প্রস্তুতিপর্বের ইতিহাস কল্লোলের সঙ্গে জড়িত। এই সময়কে উল্লেখযোগ্যভাবে চিহ্নিত করেছেন কবি

জীবনানন্দ দাশ তার কবিতার কথার অসমাপ্ত আলোচনায়–কিন্তু প্রায়ই ব্যর্থ হলেও এবং মোটামুটি রবীন্দ্রনাথকে অবলম্বন করে কবিতা লিখে গেলেও নতুন ভাষায় তাৎপর্য আনবার যে একটা উদ্যোগ চলছিল কল্লোলের সময়, তার মূল্য স্বীকার করতে হবে, এবং কয়েকটি কবিতা অন্তত: সার্থক হয়েছিল, সে সম্বন্ধে অন্যত্র স্বতন্ত্র আলোচনার বিশেষ দরকার। অথবা এই প্রবন্ধেরই অন্যত্র কেন, কিভাবে আর কতদূর রবীন্দ্রনাথ থেকে সরে আসতে চাইছেন কল্লোল-সংঘের কবিরা সে কথার ব্যাখ্যায় তিনি জানান, রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর প্রায় পনেরো বছর আগেই একটা নতুন প্রজাতির ইশারা পাওয়া যাচ্ছিল বাংলা কাব্যে। সেটা কল্লোলের সময়। কল্লোলের লেখকরা ইশারা পাওয়া যাচ্ছিল বাংলা কাব্যে। সেটা কল্লোলের সময়। কল্লোলের লেখকরা মনে করেছিলেন যে রবীন্দ্রনাথ অনেক সার্থক কবিতা লিখেছেন–কিন্তু তিনি যাবতীয় উল্লেখ্য বিষয় নিয়ে কবিতা লেখবার প্রয়োজন বোধ করেন না–যদিও তাঁর কোনো কোনো কবিতায় ইতিহাসের বিরাট জটিলতা প্রতিফলিত হয়েছে বলে হয়, তিনি ভারত ও ইউরোপের অনেক জ্ঞাত ও অনেকের মতে শাশ্বত বিষয় নিয়ে শিল্পে সিদ্ধি লাভ করেছেন, কিন্তু জ্ঞান ও অন্তজ্ঞানের নানা রকম সংকেত রয়েছে যা তিনি ধারণা করতে পারেননি বা করতে চাননি। অবশ্য এভাবেই যে মুক্তি সাজিয়েছিল কল্লোলের লেখকরা তা নয়, কিন্তু এসব চিন্তার সূত্রেই গড়ে উঠেছিল প্রতিরোধ। এ প্রয়োজনের অনুভব ভিতরে থাকলেও কল্লোলের কাব্যে কিন্তু রবীন্দ্রনাথের অনুলেখনই চলছিল। যেদিক দিয়ে সেসব করিয়া নতুন ভূমিকা সামান্য পরিমাণে নিতে পেরেছিলেন সেটা মানুষের জীবনের একটা বিচিত্র দিককে নিয়ে অস্পষ্ট এবং খুব সম্ভব অসাহিত্যিক নিমজ্ঞনের ভিতর। প্রায় অনুরূপ জিনিসকেই লরেন্স যেভাবে ব্যবহার করেছেন তার উপন্যাসে বা ইয়েটস যে পরম রঙ্গে ও প্রজ্ঞায় তার শেষের দিককার কবিতায় তার থেকে এসব রচনা নিচু স্তরের কবিতার ছন্দ ও আঙ্গিকেও কোনো নতুন আবিস্কার হয়েছিল বলে মনে হয় না। তবে গদ্য কবিতার একটা বিশেষ ভঙ্গি–যা ঠিক রবীন্দ্রনাথে পাওয়া যায় না–তার ভিতর কল্লোল নিজের মন খুজে পেয়েছিল বোধ হয়।

গৌতম চক্রবর্তী বলেন, বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে কল্লোল হয়তো তেমন কোনো আন্দোলকে গড়ে তুলতে পারেনি, কিন্তু তিরিশের দশকে বাংলা সাহিত্যের এক কেন্দ্রভূমিকে গড়ে তুলেছিল এই পত্রিকা। পরবর্তীকালে বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে ধারা খ্যাতি লাভ করেছেন তাদের অনেকেরই প্রধান ও প্রথম অবলম্বন ছিল এই পত্রিকা। এই কল্লোল থেকেই আলাদা হয়ে শৈলজানন্দ,

প্রেমেন্দ্র মিত্র আর মুরলীধর বসু আলাদাভাবে বের করলেন কালি-কলম ১৩৩৩-এর বৈশাখে। আর অজিত দত্ত ও বুদ্ধদেব বসুর যৌথ সম্পাদনায় বের হলো প্রগতি আষাঢ় ১৩৩৪-এ। প্রগতির নিয়মিত লেখকদের মধ্যে ছিলেন অচিন্ত্যকুমার, জীবনানন্দ, বিষ্ণু দে, বুদ্ধদেব। কালি-কলম আর প্রগতি দুটিই স্বল্পজীবী হয়েছিল কিন্তু কল্লোলের উৎসভূমি থেকেই ছড়িয়ে পড়েছিল এক অপ্রচল ধারা। গড়ে উঠছিল আধুনিক বাংলা সাহিত্য ইতিহাসের পটভুমি। পরবর্তীকালে পরিচয় আর কবিতা পত্রিাককে কেন্দ্র করে যার পরিনতির পূর্ণাঙ্গ পরিচয়। কল্লোলের আড্ডায় নবীন-প্রবীণের সমাবেশ ঘটত। সেখানে আসতেন-নজরুল ইসলাম, প্রেমেন্দ্র মিত্র, শৈলজানন্দ, অচিন্ত্যকুমার, হেমেন্দ্র-কুমার, মণীন্দ্রলাল, মণীশ ঘটক, পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, ধুর্জটিপ্রসাদ, কালিদাস নাগ, নলিনী সরকার, জসীমউদ্‌দীন, হেমচন্দ্র বাগচী, নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, ভূপতি চৌধুরী, সরোজ কুমার রায় চৌধুরী, শিবরাম চক্রবর্তী, অজিত দত্ত, বিষ্ণু দে, বুদ্ধদেব। বুদ্ধদেব লিখেছেন, "এমন উদার ও বিচিত্র আড্ডায় স্বাদ আমার জীবনে সেই প্রথম। ... আমাদের আড্ডায় যাদের কখনো দেখিনি, কিংবা কমই দেখেছি, এমন অনেকের লেখাও প্রথম কল্লোলে বেরোয় এবং কল্লোলের সূত্রেই তাদের নাম বাইরে ছড়ায় –যেমন অন্নদাশংকর রায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, জগদীশ গুপ্ত ও জীবনানন্দ দাশ। প্রবীণদের মধ্যে যতীন্দ্র সেনগুপ্ত, মোহিতলাল মজুমদার ও নরেন্দ্র দেবের রচনা কল্লোলে প্রায়ই বেরোতো– রাধারানী দেবীও নিয়মিত লিখতেন–এবং একথা বললে অত্যুক্তি হয় না। যে তৎকালীন তরুণ লেখকসমাজে যতীন্ত্র সেনগুপ্ত ও মোহিতলালের প্রতিপত্তির অন্য কল্লোলই প্রধানত দায়ী। তাছাড়া রবীন্দ্রনাথ অনুকম্পা থেকেও কল্লোল বঞ্চিত হয়নি, তার অন্য নানান রচনার মধ্যে বাঁশি যখন থামবে ঘরে কবিতাটি কল্লোলেই প্রথম বেরোয়। সে-সময়ে যামিনী রায় অল্পই প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন, কিন্তু তার ছবি কল্লোলে দেখেছি বলে মনে পড়ে। একথা এখানকার অনেকেই বোধহয় জানেন না যে নজরুলের গজল গানগুলি কল্লোলেই প্রথম বেরোয়, আর কল্লোল আপিলের তক্তাপোশে বসে নজরুল যখন অক্লান্ত উল্লাসে সেসব গান গাইতেন, তখন তা সারা বাংলাদেশের মনোহরণ করেনি। বস্তুত: বিশ শতকের তৃতীয় দশকে বাংলাদেশের যে কটি যুবক সাহিত্য ক্ষেত্রে খ্যাতি লাভ করেন তাদের সকলেরই প্রথম ও প্রধান অবলম্বন ছিল কল্লোল এবং সে হিসেবে সবুজপত্র ও ভারতীয় সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে কল্লোলের নামও স্মরণীয়।

Dhaka University Institutional Repository

কল্লোল এবং রবীন্দ্রনাথ–ছুটো নামের সহাবস্থান বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে স্বীকৃত নয়। যেমনভাবে ভারতী সাধনা প্রবাসী বা বিচিত্রার সঙ্গে সহজেই রবীন্দ্রনাথের নাম উচ্চারিত হয়, কল্লোলের ক্ষেত্রে তা নয়। বরং অ-রবীন্দ্র হওয়াই কল্লোলব্রতীদের সাধনা। কল্লোল একটি রবীন্দ্র-বিরোধী সাহিত্য আন্দোলনের নাম, এ ধারণাও রয়েছে অনেকের মনে। আর কল্লোলের আন্দোলন যতখানি গল্প, উপন্যাস, ততখানি কবিতা নিয়ে নয়–এ বিশ্বাসও বিরল নয়। কিন্তু সাত বছরের কল্লোল পত্রিকার নিবিষ্ট পাঠে এসব ধারণার সমর্থন মেলে না। লেখার মেধ্য রবীন্দ্র-অনুবর্তন তারা চাইছিলেন না–এ যেন সেই মুহূর্ত, যখন রবীন্দ্রনাথের মায়াজাল থেকে মুক্ত হবার ইচ্ছেটা জেগে উঠেছে, কিন্তু অন্য পথ ঠিক খুজে পাওয়া যাচ্ছে না। যেন একটা আলো-আধারি সময়, যখন নতুনের ঝিলিক দিচ্ছে জানালায়, অথচ ঘরের মধ্যে জড়ো হয়ে আছে পুরোনো আসবাবপত্র, ভারি, অনড়, মমতায় অভ্যাস।

"কল্লোলের লেখকগোষ্ঠীর গল্পে নিচুতলার জীবনযাত্রার প্রতি নিবিড় কৌতুহল ও নরনারীর সম্পর্ক বিচারে অধিকতর সংস্কামুক্ত ও নির্মোহ দৃষ্টিভঙ্গীর প্রতিফললে সমকালীন তরুণ বাঙালি বুদ্ধিজীবীর মানসিক হাওয়াবদল স্পষ্টত:ই বিম্বিত হলো। অবিশ্বাস, সংশয়াতুর জিজ্ঞাসা, নৈরাশ্যের গ্লানি, পরাজয়ের যন্ত্রণা, বিক্ষোভ, বিদ্রোহ এবং ধর্ম-প্রেম-সত্য-সৌন্দর্যসম্ভদীয় প্রচলিত মূল্যবোধে আস্থাহীনতা এ সময়কার তরুণ বাঙালী লেখকদের মনোলোক আচ্ছন্ন করল।"[৭]

যেমন গল্প-উপন্যাসে, কবিতায় কোনো কোনো ক্ষেত্রে ভিন্ন কণ্ঠস্বর শোনা গেল। একজন সচেতন পাঠক কল্লোলের পৃষ্ঠায় যখন দেখেন– নজরুল, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্যকুমার, যতীন্দ্রনাথ, জসীমদ্‌দীন, মোহিতলাল, বন্দে আলী মিয়া– এদের কবিতা, আর পরবর্তী বাংলা আধুনিকতার সেই মৌল কবিদের –জীবনানন্দ, বুদ্ধদেব, অমিয় চক্রবর্তী–তখন কল্লোলের কবিতাধারাকে অবহেলা করা যায় না। এর সঙ্গে আছেন রবীন্দ্রনাথ। একথা সত্য, রবীন্দ্রনাথ থেকে মুক্তি চাইছেন কল্লোলের লেখকরা, খুঁজছেন অন্যপথ–কিন্তু সে সংকট তাদের স্বতন্ত্র হওয়ার সংকট। সে স্বাতন্ত্র্য কোনো সংঘর্ষ বা ব্যঙ্গ-বিরোধিতার মধ্যে অর্জন করতে চাইছেন নাতাঁরা। যৌন-জীবন নিয়ে কল্লোলের লেখকদের যে আসক্তি তা তাই যতখানি প্রকরণগত ততখানি বিষয়গত নয়। এ পথে সহজেই যেন নিজেদের রবীন্দ্রতর করে চিহ্নিত করতে পারবেন তাঁরা। আর এখানে হয়তো তাদের সার্থকতা এবং ব্যর্থতা। কল্লোল-এ ১৩৩২-এর

বৈশাখে রবীন্দ্রনাথের একটি চিঠি প্রকাশিত হয়েছিল। হয়তো পরোক্ষে নির্মাণ আর সৃষ্টির এক সাহিত্যের ইতিহাসপণ্ডিত পাওয়া যাবে কল্লোলের সংখ্যা পরম্পরায়। সেখানে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন:

"..বাঁশির ছিদ্রে যে হাওয়া খেলছে সে ত সঙ্গীত নয়–আমার বোধের মধ্যে যে একটি অনির্ব্বাচনীয় ব্যাপার ঘটচে সেইটেই সঙ্গীত। ঈশ্বরের কম্পন, বাতাসের চাঞ্চল্য তথ্য মাত্র, তা সত্য নয়, –তা অক্ষরের বিন্যাস মাত্র তা কবিতা নয়। তা সৃষ্টি নয়, তা নির্মাণ নির্মাণ তাকে মাপা যায় কারণ তা আংশিক। কবি, কাব্যে যে অক্ষর বিন্যাস করেন তাকে মাপা যায় কিন্তু কাব্যকে মাপা যায় না। সেটা আমার বোধের মধ্যে পৌছে রূপকে পেরিয়ে অপরূপ হয়েছে। আলোক ও সঙ্গীত মাপের জিনিস নয়, কেননা তা সষ্টি। সৃষ্টি, কিনা সজ্ঞান– নিজেকে দান করা। কবি তার কাব্যে নিজেকে দান করেন, সেটা তার Personal tact –কিন্তু অক্ষর বিন্যাসটা বিধি, সেটা impersonal । বিশ্বসৃষ্টির মূলেও একটা ব্যক্তিগত ইচ্ছা আছে, সেইজন্যেই সেটা আমাদের ব্যক্তিগত সম্বন্ধের মধ্যে সম্পূর্ণ হয়–এর মাঝখানে একটা পদার্থ আছে সেটা সৃষ্টি নয় সৃষ্টির নিয়ম, সেটা ঈশ্বরের কম্পন। বিজ্ঞান সেই নিয়মকেই বলছে জগৎ। কিন্তু নিয়ম জিনিসটা ও আপনাতেই আপনি সম্পূর্ণ নয়–নিয়ম একটা চরম উদ্দেশ্যের অপেক্ষা রাখে–সুর বিন্যাসের নিয়ম মিথ্যা হত যদি সেটা গানের আনন্দে পর্যাবসিত হয়ে সার্থক না হত।"

"রবীন্দ্রনাথকে উপহাস করিয়া কিছু লেখিবার সম্ভাবনা আমাদের নাই –তাহা যাহারা পূর্ব্বাপরা কল্লোলের সমস্ত সংখ্যাগুলি পাঠ করিয়াছেন তাহারা বুঝিতে পারিবেন।

এমন ধারণা অনেকের হতে পারে যে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের "আবিস্কার"- এর মতো কবিতা যখন কল্লোলে প্রকাশিত হয় তা রবীন্দ্র-বিরোধীতারই ইস্তাহার, যেখানে কবি লেখেন–

"পশ্চাতে শত্রুরা শর অগণন হানুক ধারালো,
সম্মুখে থাকুন বসে, পথ করি রবীন্দ্র ঠাকুর,
আপন চক্ষের থেকে জালির যে তীব্র তীক্ষ্ণ আলো
যুগ-সূর্য ম্লান তার কাছে।"

এখানেও রবীন্দ্র-বিরোধিতার কোনো চিহ্ন নইে। এ অহংকার তো যে-কোনো তরুণ কবির চিরকালের প্রতিস্পর্ধা। 'কল্লোল যুগ' গ্রন্থে প্রথম চৌধুরীর কাছ থেকে শোনা অচিন্ত্যকুমার

সেনগুপ্তের সেই কথা উল্লেখযোগ্য : এমনভাবে লিখে যাবে যেন তোমার সামনে আর কেউ দ্বিতীয় লেখক নেই। কেউ তোমার পথ বন্ধ করে বসে থাকেনি। লেখকের সংসারে তুমি একা, তুমি অভিনব?

'আমার সামনে আর কেউ বসে নেই? চমকে উঠতাম।

'না।'

'রবীন্দ্রনাথ?'

'রবীন্দ্রনাথও না। তোমার পথে তুমিও একমাত্র পথকার। সে তোমার একলার পথ। যতই দল বাঁধো প্রত্যেকে তোমরা একা।'

যদিও কল্লোল একটি গোষ্ঠী হিসেবেই চিহ্নিত কিন্তু পরবর্তীকালে প্রত্যেকেই নিজস্বতায় প্রকাশিত হয়েছেন সেটাই স্বাভাবিক।

কল্লোলের অন্যতম সম্পাদক অচিন্তকুমারের প্রেক্ষিতে আমরা কল্লোলের প্রভাবটি অবগত ইন্ট

কল্লোল-এর কর্ণধারদের সঙ্গে অচিন্ত্যকুমারের পরিচয় হয় ১৩৩১ সালের জ্যৈষ্টে এই পরিচয় ঘনিষ্ঠ হতে সময় লাগেনি। কল্লোলের সংস্পর্শে এসে অচিন্ত্য-প্রতিভার পালে হাওয়া লেঘেছে। কবিতা-গল্প-উপন্যাস রচনায় নিজেকে সঞ্জীবিত করে তুলেছেন তিনি। কল্লোল ছিলো তাঁর এ কালের সাহিত্য-প্রেরণার অন্যতম প্রধান উৎস। শ্রাবণ ১৩৩ সংখ্যা কল্লোলে প্রকাশিত হয় তার গল্প গুমোট। এ পত্রিকায় অচিন্ত্যকুমারের এটি প্রথম প্রকাশিত রচনা।

বাঙালি সাহিত্যকর্মীরা কোনো কোনো পত্রিকাকে কেন্দ্র করে ছোটখাটো আড্ডা জমিয়েছেন। সেই ঐতিহ্যের সূত্র ধরেই কল্লোল পত্রিকাকে ঘিরে খুব দ্রুত একটি আড্ডা জমে ওঠে। এ আড্ডায় প্রধানত আসতেন তরুণ সাহিত্যকর্মীরা। কল্লোলকে ঘিরে যে আড্ডা জমেছিলো অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত তার মনোজ্ঞ বিবরণ দিয়েছেন কল্লোল যুগ (১৩৫৭) গ্রন্থে। কল্লোল পত্রিকার প্রকাশকালে অচিন্ত্যকুমার এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না, কিন্তু কল্লোল এবং অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত–এই দুই নাম প্রায় অঙ্গাঙ্গীসূত্রে জড়িত। অচিন্ত্যকুমারের সাহিত্যিক খ্যাতির প্রথম সোপান ছিলো কল্লোল পত্রিকা। জীবোন্দ্র সিংহ রায় লিখেছেন:

"অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের (১৯০৩) কথা যেখানেই বলা হোক না কেন কল্লোলের সবুজ মিছিলে তিনি এক বলদপ্ত শক্তি। তাঁর প্রথম লেখা (কয়েকটি কবিতা নীহারিকা দেবীর ছদ্মনামে ১৩২৮-২৯ সালে প্রবাসীতে মুদ্রিত হয়) কল্লোলে প্রকাশিত হয় নি, কিন্তু তিনি যতার্থভাবে কল্লোলেই প্রকাশিত হয়েছেন। বন্ধু সুবোধ দাশগুপ্তের সঙ্গী হয়ে তিনি কল্লোলে এসে পৌছেছিলেন। ১৩৩১ সালের শেষ সংখ্যায় সন্ধ্যাদীপের শিখারমতো জ্বলে উঠেছিলো তাঁর কবিতা সঙ্কেতময়ী। এই দুইয়ের মধ্যবর্তীকাল তাঁর পক্ষে অজস্র সৃষ্টি ও অক্লান্ত সংগ্রামের কাল। তিনি দুই হাতে গল্প প্রবন্ধ ও কবিতা লিখেছেন। সাহিত্যের স্বাস্থ্যরক্ষার নামে বিরোধীরা সোরগোল তুলে উপহার দিয়েছেন নিন্দার বিষ, রবীন্দ্রনাথের হাত থেকেত মিলেছে নিন্দা-প্রশংসা দুই-ই। তবু তিনি কখনো ক্ষান্ত হন নি; কল্লোলের স্রোতাবর্তে নিত্য অবগাহন করে থেকে থেকে জ্বলে উঠেছেন দিয়েছেন স্বনিষ্ঠ প্রাণ।"

কল্লোল পত্রিকার সহ-সম্পাদক এবং কল্লোলের প্রাণপুরুষ গোকুলচন্দ্র নাগের মৃত্যুর পর (আশ্বিন ১৩৩২) আচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত অলিখিতভাবে কল্লোল পত্রিকা সমপাদনের দাযিত্ব গ্রহণ করেন। ১৩৩২ থেকে ১৩৩৬ সালে বন্ধ হয়ে যাবার পূর্ব পর্যন্ত তিনি এউই পত্রিকার সম্পদনার সঙ্গে গভীরভাবে জড়িয়েছিলেন। অচিন্ত্যকুমারকে লেখা অন্নদাশংকর রায়-এর একটি চিঠির অংশ এ রকম:

"কল্লোলের ভার আপনি নিচ্ছেন জেনে কাগজখানার ভাবী Personality সম্পর্কে নিঃসংশয় হরূম। ওখানা আপনার বঙ্গদর্শন বা সাধনা হোক আমার প্রত্যাশা। আমি তো বরাবরই আপনাদের সঙ্গে আছি মনে-মনে, এবার না হয় প্রত্যক্ষভাবে যোগ দেবো।"[৮]

'কল্লোল' পত্রিকাকে ঘিরে একটি সাহিত্যিক-বিরোধ ক্রমশ দানা বেঁধে উঠছিলো। সেকালের প্রাচীনপন্থী প্রতিক্রিয়াশলীরা কল্লোলগোষ্ঠীর আধুনিক লেখকদের আধুনিক ভাবধারার বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করেন। শনিবারের চিঠি ছিলো এদের মুখপত্র। শনিবারের চিঠির (আত্মপ্রকাশ: ২৬ শে জুলাই ২৯২৪) কোনো সিরিয়াস আদর্শ ছিলোনা, সাহিত্যের সূচিতা রক্ষার নামে সাহিত্যিকদের, বিশেষ করে তরুণদের, উদ্দেশ্যে ব্যঙ্গ-বিদ্রোপের বাণ নিক্ষেপ করাই এর লক্ষ্য ছিলো। শনিবারের চিঠি আধুনিক সাহিত্যের বক্তব্য ও প্রকাশরীতির তীব্র ও অসংযত সমালোচনা করতো। আধুনিকদের যৌবনবন্দনা ও যৌন চেতনার বাড়াবাড়িকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথও তার মতামত ব্যক্ত করেন। এ বিষয়কে কেন্দ্র করে সমকালনী নবীন ও প্রবীণদের মধ্যে প্রচুর বাকবিতণ্ডা হয়েছে, রবীন্দ্রনাথও এতে অংশ নেন। রবীন্দ্রনাথের

জোড়াসাকোর বাড়িতে এ বিষয়ে সাহিত্য বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে, কিন্তু কোনো সমাধানে পৌঁছা সম্ভব হয় নি। রবীন্দ্রাথের পৌরহিত্যে এই সাহিত্যে সভায় প্রগতিবাদীদের প্রতিনিধিত্ব করেন নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, বুদ্ধদেব বসু, রাধারাণী দেবী ও দীনেশরঞ্জন দাশ।

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত রবীন্দ্রনাথকে প্রথম দেখেন ১৮ ফাল্গুন ১৩৩০ সালে। রবী্নদ্রনাথ তখন সেনেট হলে কমলা লেকচার্স দিচ্ছেন। রবীন্দ্রনাতের উদ্দেশ্যেস অচিন্ত্যকুমার বেশ কয়েকটি কবিতা লিখেছেন। এর মধ্যে সবুজপত্রে প্রকাশিত কবিতাটি সম্পর্কে বুদ্ধদেব বসু লিখেছেন:

> বাংলা মাসিকপত্রে কবিতার সাধারণ স্থান পাদপ্রান্তিক। গদ্যে-পদ্যে এই ভেদনীতি নেই সবুজপত্রে। কিন্তু সেখানে আবার কবিতা থাকে অল্প। যা থাকে প্রায় সবই রবীন্দ্রনাথ–উঠতি কবিতাদের মধ্যে একবার স্থান পেয়েছিলো শুধু অচিন্ত্য তার চমৎকার রবীন্দ্রনাথ কবিতাটি নিয়ে।

রবীন্দ্রপ্রতিভায় মুগ্ধ অচিন্ত্যকুমারের একসময় মনে হয়েছিলো রবীন্দ্রনাথই সবকিচুর চরম পরিপূর্ণতা। কিন্তু কল্লোলে এসে আস্তে আস্তে সে ভাব-কেটে যেতে লাগল। বিদ্রোহের বহ্নিত সবাই দেখতে পেলুম যেন নতুন পথ, নতুন পৃথিবী। সাহিত্য শুধু তারই বহুকৃত লেখনের হীন অনুকৃতি হলে চলবে না। পত্তন করতে হবে জীবনের আরেক পরিচ্ছেন। ১৩৩৬ সালের কার্তিক সংখ্যা কল্লোলে অচিন্ত্যকুমার আবিস্কার কবিতায় প্রকাশ করলেন রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যাদর্শের বিরুদ্ধে বিদ্রোহবাণী। কাবিতাটি উদ্ধৃত হচ্ছে:

এ মোর অত্যুক্তি নয়, এ মোর যতার্থ অহংকার,
যদি পাই দীর্ঘ আয়ু, হাতে যদি থাকে এ লেখনী,
কারোও ডরি না কভু; সুকঠোরে হাউক সংসার,
বন্ধুর বিচ্ছেদ তুচ্ছ, তুচ্ছতর বন্ধুর সরণি।
পাশ্চাতে শত্রুরা শর অগণন হানুক ধারালো,
সম্মুখে থাকুন বসে পথ রুধি রবীন্দ্রঠাকুর,
আপন চক্ষের থেকে জ্বালিব যে তীব্র তীক্ষ্ম আলো
যুগ-সূর্য ম্লান তার কাছে। মোর পথ আরো দূর।

গভীর আত্মোপলব্ধি–এ আমার দুর্দান্ত সাহস,
উচ্চকণ্ঠে ঘোষিতেছি নব-নর-জন্ম-সম্ভাবনা;
অক্ষয় তুলিকা মোর হস্তে যেন রহে অনলস,
ভবিষ্যৎ বৎসরের শংখ আমি-নবীন প্রেরণা।
শক্তির বিলাস নহে, তপস্যায় শক্তি আবিষ্কার,
শুনিয়াছি সীমাশূন্য মহা-কাল-সমুদ্রের ধ্বনি
আপন বক্ষের তলে; আপনারে তাই নমস্কার।
চক্ষে থাক আয়ু-উর্মি, হস্তে থাক অক্ষয় লেখনী ॥

[Awe®vi, AwPšÍ¨Kgvi †mb¸ß]

নতুন সাহিত্য-জগৎ সৃষ্টির এই প্রবল আকাঙ্খা ইতোপূর্বে এতোটা স্পষ্ট করে আর উচ্চারিত হয়নি। এ কবিতায় রবীন্দ্র সাহিত্যাদর্শ ও তাঁর সাহিত্যে চিত্রিত জগৎ থেকে দূরে সরে নতুন সাহিত্যভুবন নির্মাণের আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করা হয়েছে। কল্লোলের রবীন্দ্র-বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অচিন্ত্যকুমার লিখেছেন:

একদিকে বিদ্রোহী, অন্যদিকে ভাবনুরাগী। ভাগ্যের রসিকতায় নিজেও ভাগ্যের প্রতি পরিহাসপ্রবণ। বস্তুত কল্লোলযুগে এ দুটোই প্রধান সুর ছিল, এক. প্রবল বিরুদ্ধবাদ, দুই. বিহ্বল ভালবিলাস। একদিকে সংগ্রামের মহিমা, অন্যদিকে ব্যর্থতার মাধুরী। আদর্শবাদী যুবক প্রতিকূল জীবনের প্রতিঘাতে নির্ধারিত হচ্ছে– এই যন্ত্রনাটা সেই যুগের যন্ত্রনা। রবীন্দ্রনাথ থেকে সরে এসেছিল কল্লোল। সরে এসেছিল অপজাত ও অবজ্ঞাত মনুষ্যত্বের জনতায়। নির্গত মধ্যবিত্তদের সংসারে, কয়লাকুণ্ঠিতে, খোলার বস্তিতে, ফুটপাতে। প্রতারিত ও পরিত্যক্তেরা এলাকায়।

অচিন্ত্যকুমার ঢাকা থেকে প্রকাশিত বুদ্ধদেব বসুর প্রগতি পত্রিকারও নিয়মিত লেখক ছিলেন। প্রথম সংখ্যা থেকে শুরু করে ১৯২৯-এ বন্ধ হয়ে যাবার পূর্ব পর্যন্ত তিনি প্রগতিতে লিখেছেন। শ্রী অভিনব গুপ্ত ছদ্মনামে এ পত্রিকায় তিনি মাসিকী লিখতেন। আধুনিক সাহিত্যের বিরুদ্ধবাদীদের বিরুদ্ধে তিনি প্রচুর লিখেছেন এখানে। উত্তরা কালি-কলম, পুর্বামা, সংহতি,

পরিচয় –প্রভৃতি পত্রিকায় অচিন্ত্যকুমারের অনেক লেখা তখন প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর নানা লেখাই তখন আলোড়ন সৃষ্টি করেছে।

কাজী নজরুল ইসলামের সঙ্গে অচিন্ত্যকুমারের সম্পর্ক ভালো ছিলো না। তাঁর বিয়ের মজলিশে কাজী নজরুল ইসলাম আসর জমিয়ে গান গেয়েছেন, হৈ-হুল্লোড় করেছেন। বন্দুদের সঙ্গে অনেকবার তিনি নজরুলের অফিসে গেছেন। অচিন্ত্যকুমার সেকালের প্রায় প্রতিটি সাহিত্যপত্রে লিখেছেন। সাহিত্যে নিবেদিত প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাসী এই লেখক সমসাময়িক সাহিত্যেকর্মীদের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্ক জায় রাখতেন। সমসমায়িক বিশ্বসাহিত্যের দিকপালদের সঙ্গেও তিনি চিঠিপত্রে যোগাযোগ করেছেন।

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত প্রধানত ঔপন্যাসিক। তাঁর প্রথন উপন্যাস বেদে ধারাবাহিকভাবে বল্লোলে প্রকাশিত হয়। বইটি গ্রন্থকারে প্রকাশিত হয় ১৩৩৫ সাল। কল্লোলে প্রকাশিত সবচেয়ে আলোড়ন সৃষ্টিকারী উপন্যাস বেদে। প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে এ বই নিয়ে পাঠকমহলে সমালোচনা ও নিন্দার ঝড় উঠে। রবীন্দ্রনাথ এ বই পড়ে শান্তিনিকতেন থেকে অচিন্ত্যকুমারকে একটি চিঠি লেখেন। রবীন্দ্রনাথের মূল্যায়ন ছিলো যথার্থ।

বেদে, আকস্মিক, টুটা-ফুটা ও কাকজ্যোৎস্না অচিন্ত্যকুমারের সাহিত্যজীবনের প্রথম দিককার রোমান্টিক রচনা। এসব রচনার মধ্যে বাস্তবতার স্পর্শ থাকলেও রোমান্টিক কল্পনার আতিশয্য এদের শিল্পমান ক্ষুণ্ন করেছে।

বিবাহের চেয়ে বড়ো (১৩৩৮) উপন্যাস প্রকাশিত হওয়ার পরও পাঠক ও সমালোচকমহলে প্রশংসা ও নিন্দার ঝড় ওঠে। রক্ষণশীল সমাজ বইটির বিষয়বস্তু সম্পর্কে প্রবল আপত্তি তোলে এর বিষয় সেকালের বাঙালি সমাজের নৈতিক ধ্যান-ধারণায় আপত্তিকর মনে হয়েছিলো। বিবাহের চেয়ে বড়োর বিষয়ের মধ্যে ছিলো দুই তরুণ তরুণীর অন্তরঙ্গ জীবন-কথা-যারা বিয়ে না করেও পরস্পরকে ভালোবাসে একত্রে থাকবে। তৎকালীন সমালোচকদের কাছে এই বিষয়টাই অশ্লীল মনে হয়েছিলো। অশ্লীলতার দায়ে এ উপন্যাস নিয়ে পুলিশী ঝামেলা হয়। সরকারি চাকরি রক্ষার খাতিরে অচিন্ত্যকুমার অবিক্রিত বইগুলো লালবাজর পুলিশের কাছে সারেন্ডার করেন। ষোলো বছর পর এ বইয়ের পরবর্তী সংস্করণ বেরোয়। শেষ সংস্কারের ভূমিকায় অচিন্তকুমার লিখেছেন:

> কালচক্রে অবস্থা বদলায়, সমাজ বদলায়, এক যুগের পাপ অন্যযুগে নিত্যকৃত্য হয়ে ওঠে–নিয়ন্ত্রণের আড়ালে নিয়ন্ত্রণ নির্বিরোধে নিয়ম ভাঙ্গে। যে আইন একদিন বিয়েকে স্বর্গীয় করে রেখেছিলো সে আইন এখন বিয়ের পরে বিচ্ছেদের পরিচ্ছেদ জুড়ে দিয়েছে, দিয়েছে নতুন বিয়ের অধিকার। কিন্তু যে যাই বলুক, বিয়ে টিকুক বা ভাঙ্গুক, বিয়ের চেয়ে বড় যে প্রেম সে চিরকালই বড়।

প্রেম বড়ো এবং শ্বাশত। এ বিষয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। উপন্যাসের বিষয় আধুনিক সমালোচকের কাছে আপত্তিকর নয়। প্রকৃত সমালোচক শুধু বিষয়ে দৃষ্টি নিবন্ধ করেন না। তিনি বিচার করে দেখেন বিষয় শিল্পসম্মত রূপে উপন্যাসের প্রকরণের সঙ্গে সমন্বিত হয়েছে কিনা। তাঁর বিবেচনার বিষয় উপন্যাসের শিল্পগুণ। বিবাহের চেয়ে বড়ো প্রকাশকালে আলোড়ন তুললেও এর শিল্পমূল্য খুব উল্লেখযোগ্য নয়।

অচিন্ত্যকুমারের প্রাচীর ও প্রান্তর (১৩৩৯) উপন্যাসটিও অশ্লীলতার দায়ে পুলিশ বাজেয়াপ্ত করে।[৪৬] এ উপন্যাসের নায়ক পুরুন্দর তার বিবাহিত স্ত্রী সীতার প্রেম উপেক্ষা করে দেহজ প্রেমের উদ্দামতায় আকৃষ্ট ; আত্মস্বাতন্ত্র্যে পুরন্দর ও সীতা দুজনেই পরস্পরের কাছে থেকে মানস-বিচ্ছিন্ন। তবে পরস্পরের জন্য মানস-প্রতীক্ষাই তাদের পুনর্মিলন ঘটিয়েছে। অস্বীকার করার উপায় নেই যে প্রকাশকালে প্রবল আলোড়ন তুললেও অচিন্ত্যকুমারের বিবাহের চেয়ে বড়ো ও প্রাচীর ও প্রান্তর জীবনের গভীর তল-স্পর্শী রচনা নয়। ভাষাভঙ্গি এবং গঠনশৈলীতেও এ দুই উপন্যাসে শৈথিল্য লক্ষ্য করা যাবে। তাঁর প্রথম প্রেম (১৩৩৯), দিগন্ত (১৩৩৯), ও মুখোমুখি ১৩৩৯) উপন্যাস প্রসঙ্গেও এ মন্তব্য অপ্রসাঙ্গিক নয়। অধিবাস (১৩৩২) গল্পগ্রন্থে উদ্দমা আবেগ তুলনামূলকভাবে কমেছে, ভাষা হয়েছে প্রাসঙ্গিক এবং শিল্পসফল তার জননী জন্মভূমিশ্চ (১৩৩৯) উপন্যাস বাঙালি মধ্যবিত্ত জীবনের ক্ষয়িষ্ণু মূল্যবোধের সঙ্গে নতুন চেতনার সংঘর্ষের কাহিনী নিয়ে লেখা।

এ কালে প্রচুর লিখেছেন অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। তার অধ্যাবসায় সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে নিরঞ্জন চক্রবর্তী লিখেছেন:

মুনসেফি চাকরিতে জবানন্দী ও রায় লেখাতেই দীর্ঘসময় কেটে যায়। কিন্তু আচিত্যকুমারের অধ্যবসায় অবিশ্বাস্য। ১৩৩৯ (১৩৩২-৩৩) থেকে ১৩৪১ সাল, এই তিন বৎসরের মধ্যে তার প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা প্রায় ছাব্বিশখানা।

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত বহুপ্রসু, কিন্তু সে তুলনায় স্মরণীয় রচনার জন্ম দিতে পারেনি । তার এ কালে লেখা ইন্দ্রানী (১৩৪০) প্রেমের উপন্যাস। এর কাহিনীর মধ্যে রয়েছে সমস্যাকীর্ণ তিক্ত জীবনসংগ্রামের পরিপ্রেক্ষিতে অবিনশ্বর প্রেমের বিজয় ঘোষণা। তৃতীয় নয়ন (১৩৪০), ছিনিমিনি (১৩৩৮) ও ডাউন দিল্লি এক্সপ্রেস (১৩৪০) বেরোয় প্রায় একই সমকালে। একালের কয়েকটি উপন্যাস প্রসঙ্গে বাণী রায় লিখেছেন:

'অনন্যা, ইন্দ্রানী, মুখোমুখি ইত্যাদি পুস্তকে আধুনিকীর রূপ পাওয়া গেল। .... ইন্দ্রানীর সুদর্শনের কাছে ফিরে যাওয়ার মধ্যে চিরন্তনী নারীর দেখা পাওয়া যায়। তখন মনে হয়, এই তো স্বাভাবিক, গায়ের জোরে কটু ট্র্যাজেডি গেলালো সেটাই হয়ে যেত অপরিণত লেখনীর পরিচয়। ইন্দ্রানীর আত্মসম্মান বজায় রইল কিনা, কর্মজীবনে জলাঞ্জলি দেওয়া উচিত ছিল কিনা, এসব প্রশ্ন মনে জাগে না। ইন্দ্রানীর অতিসহজ আত্মনিবেদন রাধার আত্মনিবেদনে রূপান্তর নেয়। এখানে অচিন্ত্যকুমারের চরিত্র ও রচনার চাবিকাঠি হাতে পাই। তিনি প্রধানত কবিমনা, মাধুর্যধর্মী। বাস্তবতার সুকঠোর প্রলেপেও মধুর শেষ হয়ে যায় না।

বাণী রায়ের বিবেচনা সরল ও একারৈখিক। তিনি উপন্যাসের শিল্পরূপ বিবেচনা করেন নি। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত দীর্ঘজীব্যাপী প্রচুর গল্প উপন্যাস রচনা করেছেণ তাঁর কালো রক্ত ডবলডেকার, উর্ণনাভ, মন্দ্রাক্রান্ত, যে যাই বলুক অন্তরঙ্গ রূপসী রাত্রি এবং প্রথম কদম ফুল জনপ্রিয় রচনা। কিন্তু জনপ্রিয়তা সাহিত্যসিদ্ধি মাপকাঠি নয়। তার উপন্যাসের বিষয়বস্তু, আবেগ-কল্পনা, বাস্তবতা এবং ভাষা এবং সামগ্রিক ঐক্যসূত্রে সর্বত্র সমন্বিত হয়ে উঠে নি। অচিন্ত্যকুমারের উপন্যাস কোথাও কোথাও ক্ষুণ্ন হয়েছে। এ জন্যেই তার রচনা জনপ্রিয় হয়েও সার্থক সাহিত্যে মর্যাদাবঞ্চিত। তার গদ্যে তিনি সঞ্চার করেছেন কবিতার আবেগ। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় অচিন্ত্যকুমারের উপন্যাসকে তাই কাব্যধর্মী আখ্যা দিয়েছেন। উপন্যাসের ভাষা বিষয়ে সামগ্রিক সচেতনতা তাঁর মধ্যে কমেই ছিলো।

রবীন্দ্রনাথের রোমান্টিক সাহিত্যাদর্শের প্রতিক্রিয়ায় অচিত্যকুমার ছিন্নমুল নায়কের মাধ্যমে যে বাস্তব চেতনাকে সাহিত্যে স্থান দিয়ে চেয়েছিলেন সে প্রসঙ্গে বেদে এবং তার অন্যকিছু রচনার কথা মনে রেখেও বলা যায় যে স্বভূমি এবং পরিবেশ সম্ভন্ধে কোনো গভীর ৪৯ জিজ্ঞাসায় তিনি আলোড়িত হননি। কল্লোলগোষ্ঠী এবং অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত সম্পর্কে সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্য স্মরণযোগ্য:

Dhaka University Institutional Repository

..... কল্লোল এই সাহিত্যিক দাযিত্ব পালনের জন্যব্যস্ত ছিল যে পরিমাণে, সে পরিমাণে প্রস্তুতি ছিল না। এই ব্যস্ততায় মেস যে-আগ্রহে পাঠ করেছে আন্তর্জাতিক সাহিত্য, সেই অনুসারে পাঠ করে নি দেশের জীবনকে। সে উপন্যাস প্রসঙ্গে রবী্নদ্রনাথের পত্রের সারমর্মে এই তাৎপর্যপূর্ণ ইঙ্গিত এ দেশের সকল সাহিত্য আন্দোলনের ক্ষেত্রেই আলোক-সম্পাতী। যে বোহেমিয়ান করতে দেখেছি আমরা বিদেশি সাহিত্যে, এখানে তার উপযুক্ত ভূমি ছিল না। উপন্যাসের পক্ষে যা পরম প্রয়োজনীয় : দেশ-কালের সঙ্গে উপন্যাসের ভাবমণ্ডলের যোগসাধন-কল্লোল-গোষ্ঠির ভেতরে তার পরম অভাব তাঁদের সার্থক উপন্যাস লিখতে দেয় নি।

সতীত্বের আদর্শ, প্রেমের একনিষ্ঠতা ও শুচিতা ইত্যাদি যখন মনস্তাত্ত্বিক বিচারে মূল্যহীন বলে প্রতিপন্ন হলো তখন রক্ষণশীল দলের সাহিত্যিকেরা সাহিত্যে শ্লীলতা-অশ্লীলতার প্রশ্ন তুললেন। শনিবারের চিঠির লেখকগোষ্ঠী এ সম্পর্কে অগ্রণী হলেন। তাঁরা কালি-কলম, প্রগতি, ধুপছায়া, উত্তরা প্রভৃতির লেখগোষ্ঠী ও কল্লোলগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে লাগলেন। তাঁরা কল্লোল সাহিত্যিকে কেন্দ্র করে ব্যাঙ্গাত্মক রচনা প্রকাশ করতে লাগলেন।

শনিবারের চিঠিতে "মণি মুক্তা" ও "সংবাদ সাহিত্য" এই দুটি শাখায় পত্র-পত্রিকার লেখক-লেখিকাদের বিশেষ অংশের মন্তব্যসহ উদ্ধিতি দেওয়া হত। উক্ত শাখার উদ্দেশ্য ছিল লেখক লেখিকাদের রচনাগুলি সমপর্কে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করা ও নিজেদের মতামত ব্যক্ত করা।

এখানে দৃষ্টান্ত হিসাবে উল্লেখ করা যায়, কল্লোলের প্রকাশিত মা দেবীর "চিঠি" অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের "বেদে", প্রবোধকুমার সান্যালের "চব্বিশ ঘন্টা", বুদ্ধদেব বসুর "অভিনয়" প্রভৃতি থেকে শনিবারের চিফিঠর (১৩৩৪-৩৬ পর্যন্ত দ্রষ্টব্য) উক্ত দুটি শাখায় উদ্ধৃতিসহ ব্যাঙ্গাত্মক আলোচনা প্রকাশিত হয়েছে।

এই পত্রিকায় ব্যাঙ্গাত্মক আলোচনার কিছু কিছু নমুনা এখানে প্রদত্ত হলো।

"বেদের" আক্ষাদির কথা প্রথমাংশে উদ্ধৃতি সহকারে মাঝে মাঝে শিরোনামা প্রদত্ত হয়েছে–বালক কিউপিড, পয়সা ও প্রেম, প্রেমের ডিউটি, সর্বনাশা সুখে। তাছাড়া, খেদি ও রহমানের সম্পর্কে হাল ফ্যাশনের রোমানস, মেয়েটিও আচ্ছা বেহায়া, মিছরীর ছুরী, রহমান কি মেরি জান ইত্যাদি।

বুদ্ধদেব বসুর "অভিনয়" গল্প সম্পর্কে ব্যাঙ্গাত্মক আলোচনা থেকে এখানে উদ্ধৃত করা হল।

"এই সংখ্যার কল্লোলে শ্রীমান বুদ্ধদেব বসুর "একটা বেশ গোলমাল পুরুষ্টু (পাঁঠার মত) গল্প" বাহির হইয়াছে। গল্পের নায়ক প্রতুলের "বাছুরে প্রেমের বয়স উৎরে "নাকি" আত্মস্ততা ফিরে এসেছে", তাই সে একদিন তার বাল্যের সখী ও অধুনা বরিশালের কোন বেকুবের পত্নী বিনোদিনীর (সংক্ষেপে বিনু-র) সঙ্গে প্রেমলীলা করিয়া æThat chap" হাবাগোবা গোছের ভালমানুষকে" কিরূপ আরও ভালমানুষ বানাইয়াছিল তাহারই সরস কাহিনী সালঙ্কার "কথা সাহিত্য পিপাসু" বন্ধুদের নিকট বিধৃত করিতেছে।"'

গল্পটিকে মন্তব্যসহ এক একটা পর্যায়ে সাজান হয়েছে। যেমন এই আবিষ্কারের দুই বৎসর পরে, এইরূপ একটি নির্জন, নীরব গরম দুপুর বেলায় ইত্যাদি।

কল্লোলের প্রকাশিত গল্প ও উপন্যাস সম্পর্কে শনিবারের চিঠিতে অনুরূপভাবে ব্যাঙ্গ-বিদ্রুপ করা হত এবং তাতে কল্লোলালগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে শনিবারের চিঠির লেখগোষ্টীর উষ্মা ও রক্ষণশীল মনোভাব প্রকাশ পেত।

কল্লোলগোষ্ঠীর যৌন প্রবৃত্তি বিষয়ক রচনাগুলি সম্পর্কে শনিবারের চিঠির লেখকগোষ্ঠী অতিমাত্রায় সচেতন হয়ে উঠেছিলেন এবং প্রধানত: সেইগুলি সম্পর্কে তাঁরা ব্যঙ্গ বিদ্রুপ করে প্রতিবাদ করতে লাগলেন। দৃষ্টান্ত হিসাবে বুদ্ধদেব বসু ও মনীশ ঘটকের গল্পগুলির এবঙ বুদ্ধদেব বসুর "বন্দীর বন্দনা" কবিতার এবং কালি কলমে প্রকাশিত নজরুলের "মাধবী প্রলাপ" ও "অনামিকা" কবিতার যৌনতা প্রকাশের বিরুদ্ধে তারা অশ্লীলতার অভিযোগ আনয়ন করেন এবং এ ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের শরণাপন্ন হন উভয় দলের বিরোধ মিটমাট করবার জন্য।

সজনিকান্ত দাশ শনিবারের চিঠির লেখকগোষ্ঠীর প্রতিনিধি হয়ে কল্লোলগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে লেগেছিলেন এবং তিনিই রবীন্দ্রনাথ থেকে চিঠি লিখে উভয় দলের বিরোধ মীমাংসার জন্য তাঁকে আমন্ত্রণ জানান। কিন্তু কোন দলই বিচারে সন্তুষ্ট হন নি।

কল্লোলের লেককগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সজনীকান্ত দাশ ও তাঁর দল বিরোধিতা করলেও কল্লোলে তার কোন প্রতিবাদ সোচ্চার হয় নাই।

এই উভয় দলের বিরোধের কারণ উভয় দলের রক্ষণশীল ও প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গি। তাই দেখা যায়, কল্লোলগোষ্ঠীর যখন যৌনতত্ত্ব বিষয়কে খোলা-খুলিভাবে মনস্তত্ত্বের আলোকে প্রকাশ

করতে চেয়েছেন, তখন সজনীকান্ত দাশ ও শনিবারের চিঠির লেখকরো রক্ষণশীল শিবিরে বসে তাঁদের বিরুদ্ধে অশ্লীলতার অভিযোগ করেছেন।

উপর্যুপরি আলোচনা ও পর্যালোচনা শেষে আমরা দেখতে পাচ্ছি কল্লোল পত্রিকাকে কেন্দ্র করে একদল শিক্ষিত বাঙ্গালি বাংলা সাহিত্যে নতুন কাব্য ধারা বা হাসিত্যধারা গড়ে তোলায় প্রচেষ্টায় অব্যাহত ছিল। নতুন পথ নির্মানে তাদের এ ভূমিকা সার্থকতা বা বিরুদ্ধতা কতটা হয়েছিল তা কিন্তু সাহিত্যের ইতিহাস ধারণ করে আছে। সমাজ বাস্তবতার দিক থেকে কল্লোলের ভূমিকা নিয়ে নেতিবাচক সুর উঠলেও তাকে অস্বীকার করা যাবে না। একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

Z_¨mÎ:

১. অচিন্ড্যকুমার সেনগুপ্ত, কলেণ্ঢাল যুগ, কলিকাতা, ১৩৫৭, পৃ. ৭
২. জীবেন্দ্র সিংহ রায়, কলেণ্ঢালের কাল, কলকাতা, ২০০৮, পৃ. ৩৮
৩. অচিন্ড্যকুমার সেনগুপ্ত, কলেণ্ঢাল যুগ, কলিকাতা, পৃ: ১০৮
৪. প্রাগুক্ত, পৃ:৪৮
৫. প্রগুক্ত, পৃ. ১৪৮
৬. প্রবাসী, ১৩৩৪, অগ্রহায়ণ
৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৮

খ) প্রগতি, কালি-কলম প্রভৃতি কল্লোলের সহযোগী পত্রিকাসমূহের ভূমিকা

বাংলা সাহিত্যের বিস্তৃতির সাথে বাংলা সাময়িক পত্রের ঘনিষ্ট যোগ আছে। ১৮১৮ সালে প্রথম বাংলা সাময়িকপত্র প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে ভাষা ও সাহিত্য দ্রুত উন্নতির পথে অগ্রসর হয়েছে। কোন কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের চেষ্টায় সাময়িকপত্রের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের সাহিত্য, সমাজ ও রাষ্টে নব চেতনার জাগরণ এসেছে, তার একটি নির্ভরযোগ্য ইতিহাসের প্রয়োজনীয়তা আস্বীকার করবার উপায় নেই। বজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তার বাংলা সাময়িক পত্র ১২২৫ইং ১৮১৮-১২৭৪, ইং ১৮৬৮ নিবেদন অংশে এমতের সাথে মতানৈক্য আমাদের নেই। কেননা সচেতন পাঠকমাত্রই অবম্যই অবগত সাময়িকপত্র দৈনিক, মাসিক, সাপ্তাহিক পত্রিকাদিতে দেশ কাল মানুষ ও তাদের আবর্তিত চিন্তাধারার স্রোত কেমন নানা মাত্রায় প্রতিফলিত হয়ে থাকে। বলা বাহুল্য, এই বিবেচনায় রয়েছে মুদ্রন মাধ্যমের বিশেষ ডকুমেন্টশনের ভূমিকা। একই সাথে গুরুত্বপূর্ণ কথা আরো রয়ে যায় প্রধানত তা হচ্ছে ঐ প্রয়াসেরই ফলস্বরূপ বিশেষ বিশেষ এলাকায় ক্রমে জনমত ভাবনা বলয় সংগঠিত দানা বেধে ওঠে; এবং মানুষের ইতিবাচক স্বার্থে প্রয়োজনে তা অব্যর্থ হাতিয়ারের কাজ করে। এই কর্মকান্ডে দেশে বিশেস নজিরের অভাব নাই। বাইরের কথা বাদ দিলে, আমাদের আপনা পূর্ব প্রজন্ম এবং সমকালে আমরা স্বয়ং সেই অভিজ্ঞাতার সারৎসার সাক্ষ্য বহন করি।

কল্লোল মাসিক পত্রিকাটির অবদান নিয়ে তুমুল বাদ-বিাদ রয়েছে। তবে কল্লোলের সামগ্রিক কর্মকাণ্ডে অবশ্যই লোকপ্রিয়তার আমেজ দুলক্ষ্যনয়। কল্লোল পত্রিকার সাত বছরের জীবনপর্বে সাহিত্য পত্রিকা প্রগতি প্রথম প্রকাশিত হয়। আষাঢ় ১৩৩৪ (জুন জুলাই ১৯২৭)। হাতে লিখিত পত্রিকাটির সম্পাদক ছিল বুদ্ধবেত বসু ও কবি অজিত কুমার দত্ত। কল্লোল পত্রিকার মতই একটি ভিন্নধর্মী সাহিত্য পত্রিকা ছিল প্রগতি। প্রগতি বিদ্রোহের সাহিত্যই রচনা করেছিল। প্রথম সংখ্যার সম্পাদকীয়তেই জানানো হয়েছিল্ এই বিদ্রোহকে সহস্রের নিষ্পেষনের নাগপাশ থেকে ব্যক্তির মুক্তির এই প্রচেষ্টাকে আমরা গ্রহন করেছি। তাই আমাদের মুখপত্রের নাম প্রগতি ক্ষনস্থায়ী হলেও বিদ্রোহের এই রুপায়নে আধুনিকতাবাদী বাংলা সাহিত্য আন্দোলনের নেতৃত্বে কল্লোলের সামান্তরাল প্রগুতির ভূমিকাও কম গুরুত্বের ছিল না।

সাহিত্যিক ও সাহিত্যরসিকদের মাসিকপত্র প্রগতির কার্যালয় ছিল ৪৭, পুরানা পল্টন, ঢাকা। হাতে লিখিত পত্রিকাই প্রথম প্রগ্রতি প্রকাশিত হয়। ১৯২৭ সালে আই.এ পরীক্ষায় বোর্ড ষ্ট্যান্ড করে ২য় স্থান অধিকার করে মাসিক বিশ টাকার মেধাবৃত্তি পাওয়া ও বন্ধুদের আর্থিক প্রনোদনায় হাতে লেখা পত্রিকার অকেলন্য থেকে সরে এসে একসময় প্রগতি মুদ্রাযন্ত্র নি:সৃত হয়ে বের হয়। প্রগতি বচর তিনেক টিকে ছিল অনিয়মিতভাবে, তবে শুধু প্রথম বছরটি নিয়মিতই বেরিয়েছে। লেখক তালিকায়

দুই সম্পাদক তো ছিলেনই, তাদের জন্যই কাগজ, ছাড়া ছিলেন, কাজী নজরুল ইসলাম, জীবনানন্দ দাশ, জসীমউদ্‌দীন, জগদীশ গুপ্ত, মোহিতলাল মুজুমদার মনীশ ঘটক, মৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র বাগচী এবং একেবারে বিষ্ণু দে প্রমুখ। সাহিত্য জগতে আজ অপরিচিত অথচ বুদ্ধদেব বসুর ঢাকার বন্ধু প্রভুচরণ গুহ ঠাকুর তাও ছিলেন একজন নিয়মিত লেখক। প্রগতি অবশ্যই বাংলা সাহিত্যে নতুন কিছু উপহার দিতে চেয়েছে। এর প্রথম সংখ্যাতে প্রকাশিত প্রথম উপন্যাস 'চৌরঙ্গী'র যৌথ লেখক ছিলেন তিন বন্ধু বুদ্ধদেব, প্রভুচরণ গুহ ঠাকুরতা ও শচীন্দ্রনাথ কর্ বন্ধুরা মিলে এজমালি উপন্যাস লেখার ধারনাটি বুন্ধুদেব বসুরই ছিল। অধিকাংশ তিনিই লিখেছেন বলে এটি তার রচনাবলিতে স্থান পেয়েছে।

১৯২৭ সালের জুলাই মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি বিভাগে ভর্তি হলে আরোও একটি পত্রিকা সম্পাদনার শুরু দায়িত্ব অর্পিত হয় জগন্নাথ হল ছাত্র সংসদের সাহিত্য সম্পাদক হিসেবে হল বার্ষিকী বাসন্তিকা সম্পদানার দায়িত্ব বর্তায়। বুদ্ধদেবের প্রগতির দলে আরও ছিলেন পুরানা পল্টনের মতুন প্রতিবেশী পরিমল রায়, কিংবা আর্মানিটোলার অমলেন্দু বসু, বিদেশ প্রত্যাগত প্রভুচরন গুহ ঠাকুরতার কথা পূর্বেই উল্লিখিত। সমানধর্মা এই প্রগতি-র দলের তর্কালোচনামুখর সাহিত্যালাপে ক্রমে আরো এলেন মনীষ ঘটকের ভাই সুধীশ ঘটক, অনিল ভট্টাচার্য আর ভৃগু গৃহঠাকুরতা। বৃদ্ধদেব বসুর আহবানে সুদূর কলকাতা হলে প্রগতি কার্যালয়ে এসেছিলেন, অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত ও পত্রিকার লেখক কাজী নজরুল ইসলাম ও অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত বাদে বাকী সকলেই ছিলেন আসন্ন অত্যাসন্ন উপক্রমনিক, বৃহত্তর পাঠক সমাজের সঙ্গে তাদের অপরিচয়ের ব্যবধান তখনো ভেঙ্গে যায় নি। প্রগতিতে শুধু প্রকাশ নয়, নতুন সাহিত্য প্রচার করার দিকে লক্ষ ছিল আমাদের। তার জন্য মনের মধ্যেই তাগিদ ছিল, বাইরে থেকেও উত্তেজনার অভাব ছিল না। দেশের মধ্যে উগ্র হয়ে উঠেছিল সংঘবদ্ধ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ অপরিমিত অনবরত বিরুদ্ধতা। যারা যুদ্ধ ঘোষণা করলেন তারা কেউ সাহিত্যের মহাজনি কারবারি কেউ বা তাদের আশ্রিত, কেউ মহিলা, কেউ বড়ো ঘরের ছেলে, কেউ নামজাদা সম্পাদক অথবা লন্ডনে পাশ করা প্রফেসর আবার কেউ বা ফরাসি জার্মান আর এক লাইন রাশিয়ান জানেন। অর্থাৎ প্রগতি পত্রিকায় প্রকাশিত সাহিত্যকর্মগুলো তৎকালীণ সমাজ মোটামুটি একটা চাঞ্চল্যও তুলেছিল। বস্তুত তরুন বয়স থেকেই প্রতিশ্রুতিশীল লেকখদের বিশেষ করে তরুন ও নবাগত লেখকদের একজন বড় পৃষ্ঠপোষক ছিলেন বুদ্ধদেব। সমসাময়িক ও বয়স্য বহু লেখকের প্রতিষ্ঠার পেছনে তার ভূমিকা অসামান্য। কলকাতার সচ্চল ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান বিষ্ণু দের পৃষ্ঠপোষকতার অভাব হতো না, পরে এক সময় পরিচয়... একজন, কিন্তু তাকেও আত্মপ্রকাশের মুহূর্তে যখন তিনি সম্পূর্ণ অপরিচিত বুদ্ধদেবই সবচেয়ে বেশি উৎসাহ দেন। উত্তরা বসু যিনি সাহিত্যক

বিষ্ণুদের কন্যা; স্মৃতি চারনায় লিখেন (১৯২৮-১৯২৭) সালে ঢাকা থেকে বুদ্ধদেব বসু যে প্রগতি পত্রিকা বের করেন তাতে কয়েকটি গল্প ছাপিয়েই বাবার প্রথম বাংলা সাহিত্য জগতে প্রবেশ ঘটে।

বাংলা সাহিত্যের অন্যতম প্রভাববিস্তারকারী কল্লোল পত্রিকা দ্বারা অনুপ্রাণিত ও প্রভাবিত হয়ে অনেকটা কল্লোল এর ঢাকা সংস্করন প্রকাশিত হয় প্রগতি। কল্লোলের নীতি আদর্শই ছিল প্রগতির এবং ওই পত্রিকার লেখকরাই অনেকে প্রগতিতেও লিখতেন। বুদ্ধদেব বসুর ভাষায় 'প্রগ্রতি পত্রিকাটিকে কল্লোলেরই একটি টুকরো বলা যায়, এ দুয়ের মধ্যে সংখ্যা ও বিনিময় ছিল নিবিড়।'

প্রগতির সার্থকতা বিষয়ে বুদ্ধদেবের আরও দাবি ছিল যে, সেই দূরের সময়ে, যখন গন্ডার কবিকে নিয়ে রোল উঠেছিলো অট্টহাসির অন্য কোথাও সমর্থনসূচক পায়াস ছিলো না, তখন সেই ক্ষুদ্র মঞ্চটিতেই প্রথম সংবর্ধিত হন জীবননান্দ-প্রকাশ্যে, একক কণ্ঠে সোচ্চার ঘোষণায়। প্রগতির প্রথম বর্ষের দ্বিতীয় সংখ্যাতেই প্রকাশিত হয়েছিল জীবননন্দর কবিতা খুশরোজি। প্রথম থেকেই তার কবিতা ভালো লাগত প্রগতি সম্পাদকের। কবি পলাতক পরবাসী, পিপাসার গান, ১৩৩৩ সহজ, পরস্পর, জীবন স্বপ্নের হাতি ছাড়া প্রগতি তেই প্রকাশিত হয়েছিল জীবননান্দের দুটি বিখ্যাত কবিতা বোধ ও অবসরের গান।

বিষ্ণুদে প্রগতি গোষ্ঠীর অন্যতম লেখক হলেও প্রথম বর্ষে তার লেখা গল্প প্রকাশিত হয়েছিল প্রগতি তে তৃতীয় বর্ষের প্রথম সংখ্যায় গল্পের সঙ্গে সঙ্গে তার বিখ্যাত কবিতা 'ডলু যদি আজ ন্যাকামি করে' প্রকাশিত হয়েছিল।

সম্পাদক বুদ্ধদেবের মানুষ কোন বন্ধুর প্রতি হে বিধাতা আর কিছু নহে প্রভৃতি 'বন্দীর বন্দনা' বিখ্যাত কবিতার অনেকগুলিই প্রগ্রতি তে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল যুগ্ম সম্পাদক অজিকুমার দত্তের জনপ্রিয় কবিতা 'মালতী' এবং প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'কুসুমের মাস' এর অধিকাংশ কবিতাই প্রকাশিত হয়েছিল প্রগতিতে। ঢাকা থেকে প্রকাশিত স্বল্পায়ু প্রগতি বাংলা সাহিত্যে অবশ্যই নতুন চেতনা গঠনে বিশেষ তাৎপর্য ভূমিকা রেখেছিল-এটা অনুস্বীকার্য।

হতাশা ক্ষুধা দারিদ্র্যের এক জগৎ কল্লোল এর মতো প্রগতির ছোট গল্পের বিষয় হয়ে উঠেছিল। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের 'বিবাহের চেয়ে বড়ো' বুদ্বদেবের টান, ঝুট, ছায়াচিত্র, পদ্মার ঢেউ প্রভৃতি গল্প প্রকাশিত হয়েছিল প্রগতির প্রথম বর্ষেই।

সাহিত্যক আদর্শ কল্লোল এর অনুরূপ হলেও কল্লোল ও যা কখনো উল্লেখ্যভাবে স্থায় পায়নি, প্রগতির পাতা জুড়ে থাকত সেই আলোচনা সমকালীন সাহিত্যিক বাদানুবাদ। মাসিকী শীর্ষক এই বিভাগটিতে বহু রচনাই অস্বাক্ষরিত কিন্তু এই বিভাগের জন্য অন্যদের লেখা দুস্প্রাপ্য বলে বুদ্ধদেব প্রতি মাসে প্রায় পুরোটাই সাগ্রহে ও উত্তেজিতভাবে লিখেছেন। অতি আধুনিকদের পক্ষ সমর্থনে যুক্তিগ্রাহ্যভাবে

অভিযোগের উত্তর রচনা করেছেন। প্রতি সংখ্যার এই মাসিকীর আলোচনা থেকে তরুণ বুদ্ধদেব সাহিত্যবিচার শৈলীকেও চিনে নেওয়া যায়।

শুধু মাসিকী নয় প্রগতি তে প্রকাশিত বুদ্ধদেবের রচিত প্রবন্ধগুলোর বিষয়ে আঙ্গিকরীতি থেকেও অনুমান করা চলে, সেই সময়ে কোন সাহিত্যকের সৃষ্টি ছেয়ে আছে তার মনে আকাশ, কার সঙ্গে তার মনের সুর মিলেছিল। এই সময়েই বদ্বদেব কল্লোল এ কবি সুকুমার রায় বিষয়ে প্রবন্ধ রচনা করেছেন (চৈত্র ১৩৩২) 'রজনী হলো উতলা' গল্পের আগেই এই প্রবন্ধে কল্লোল এ তার প্রথম আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল প্রেমান্দ মিত্রের মতে যে প্রবন্ধটি সুকুমার রায়কে আনাদর অবহেলার চোরকুঠুরি থেকে উদ্ধার করে তাকে যথোচিত মর্যাদায় সাহিত্য প্রতিষ্ঠা করার ব্যাপারে পথ দেখিয়েছিল।

বিদেশি সাহিত্যের প্রতি আগ্রহ প্রগতির একটি লক্ষণীয় চরিত্রবৈশিষ্ট্য ছিল। বাংলা সাহিত্যর গন্ডিতে সীমায়িত না থেকে বিশ্ব সাহিত্যর সঙ্গে মানসিক যোগ স্থাপন ছিল তাদের উদ্দেশ্য। প্রথম সংখ্যাতেই লুইজী পিরানদোল্লো বিষয়ে প্রবন্ধ লিখেছিলেন প্রভুচরন গুহঠাকুরতা, তিনিই পরবর্তী নানা সংখ্যায় বিশ্ব সাহিত্যর নানা প্রসঙ্গ নিয়ে প্রবন্ধ রচনা করেছেন শ্যন কেইসী প্রভূতি।

প্রগতি পর্বে বুদ্ধদেবের জীবন ভরে উঠেছিল অপরিসীম বিস্তারে রাত জেগে প্রগতির প্রুফ দেখায়, প্রগতির পাতা ভরারার জন্য কপি তৈরী করায়, আরও নানা লেখায় পড়ায়। প্রগতি সম্পাদনার উত্তেজনার পাশাপাশি নিজের সাহিত্যক উত্তারাধিকারকেও ঋণ করে চলেছেন বুদ্ধদেব।

আর এই সময়ে নিবড় হয়ে উঠেছে কল্লোল এর সঙ্গে তার যোগাযোগ, বন্ধুত্ব গভীর হয়ে চলেছে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, বিষ্ণু দে, প্রেমেন্দ মিত্র র সঙ্গে, বা আলাপ ঘন হচ্ছে কল্লোল গোষ্ঠীর কর্ণধার দীনেশরঞ্জন বা শিবরাম, মনীষ ঘটক, প্রবোধ সান্যাল, পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, নৃপেন্দ্রকৃষর সঙ্গে কলকাতায় বছওরে দু তিন বার তার আনো গোনা শুরু হয়েছে, আর ঢাকায় তো ছিলই প্রগ্রতির দল, ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনন ঋণ পরিবেশ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ভরতি হবার মাস দুয়েক পরেই বুদ্ধদেব ছাত্র সংসদে সাহিত্য বিভাগের সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছিলেন। দায়িত্ব নেওয়ার পর, কমিটি সাবকমিটি কন্সটিটিউশন, আইনের তর্ক এসব যথাসম্ভব এড়িয়ে তিনি জগন্নাথ হল এর বার্ষিক পত্রিকা বাসন্তিকা কিছুটা শ্রীবৃদ্ধি করেছিলেন।

১৯৩০ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জগন্নাথ হলে অধ্যাপক রমেশ চন্দ্র মজুমদারের অনুমোদনে অভিনীত হয়েছিল বুদ্ধদেব রচিত প্রথম একাংক নাটক একটি মেয়ের জন্য। ইচ্ছা পুরণকারী নাটকটির বিষয় ছিল একটি মেয়ের সপ্রেমিক পিতৃগৃহ ত্যাগ। সেই দিনেই, যখন তাকে চিরাচরিত প্রথায় কনে দেখবার আয়োজন চলছিল তার বাড়িতে। বুদ্ধদেবের স্মৃতিচারণ অনুযায়ী পুরানা পল্টনে এক সদ্যযৌবনা প্রতিবেশীনি সম্পর্কে মাত্রাস্পর্শহীন প্রণয়ের বেদনাই এ নাটকের উৎস।

এ সবের মধ্যেই বহুবার উঠে যাবার আশাখা তৈরী করে, অনিয়মিতভাবে আবারও প্রকাশিত হয়ে শেষ পর্যন্ত ১৯২৯ সালে সত্যিই একেবারেই উঠে গেল প্রগতি। (১৩৩৬ এর কার্তিক সংখ্যাই সম্ভবত প্রগতির শেষ সংখ্যা)

তারুন্যের ধর্ম যে প্রতিবাদী চেতনা তা পুরো মাত্রাই ছিল প্রগতি পত্রিকার। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মত সর্বগ্রাসী প্রতিভাকেও রেহাই দেওয়া হয়নি। তিনিও হয়েছেন সমালোচনার লক্ষ্য বস্তু। যদিও The age of Rabindranath iso ver. সদর্পে বললেও বুদ্ধদেবের নিজেরই স্বীকারোক্তি ঘোষণাকারী এক দম্ভ রবীন্দ্রনাথ বিনা চলে না। (আমাদের কবিতা জ্হান, শারদীর দেশ, ৩৮১) তবে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব নিয়ে প্রশ্ন তোলাও কম বড় ব্যাপার নয়। রবীন্দ্র প্রসঙ্গে বাদানুবাদও হয়েছে প্রগতিতে যেমন

বর্তমান বাংলা সাহিত্য হইতে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব ক্রমশ অপসৃত হইতেছে এই উক্ত সমর্থন করিতে গিয়া লিখিয়াছিরাম যে , যতীন্দ্র মোহনের কবিতা আগাগোড়া রবীন্দ্রনাথের ভাব ভঙ্গি লইয়াই রচিত হইয়াছে বলিয়া তাহা মৌলিকত্ব বর্জিত ও স্বাতন্ত্রহীন হইয়া পড়িয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের দিন একরকম ফুরাইয়া আসিয়াছে, একথা আমি কোখনেই বলি নাই। আমি শুধু লিখিয়াছিলাম যে আধুনিক সাহিত্য রবীন্দ্রনাথের প্রভাব ক্রমশ সরিয়া যাইতেছে।

আধুনিক লেখকদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের অনুকৃতি করিবার স্পৃহা আর তত উগ্র নাই। প্রত্যেক একটি বিশিষ্ট রূপ লইতে প্রত্যাশী, হয়ত এখনো কেহই সম্পূর্ণভাবে স্বতন্ত্র হইয়া উঠেন নাই বরং সেই দিকে একটা চেষ্টা দেখা দিয়াছে, সেই কথা বলাই আমার উদ্দেশ্য ছিল। এবং সেই চেষ্টা যে নিন্দনীয় তাহা আমি বিশ্বাস করি না। বরং আমি ইহা বিশ্বাস করি প্রত্যেক সাহিত্য সৃষ্টির পাশ্চাত্যেই একটি চেষ্টা লুকাইত থাকে। সমস্ত আর্টের মধ্যেই একটি সজ্ঞানতা ও সচেষ্টাতা আছে।

রবীন্দ্রনাথের কাছে ঋণ গ্রহন করিলে কোনো বাঙ্গালি লেখকেরই জাত যাইবে না, তাহা সত্য কথা। কিন্তু ইহার চেয়েও আরও একটা বড় সত্য কথা কি নাই যে, যে কবি খালি রবীন্দ্রনাথের অক্ষম অনুকরণই করিল, নিজে স্বাধীন কিছুই সৃষ্টি করিতে পরিল না। সে অতিশয় দুর্ভাগ্য করি? যে অনুকরণ স্বাধীন ও স্বতস্ফূর্ত সাহিত্য সৃষ্টিতে লেখককে প্ররোচিত করে না, একটা প্রাচীরা বদ্ধ কূপে বন্দি করিয়া রাখে, তাহা রবীন্দ্রনাথেরই হোক বাদ বিদেশীয় সাহিত্যেরই হোক, সমান রূপেই নির্দাহ।

বুদ্ধদেব বসুর নিজের কোন বিখ্যাত রচনা প্রগতিতে প্রকাশিত হয়নি কিন্তু এই ক্ষীনজীবী পত্রিকার সর্ব এ ছড়িয়ে আছে তরুণ সম্পাদকের নতুন দৃষ্টিভঙ্গি পরিচয়। লেখক নির্বাচনে রচনা নির্বাচনে তৎকালীন যারা বাংলা ভাষায় সহিত্য চর্চা করেছেন, তারা প্রায় সবাই রবীন্দ্রনাথের জালে আটকে পড়েছেন। অনেকের মতো ওই জালে আটকে পড়ার ইচ্ছা তার ছিল না, সেজন্য খুজছিলেন অন্য কোন বিকল্প নতুনত্বের প্রায়াসী ছিলেন। নতুন কোন কাব্যাদর্শ খুজে নেয়ার জন্য রবীন্দ্রনাথের বাইরে যারা তাদের

দিকে হাত প্রসারিত করেছিলেন। ভাবসঙ্গীতের দিকে থেকে প্রগতি ছিল কল্লোলের সমগ্রোত্রীয় এ কথা পূর্বাহ্নে উল্লিখিত হয়েছে। এজন্য এ পত্রিকা কেন্দ্রে করে রবীন্দ্র উত্তর কাব্য সাধানার প্রচেষ্টা চলছিল। রবীন্দ্র বলয় অতিক্রম করার জন্য নতুন কাব্যদর্শ অন্বেষণে বিভিন্ন কবি ও সাহিত্যকর্মের নিকট ধারস্থের প্রচেষ্টাও একটি উল্লেখযোগ্য দিক ছিল। রবীন্দ্রনাথের জাল থেকে বেরুবার চেষ্টায় আমরা কোন বিকল্প খুজছি তখন মাতৃভাষায় এমন কোন কাব্যাদর্শ যাতে নতুনদের ইঙ্গিত আছে। কিন্তু সে পথ পেয়েছিলেন।

যুগধর্ম পাশ্চাত্য প্রভাব, প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর আর্থ সামাজিক রাজনৈতিক পরিবর্তন ও ব্যক্তি মনে তার প্রতিক্রিয়া প্রচলিত মূল্যবোদের অবক্ষয় এবং সমসাময়িক অস্থিরতার পরিপ্রেক্ষিতেই আধুনিক সাহিত্যের ভাবগত ও রুপগত রূপান্তর সাধিত হয়। যৌবনের প্রারম্ভ থেকেই প্রগতির কাণ্ডারীগণের প্রথম বিশ্বযুদ্ধোরওর আন্তজার্তিক

নান্দনিক মনস্তত্ত্ব অধিগ্রহনেই সাহিত্যিক মেধা মনন গাতি হয়েছিল।

বুদ্ধদেব বসু প্রগতির ভূমিকা নিয়ে বলেন,

Kwj I Kjg:

কল্লোল, পত্রিকার মতই কালিকলম উদীয়মান তরুণের পত্রিকা বলে স্বীকৃতি লাভ করে। বাংলা ১৩৩৩ সালে কল্লোলগোষ্ঠীর স্থূলসংখ্যক লেখক মিলে 'কালি কলম পত্রিকা প্রকাশ করে। এরও কোন নির্দিষ্ট লক্ষ্য ঘোষিত হয়নি। একই মেজাজের পত্রিকা ছিল 'কালি-কলম'। কল্লোল থেকে বেরিয়ে শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় ও প্রেমেন্দ্র মিত্র কালি কলম বের করলেও কল্লোলের তারা আবার ফিরে গিয়েছেন। নবীন লেখকগণ কল্লোল ছেড়ে যাবার কারণে দু:খ প্রকাশ করে বলেছেন, "সম্প্রতি কোনো কোনো বন্ধু আমাদের ছেড়ে গেছেন। ঘটনাটি দু:খজনক।[১]

কল্লোলে নিজের প্রতিষ্ঠা তেমন না পাওয়া, কোন কোন প্রকাশনার উদ্যোগ, নতুন পত্রিকা সম্পাদনা পদ পাওয়া হত্যা করা কারণ হিসেবে কেউ কেউ উল্লেখ করে থাকেন। এতে কোন বাংলা সাহিত্যের কোন ক্ষতিই হয়নি। কেননা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কালের বাহির থেকে আমদানী করা নতুন মানুষের দেহমনের আরেক চেহারা ফুটিয়ে তোলাই কালি-কলমের কাজ ছিল।

এ্যান্টিক কাগজে ছাপা এবং ডবল ক্রাউন সাইজের কালিকলমের ছাপার মান ভাল ছিল।[২] কল্লোলের মতই পত্রিকা হলেও তাদের কিছু নতুনত্ব ছিল। কালি কলমে "অসতলগ্র, বিচিত্রা, সংগ্রহ, সাহিত্য প্রসঙ্গ ইত্যাদি কল্লোলের মত হলেও বক্তব্য ও উপস্থাপনার রীতির মধ্যে কিছুটা নতুন দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় আছে। কালি-কলম রস রচনা ও ব্যাঙ্গ সাহিত্যের উপর গুরুত্ব দেয়ার কারণে কল্লোল থেকে ভিন্ন ছিল এটিকেটায়। কল্লোলের আড্ডায় মতো কালি কলমেরও আড্ডার খ্যাতি আছে। কালি

কলমের এজেন্সি দোকানে 'কালি-কলমের আড্ডায় উপস্থিত থাকতেন মুরলীধর বসু ও শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, মাঝে মাঝে উপস্থিত থাকতেন তৃতীয় সম্পাদান প্রেমেন্দ্র মিত্র। যাঁরা নিয়মিত আড্ডায় আসতেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন নলিনীকিশোর গুহ, প্রবোধকুমার, সান্যাল, মণীন্দ্রলাল বসু, সত্যেন্দ্রপ্রসাদ বসু, সুবোধ হড়, সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, হেমচন্দ্র বাগচী, প্রমথনাথ বিশী, পাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায় ও শিশ্তিরকুমার নিয়োগ। আড্ডায় কয়েকবার এসেছেন শৈলজানন্দের বন্ধু নজরুল ইসলাম, মোহিতলাল মজুমদার, সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী, সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, মহেনচন্দ্রচন্দ্র রায়, দিলীপকুমার রায়, জগদীশ গুপ্ত, কালিদাস রায়, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ইত্যাদি। সেইসব সান্ধ্য আসরে বেশির ভাগ সময়েই সমসাময়িক সাহিত্যের আলোচনা হত, কল্লোলের প্রসঙ্গ বিস্তারিতভাবে উপস্থাপিত হত, শনিমণ্ডলের বিরোধিতা নিয়ে করা হতো ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ। জীবেন্দ্র সিংহ রায় বলেন:

"দুই আড্ডাতেই গিয়েছেন এমন ব্যক্তির কাছে শুনেছি, কল্লোলের মতো সাহিত্যেক মনের রসায়ন কালি-কলমের আড্ডায় হত না। কালি-কলমের আড্ডা ছিল কল্লোলের তুলনায় জনবিরল ও স্বল্পস্থায়ী। তবু তাতে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের কোনো বাতারণ সৃষ্টি হয়নি, একথা বললে সত্যের আপলাপ করা হবে।"[৩]

কালি-কলমের আড্ডাধারীদের সঙ্গে তার লেখকগোষ্ঠীর কথা আলোচনা করা যেতে পারে। কল্লোালে পুরনো আমলের লেখকদের অল্পস্বল্প লেখা প্রকাশিত হলেও জোরটা ছিল নতুন লেখকদের ওপর। ডাকযোগে অজ্ঞাত ও নতুন লেখকদের যে সমস্ত লেখা পাওয়া যেত, পাঠযোগ্য মনে হলে কল্লোল তা প্রকাশ করত। আনকোরা লেখকদের তরতাজা লেখার মান অনেক সময়েই উৎকৃষ্ট হত না। কিন্তু কালি-কলম অপরিচিত লেখকদের রচনা প্রকাশ করেননি বললেই চলে। পত্রিকাটি মোটামুটি প্রাতিষ্ঠিত লেখকদের কাছে লেখার আমন্ত্রণ পাঠাত। তার লেখকগোষ্টীর মধ্যে এমন অনেক ছিলেন যাঁরা স্বনামধন্য ব্যক্তি। যেমন: রবীন্দ্রনাথ, অরবিন্দ ঘোষ (বীরবল ছদ্মনামেও) মোহিতলাল মজুমদার, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, রাধাকমল মুখোপাধ্যায়, শশাঙ্কমোহন সেন, শান্ত দেবী, সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, অতুলচন্দ্র গুত, কালিদাস রায়, কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, পরশুরাম, নলিনীকিশোর গুহ, প্রিয়ম্বদা, দেবী, মণীন্দ্রলাল বসু, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সরোজকুমারী দেবী, গিরীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, দিলীপকুমার রায়, সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার প্রমুখ। আর নতুন লেককদের মধ্যে ছিলেন অচ্যুত চট্টোপাধ্যায়, পেমেন্দ্র মিত্র (এবং কৃত্তিবাস ভদ্র, প্রেমেন্দ্র মিত্রের ছদ্মনাম), জগদীশ গুপ্ত, জীবনানন্দ দাশ (গুপ্ত), ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, নীলিমা বসু, নৃপেন্দ্রকৃস্ণ চটোপাধ্যায়, প্যারীমোহন সেনগুপ্ত, প্রমথনাথ বিশী,

প্রবোশকুমার সান্যাল,মহেন্দ্রচন্দ্র রায়, মনিবজ্র ভারতী,মুরীধর বসু, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় (এবং লেখরাজ সামন্ত, শৈলজানন্দের ছদ্মনাম), শ্রীকুমার বন্দ্যোফাধ্যায়, সুবোধ রায়, সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, হেমচন্দ্র বাগচী, অখিল নিয়োগী, আনন্দসুন্দর ঠাকুর (প্রবোধ চট্টোপাধ্যায়ের ছদ্মনাম), সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, হুমায়ুন কবি, অন্ন দা শঙ্কর রায়, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রমুখ। লক্ষ্য করার বিষয় নিশ্চয় এই যে, কালি-কলম যদিও নবীন লেখকদের মুখপত্র ছিল এবং পত্রিকাটির সম্পাদনার দায়িত্বও ছিল তিন তরুণের ওপর (অবশ্য মুরলীধর বসু অন্য দুজন অপেক্ষা বয়স্ক ছিলেন), তবু এই পত্রিকায় প্রবীণ ও নবীনের একটা যুক্তিসম্মত সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা দেখা যায়। সেজন্য কালি-কলমে প্রকাশিত লেখাগুলির সামগ্রিক মান কল্লোলে প্রকাশিত লেখাগুলির চেয়ে উন্নততর ছিল। সেইজন্য সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর কালি-কলমের উচ্ছাসিত প্রশংসা করেছেন তাঁর আত্মজীবনীতে, নানা অ্যাকাডেমিক মহলে বক্তৃতা প্রসঙ্গে পত্রিকাটির প্রশাস্তি উচ্চারণ করেছেন শ্রীকুমার বন্দোপাধ্যায়। কালিকলমের লেখার মান সম্পর্কে অল্পদাশংকর রায় বলেন, কল্লোলের ঐ চাহিদামূল্য যদি ও অসাধারণ তবু কালি-কলমের সাহিত্যিক মান অসাদারণ (কল্লোলের কালি, পৃ-১৫২) একটি সুসম্পাদিত পত্রিকা হবার পরও প্রবাসী ও ভারতবর্ষের চাহিদার তুলনায় গ্রাহক কম ছিল্ এরপরও কল্লোলের সাথে পাঠক বিভাজন ছিলই। সর্বোপরি জীবেন্দু সিংহ রায়ের ভাষায় বলা যায়, "অতি আধুনিক সাহিত্যের কিছু পাঠক তৈরি করা তারা সংখ্যায় খুব বেশী ছিল না বলাই বাহুল্য (পৃ:১৪৯)। এই পাঠক ও সংখ্যা র ব্যাপারটি দিয়েও আধুনিক পাঠকদের গ্রহণযোগ্যতার দিকটি নিয়ে ভাবতে পারি।

১৯২০ সালে বিপ্লবী বারীন্দ্রকুমার ঘোষ ও উপেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের চেষ্টায় সাপ্তাহিক 'বিজলী' প্রকাশিত হয়। অগ্নিযুগের বিপ্লবীদের অনেকেই এর সাথে যুক্ত ছিলেন। নলিনীকান্ত সরকার ছিলে বিজলীর সম্পাদক। বিজরীতেই নজরুলের বিখ্যাত বিদ্রোহী কবিতা আত্মপ্রকাশ করে। তরুণ কবিদের কাব্যচর্চায় বিজলী পত্রিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে।

১৯২০ সালেই প্রকাশিত হয় নবযুগ পত্রিকা। সাম্যবাদী মতাদর্শে বিশ্বাসী মুজাফফর আহমদ ও নজরুল ইসলাম এই সান্ধ্য দৈনিকের সম্পাদনা করেন। 'নবযুগে' প্রকাশিত নজরুলের রচনা দেশের জনমানসকে স্বাদেশিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে।

১৯২২ সালে নজরুলে ইসলামের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় 'ধূমকেতু'। রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাণী মাথায় নিয়ে ধূমকেতু আত্মপ্রকাশ করে। ধূমকেতুতেই নজরুলের বিদ্রোহী কবিসত্তার পরিচয়যুক্ত বিখ্যাত কবিতাগুলি প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথ নজরুলের স্বভাব স্পষ্ট বুঝে নিতে পেরেছিলেন এবং নজরুলকে অনুপ্রাণিত করেছিলেন সর্বাগ্রে। নজরুল সুহৃদ মুজফফর আহমদের কথায়–

> "কিন্তু ধূমকেতুর জন্য নজরুল যখন রবীন্দ্রনাথের নিকট হতে বাণী চাইল তখন তিনি তাকে বুঝে ফেলেছিলেন। তিনি বুঝে নিয়েছিলেন যে সে নিজে যে-পথ বেছে নিয়েছে তাকে সেই পথে যেতে দিলেই সে বিকশিত হবে। তাই রবীন্দ্রনাথ যে-বাণী নজরুলকে পাঠিয়েছিলেন সেটা ছিল নজরুলের প্রতি তাঁর রাজনৈতিক আর্শীবাদ।"

১৯২৩ সালে দীনেশরঞ্জন দাশ ও গোকুলচন্দ্র নাগের সম্পাদনায় প্রকাশিত হল কল্লোল পত্রিকা। যুদ্ধোত্তর নতুন যুগ কল্লোল। কল্লোলে লিখেছেন নজরুল ইসলাম, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বিজয়চন্দ্র মজুমদার, সুনীতি দেবী, বনফুল, মণীশ ঘটক, পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব বসু, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, নলিনীকান্ত সরকার, অজিতকুমার দত্ত, যতীন্দ্রমোহন বাগচী, জীবনানন্দ দাশ, হেমেন্দ্রলাল রায়, হুমায়ুন কবির, প্রমুখ। এমনকি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, মোহিতলাল মজুমদার ও রবীন্দ্রনাথের লেখা থেকেও কল্লোল বঞ্চিত হয়নি। বুদ্ধদেব বসু লিখেছেন–

> "বস্তুত, বিশ শতকের তৃতীয দশকে বাংলাদেশের যে-কটি যুবক সাহিত্যক্ষেত্রে খ্যাতি লাভ করেন তাদের সকলেরই প্রথম ও প্রধান অবলম্বন ছিলো কল্লোল, এবং হিসেসে সবুজপত্র ও ভারতীর সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে কল্লোলের নামও স্বরণীয়।"

কল্লোল পত্রিকার লেখকদের কল্লোলগোষ্ঠী ও কল্লোলের সময়কালকে অনেকে 'কল্লোলযুগ' হিসাবে উচ্চারণ করেন। কিন্তু যারা কল্লোলযুগ ও কল্লোলগোষ্ঠী প্রভৃতি উচ্চারণ করেন তারা ভালোভাবে ভেবে দেখলে বুঝতে পারবেন যে কল্লোলগোষ্ঠীর সব কবি একই বুদ্ধি বা চেতনার অন্তর্ভুক্ত নন। বিভিন্ন মত ও পথের কবিরা একত্রে কল্লোলের গতিকে অক্ষুণ্ন রেখেছেন। কল্লোলে যেমন লিখেছেন প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, অজিত দত্ত, জীবনানন্দ দাশ প্রমুখ তরুণ কবি তেমনি লিখেছেন রবী্ন্দ্রনাথ, মোহিতলাল, যতীন্দ্রমোহন বাগচী, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, প্রমুখ কবি। যদি আমরা ১৯২৩-৩০ কল্লোল যুগ বলে মনে করি তাহলে দেখা যাবে নজরুল, মোহিতলাল, পৃথক পথে হাঁটছেন। প্রেমেন্দ্র মিত্রও সম্পূর্ভভাবে রবীন্দ্র বিরোধী কোনোদিনই ছিলেন না। আবার তরুণ বুদ্ধদেব বসুও রবীন্দ্রানুসারী রোমান্টিক কবি। মুখ্যত: কল্লোলোর কোলাহলে অনেকেই এসে গলা মিলিয়ে ছিলেন। যদিও কল্লোলে রবীন্দ্রবিরোধীতার পথ খুজে পেয়েছিলেন তরুণ কবিরা। তিনজন কবি এই সময় বাঙলা কবিতার গতানুগতির পথ থেকে সরে এসে বাঙলা কবিতার নতুন হাওয়া বয়ে নিয়ে এলেন। তারা হলেন মরীচিকার কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, মোহিতলাল মজুমদার ও নজরুল ইসলাম। ভাবের দিক থেকে রবীন্দ্রনাথ প্রতিবাদ কয়েছেন যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত। তাঁর রবীন্দ্রবিরোধী দৃষ্টিকোণ কল্লোলের তরুণ কবিদের রবীন্দ্রবিরোধিতার পথ খুঁজতে যথেষ্ঠ সহায়তা করেছিল। মোহিতলালের দেহবাদী কবি মনোভাব তরুণ কবি সম্প্রদায়ের কাছে স্বতন্ত্র বলে মনে হয়েছিল। দেহসর্বস্ব ভোগবাদ স্বাভাবিক

ভাবেই তরুণ কবিচিত্তকে রবীন্দ্রপ্রভাব মুক্তিতে প্রেরণা সৃষ্টি করেছিল। নজরুল ছিলেন রবীন্দ্রনাথের বলাকা থেকে দীক্ষিত। বলাকতে রবীন্দ্রনাথ যা বলেছেন, যে সামাজিক কুসংস্কার, সংকীর্ণতা, সাম্প্রদায়িকতা ও সামন্ততান্ত্রিকাতা থেকে মুক্ত হবার কথা বলেছেন এবং সংগ্রামে অবতীর্ণ হবার আহ্বান জানিয়েছেন, নজরুল বহুদূর অগ্রসর হয়ে তাকেই বাস্তব রূপ দিয়েছেন। দারিদ্যের অভিঘাত তাঁর নিজের। নজরুলের মধ্যে যেমন রবীন্দ্রপ্রেরণা আছে, তেমনি আছে তাঁর স্বকীয় প্রেরণা। রুশবিপ্লবে শ্রমজীবী জনগনের সংগ্রাম তাঁকে সাম্যবাদী ভাবধারায় উদবোধিত করে। তছাড়া, নিপীড়িত, শোষিত, সর্বহারা মানুষের প্রতি তাঁর সহানুভূতি ছিল যথার্থ আন্তরিক। এই রবীন্দ্রশিষ্য নজরুলের দ্বারা রবীন্দ্রনাথও আলোকিত হয়েছেন। ড: ক্ষুদিরাম দাসের অভিমত–

> "কল্লোল-কালিকলম সংশ্লিষ্ট লেখকরা যেকালে পশ্চিমা মনস্তত্ত্ব ও ভাষাভঙ্গি সহায়ে রবীন্দ্রপন্থা লঙ্ঘনের অনুশীলনে ব্যস্ত ছিলেন, তখন পরোক্ষ নজরুলই রবীন্দ্রনাথকে জনচিত্তে গ্রহণীয় ও বরণীয় করে তুলতে চেয়েছেন। মহাযুদ্ধ পরবর্তী অধ্যায়ে রবীন্দ্রনাথ নজরুলের দ্বারাই স্পষ্টীকৃত হয়ে উঠেছেন।"

১৯২৩ সালে কল্লোল পত্রিকা প্রকামের বছরেই প্রকাশিত হল শ্রমজীবীদের মুখপত্র সংহতি। কল্লোলের বিদ্রোহ ছিল যেমন পুরোনো ভাবধারা, সংকীর্ণতা ও সমাজের বিরুদ্ধে তেমন এর পথ ছিল শ্রমজীবী মানুষের বেদনাকে সংগঠিত করার দিকে। প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন জীতেন্দ্রনাথ গুপ্ত। এই সংহতি প্রসঙ্গে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত বলেছেন–

> "আজকের দিনে অনেকেই হয়ত জানেন না সেই সংহতিই বাঙলাদেশে শ্রমজীবীদের প্রথমমত মুখপত্র ও প্রথমতম মাসিক পত্রিকা। সেই ক্ষীণকায় স্বল্পায়ু কাগজটিই গণজয়যাত্রার প্রথম মালদার। লাঙল, গণবাণী ও গণশক্তি এর এসেছিল অনেক পরে। সংহতিই অগ্রনায়ক।"

কল্লোল যুগের কবিদের মধ্যে কেউ আমেরিকার গণতন্ত্র ও মানবতার কবি ওয়াল্ট হুটম্যানের দ্বারা অনুপ্রোণিত হয়েছিলেন। হুইটম্যান সাধারণ পদানত ও অবজ্ঞাত মানুষের কবি। তাঁর কবিতায় আমরা সেই সব ঘামঝরা মানুষগুলোর দেখা পাই যারা মাটির পৃথিবীর দিকে চোখ মেলে দিনরাত অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলেছে। নতুন দিনের স্বপ্ন নিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে চলেছে দ্রুতপদে। কল্লোল যুগের তরুণ কবিদের মধ্যে হুইটম্যানের এই গণতন্ত্র ও মানবতার দিকটির বাঙলা কবিতায় সচেতনভাবে অঙ্গীকার করার চেষ্টা করেছিলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র ও বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়। হুইটম্যানের কবিতা শ্রমজীবী মানুষের জীবনের বন্দনা গান। সেখানে বাঙালী কবির জীবনবন্দনা হুইটম্যানের মতো তেমন তীব্র নয়। তবে হুইটম্যানের মতো শ্রমিক, মজুর, কামার, কুমোর, ছুতোর, জেলে, মাঝি-মাল্লা প্রভৃতি

সাদারণ মানুষের প্রতি আন্তরিকতায় কল্লোলের প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিতাও বিশিষ্ট। কল্লোলের তরুণ কবিদের উপর হুইটম্যানের প্রভাবের কথায় ড: নরেশ গুহ বলেছেন–

> "আসলে হুইটম্যানকে আবিষ্কারের স্পষ্ট উৎসাহ নিয়ে বালা কবিতায় প্রথম প্রবেশ করেছিলেন কল্লোল যুগের কবিরা, বিশেষ করে প্রেমেন্দ্র মিত্র। কিন্তু যুরোপীয় ট্রাডিশান ভাঙার যে বলিষ্ঠ প্রেরণা থেকে æSong of Myself" –এরমত কবিতার জন্ম হয়, বাংলাদেশের নিস্তেজ পরিবেশে সে প্রেরণা কোথাও ছিলো না।"

১৯২৫ সালের ডিসেম্বর মাসে আত্মপ্রকাশ করে লাঙল পত্রিকা। পত্রিকাটির প্রধান পরিচালক ছিলেন কাজী নজরুল ইসলাম। এই লাঙল পত্রিকার প্রথম সংখ্যাতেই নজরুলের সাম্যবাদী কবিতা প্রকাশিত হয়। কৃষকের গান, সব্যসাচী, লাঙলেই আত্মপ্রকাশ করে। ১৯২৬ সালে লাঙল নাম পরিবর্তন করে মুজাফফর আহমেদের সম্পাদনায় ও নজরুলের সহ-সম্পাদনায় গণবাণী নামে প্রকাশিত হয়। গণবাণীর পাতাতেই ছাপা হয় শ্রমিকশ্রেণীর আন্তর্জাতিক সংগীতের নজরুলকৃত অনুবাদ। বিখ্যাত কান্ডারী হুঁসিয়ার কবিতা গণবাণীতেই প্রকাশিত হয়েছিল। গণবাণীই সেদিন দেশে সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শ প্রচারে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল্ এ বিষয়ে ড: সুমিতা চক্রবর্তী মনে করেন–

> "কিন্তু সমাজতন্ত্রবাদ তত্ত্বটির সম্পর্ক সচেতন থেকে সাহিত্য সৃষ্টি প্রয়াস সংহতি লাল ও গণবাণীর অত্যন্ত সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রের বাইরে আর বিশেষ ছিলো বলে মনে হয় না।"

১৯২৬ সালে মরলীধর বসু, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় ও প্রেমেন্দ্র মিত্রের সম্পাদনায় প্রকাশিত হল কালি-কলম। কল্লোল গোষ্ঠীরই কয়েকজন মিলে কালি কলম বের করেন। তবে বিশেষ কোনো মতবাদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে কালিকলমের জন্ম হয়নি। কল্লোলে বই প্রতিধ্বনি হয়ে কালি কলম বাঙলা সাহিত্যে আত্মপ্রকাশ করেছিল। কল্লোল গোষ্টীর তরুণ কবিদের মতো প্রাণশক্তি ও যুগ চেতনা কালি-কলমের কবিদের মধ্যেও ছিল। নবীন ও প্রবীনের রচনায় সমৃদ্ধ হয়ে কালিকলম প্রকাশিত হয়। কালি-কলমে লিখেছেন রবীন্দ্রনাথ, অতুলপ্রসাদ সেন, নজরুল ইসলাম, কালিদাস রায়, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, মোহিতলাল মজুমদার, শশাঙ্কমোহন সেন, হেমচন্দ্র বাগচী, সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, জীবনানন্দ দাশ, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত প্রমুখ। কল্লোল পরবর্তী বাংলা কবিতার অগ্রগতিতে কালি কলম একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিল।

কালি-কলমের অল্প পরেই ১৯২৭ সালে ঢাকা থেকে তরুণ বুদ্ধদেব বসু ও অজিতকুমার দত্তের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় প্রগতি। জীবনানন্দ দাশ ও বিষ্ণুদের মতো কবিদের কবিতা প্রগতিই বাঙালী কবিতা অনুরাগীদের কাছে পৌছে দেয়। জীবনানন্দ ১৩৩৩, স্বপ্নের হাতে, কবিতা প্রগতিই বের হয়। ভাবাদর্শের দিক দিয়ে প্রগতি, কল্লোলের মতোই সমমনোবাবপন্ন। কাজী নজরুল ইসলাম,

মোহিতলাল, প্রিয়ম্বদা দেবী, জসীমউদ্দীন, মণীশ ঘটক, বুদধদেব বসু, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত প্রমুখের কবিতা প্রগতিকে সমৃদ্ধ করেছিল। প্রগতিই সেদিন জীবনানন্দ দাশকে অনেকখানি স্পষ্টতর করেছিল। নজরুলেল বিদ্রোহী কণ্ঠস্বর, সাম্যবাদী কবিমনোভাব ও মানবতার আদর্শ কল্লোল, কালি-কলম, প্রগতিতেই উচ্চকিত হয়ে উঠে।

প্রগতি প্রকাশের বছরেই কলকাতা থেকে জন্ম নেয় ধূপছায়া। ধূপছায়ার সম্পাদক ছিলেন রেণুভূষণ গঙ্গোপাধ্যায়। ধূপছায়া দীর্ঘজীবন লাভ করেনি। প্রগতির মতো ধূপছায়া ও ছিল প্রগতিবাদী পত্রিকা। শনিবারের চিঠির আঘাতও তাকে সহ্য করতে হয়েছে। ধূপছায়ায় কবিতা লিখেছেন হুমায়ুন কবির, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, অজিতকুমার দত্ত প্রমুখ কবি। ডা: জীবেন্দ্র সিংহরায় ধূপছায়া প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন–

> "তবু ধূপছায়াকে যে অতি আধুনিক সাহিত্যে ইতিহাসে স্থান দেওয়া হয়, তার কারণ পত্রিকাটি কখনও সাহিত্য শাসকদের স্তবকতা করেনি এবং যতটা পেরেছে নতুন সাহিত্যেরই পোষকতা করেছে।"[১৭]

একালের তরুণ কবিরা রবীন্দ্রপ্রভাব অতিক্রমণের চেষ্টা করতে গিয়ে দেখেছিলেন তাঁদের চারদিকেই রবীন্দ্রনাথের উপস্থিতি। তাঁরা উৎসাহিতও হয়েছিলেন পরিচিত রবীন্দ্রপথ ছেড়ে ভিন্ন পথের সন্ধানে। তাঁরা এটাও বুঝেছিলেন রবীন্দ্রনাথকে অস্বীকর করা অসম্ভব। কারণ, গতিধর্মী রবীন্দ্র কবিস্বভাব নিসর্গ থেকে মানুষের দ্বারা দ্রুত ধাবমান। রবীন্দ্রনাথ বিতর্কিত হয়ে চলেছেন আধুনিক তরুণ কবিদের অগোচরে। তিনি আধুনিকদের থেকেও আরো প্রগতিশীল, আরো আধুনিক। এমনকি ১৯২৩-২৪ এর পর থেকে আধুনিকতম। বিশ শতকের প্রথম দিকে রবীন্দ্রশিষ্য সত্যেন্দ্রনাথের মধ্যে এই প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা গেলেও এই রবীন্দ্রানুজের মধ্যেও রবীন্দ্রানুসৃতি স্পষ্ট। তবে কবিস্বভাবের স্বকীয়তায় এই কবিঅনুজ স্বতন্ত্র। এমনকি বিশিষ্টও। রবীন্দ্র প্রেরণা স্বীকার করা যায়, কিন্তু প্রভাব স্বীকার করা যায় না। তবে রবীন্দ্র সমকালীন কবিকৃতিতে রবীন্দ্র প্রেরণা যথেষ্ট ছিল। কবিতার বিষয়বস্তু নির্বাচনে ও কাব্যরীতিতে তিরিশের কবিদের মধ্যে স্বতন্ত্রতাও ছিল। এ কারণে যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, মোহিতলাল মজুমদার, নজরুল ইসলামের স্বতন্ত্র কবি মনোভাব তরুণ কবিদের আকর্ষণ করেছিল। এমনকি তারা বিদেশী কবিকূলের কবিকৃতিতে ও সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেনও। কিন্তু তারা দেখেছিলেন– সম্মুখে রবীন্দ্রকাব্যের অনপনেয় ছায়ায় তাদের স্বাবলম্বনের বিবরণ চলছে।'

তিরিশের দশকে কল্লোল, প্রগতির কবিদের মধ্যে রবীন্দ্রবিরোধিতার দিকটি সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। তাঁদের কবিভাবনায় সমাজ-মানুষের দিকটিও প্রবল হয়ে উঠে। যুদ্ধোত্তর সমাজ-জীবনের ধূসর ছায়া তাদের কবিকৃতিতে এসে পড়ে। আবার সেই সঙ্গে সমাজ সচেতন কবিতার পাশাপাশি ভাবাবেগ সৃষ্ট

রোমান্টিক কবিতা বাঙলা কবিতায় চোখে পড়ে। যুদ্ধোত্তর বাঙলা কবিতায় এই দুই ধারাই আগাগোড়া চলমান।

সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শে বিশ্বাসী লেখকদের প্রধান মুখপত্র রূপে পরিচয় পত্রিকা আত্মপ্রকাশ করে ১৯৩১ সালে। সম্পাদক ছিলেন কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে মার্কসবাদের প্রসার ও শ্রমিক-কৃষক-শ্রমজীবী মানুষের শোষণ মুক্তির সংগ্রাম বাঙালি কবিকেও মার্কসবাদী সমাজ ভাবনায় অনুপ্রাণিত করে। বাঙালি কবির মননে মার্কসাবদ একটি বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে। দেশের সাম্রাজ্যবাদী শোষণ ও দেশবাসীর দৈন্যদশা সম্পর্কে তারা যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। স্বভাবত: গণমুক্তি চেতনা পালন করে। পরিচয়ে রবীন্দ্রনাথের রচনাও প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাতের জন্মদিনে কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের পর পরিচয় পত্রিকা তাকে বাঙলা দেশের প্রবীণতম ও কনিষ্ঠতম কবি হিসাবে স্বীকৃতি জানায়। পরিচয়ের কাছে জন্মদিনে ছিল আধুনিকতম কাব্যগ্রন্থ। পরিচয়ে লিখেছেন–নীরেন্দ্রনাথ রায়, ধুজটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, হিরণকুমার সান্যাল, হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। পরিচয় পত্রিকা প্রকাশের স্বল্পকাল আগে রাশিয়ায় গিয়ে রবীন্দ্রনাথের সমাজতান্ত্রিক সমাজ সম্পর্কে প্রত্যক্ষ ধারণাও হয়েছিল। রাশিয়ার চিঠিতে তার দৃষ্টান্ত উজ্জ্বল হয়ে আছে।

পরিচয়ের সমসাময়িক কালে প্রকাশিত হয় সঞ্জয় ভট্টাচার্য সম্পাদতি পূর্বাশা (১৯৩৮) পত্রিকা। পূর্বাশা কোনো মতবাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়নি। কল্লোল পত্রিকার মতোই বিভিন্ন মতের কবিতা এতে প্রকাশিত হয়। পূর্বাশায় রবীন্দ্রনাথকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল।

বিশ শতকের তৃতীয়, চতুর্থ দশক অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। দেশে একদিকে সাম্রাজ্যবাদী শোষণ অপরদিকে সমাজতান্ত্রিক সমাজ সম্পর্কে স্বপ্ন বাঙালী কবিমানসকে আন্দোলিত করে। সমাজসচেতন বাঙালী কবির কবিকৃতিতে তা প্রতিফলিত হল। ১৯৩৫ সালের দিকে ফ্যাসিস্ট ইতালি আবিসিনিয়া আক্রমণ করলে মানবতাবাদী কবি রবীন্দ্রনাথ গভীরভাবে বেদনাহত হন। দীনবন্ধু এন্ড্রুজকে চিঠি লিখে সে বেদনার কথা তিনি জানান। তরুণ কবি অমিয় চক্রবর্তী রবীন্দ্রনাথকে বিদেশ থেকে চিঠি লিখে কবির মতামত চান। রবীন্দ্রনাথ তাঁর বহু পরিচিত আফ্রিকা কবিতা লিখে অমিয় চক্রবর্তীকে পাঠান। এইভাবে কবি এসে দাঁড়িয়েছেন নির্যাতিত মানুষের মাঝে। ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে জানিয়েছেন তীব্র ঘৃনা। তিরিশের তরুণ কবিদের মনেও ফ্যাসিবাদ সম্পর্কে বিরূপতা সৃস্টি হয়।

তিরিশের দশকেও পরিবর্তমান রবীন্দ্রনাথ দ্রুত অগ্রসরমান। ১৯৩৫ সালে তরুণ কবি বুদ্ধদেব বসুর সম্পদানায় প্রকাশিত হল কবিতা পত্রিকা। বাঙলা কবিতার ইতিহাসে এই কবিতা পত্রিকার দান অসামান্য। তিরিশের তরুণ কবিদের কবিতা এই কবিতা পত্রিকাতেই প্রকাশিত হয়। এদিক থেকে বুদ্ধদেব বসু একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। কবিতাতে লিখেছেন রবীন্দ্রনাথ, যতীন্দ্রনাথ

সেনগুপ্ত, নজরুল ইসলাম, অজিত দত্ত, বুদ্ধদেব বসু, জীবনানন্দ দাশ, প্রেমেন্দ্র মিত্র, নরেশ গুহ, সমর সেন, হেমচন্দ্র বাগচী, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, অশোক মিত্র, বিমলচন্দ্র গোষ, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, হরপ্রসাদ মিত্র, কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, দিনেশ দাস প্রমুখ প্রবীণ ও নবীন কবিরা। রবীন্দ্রানুজ কবিগোষ্ঠীও রবীন্দ্রনাথকে সম্মুখে রেখে রবীন্দ্রবিমুখতা ও রবীন্দ্র অনুসরণের মধ্যে দিয়ে নতুন পথের সন্ধান করেছেন। কবিতা পত্রিকা প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব বসু লিখেছেন–

> "তিরিশের যে সব কবিরা নতুন দৃষ্টি ও নতুন সুর নিয়ে এসেছিলেন, যাদের ক্রিয়াকলাপ, কোনো সন্দেহ নেই, রবীন্দ্রনাথের পরে বাংলা কাব্যে প্রথম উল্লেখযোগ্য ঘটনা তাদের বাহন ও প্রচারক রূপে আমাদের যাত্রারম্ভ।"

রবীন্দ্র পরবর্তীকালের বিখ্যাত কবি জীবনানন্দ দাশের কবিতার প্রকাশ ও কবিখ্যাতি বুদ্ধদেব বসু ও তার কবিতা পত্রিকার মাধ্যমে ঘটেছিল্ রবীন্দ্রনাথ কবিতার প্রথম সংখ্যা পড়ে খুশি হয়েছিলেন। চিঠি লিখেছিলেন বুদ্ধদেববসুকে। কবিতাকে শুভেচ্ছা জানিয়ে ১৯৩৬ সালের ৩রা জানুয়ারী রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন–

> "তোমাদের পত্রিকা নতুন কবিদের খেয়ার নৌকা। যাদের হাতে উপযুক্ত মাশুল আছে তাদের পার করে দেবে সর্ব্বজনের পরিচয়ের তীরে। আমার কাজ শেষ হয়ে গেছে। পারে তো এসেইছি, হয়তো এতদূরে চলে গেছি যে চেহারাটা ক্রমে ফিকে হয়ে এল বলে।"

রবীন্দ্রনাথ কবিতার পাতায় তরুণ কবিদের কবিতা পড়ে তার মতামতও জানিয়েছিলেন। সেই রবীন্দ্র প্রেরণা, কবিতার তরুণ কবিকুলকে যথেষ্ট অনুপ্রাণিত করেছিলেন। তাঁদের কবিস্বাতন্ত্র্যও রবীন্দ্রনাথকে মুগ্ধ করেছিল। তিনি দেখেছিলেন এর প্রায় প্রত্যেক রচনার মধ্যেই বৈশিষ্ট্য আছে। প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব বসু, জীবননান্দ দাশ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বিষ্ণু দে, সমর সেন, অমিয় চক্রবর্তীর কবিতা পড়ে তাদের কবিত্বকে স্বীকার করে নিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। রচিত হয়েছিল তরুণ কবিদের সাথে রবীন্দ্র যোগসূত্র। রবীন্দ্রনাথ সেদিন দেখেছিলেন এই তরুণ কবিদেরও সম্বল কম নেই। রবীন্দ্রনাথের দানও সেদিন কবিতা আচল পেতে নিয়েছিল। কবিতাতে রবীন্দ্রনাথের কবিতা তরুণ কবিদের সাথে প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথের আফ্রিকা কবিতাটি কবিতা পত্রিকাতেই বের হয়। এ–ভাবেই বাঙলা কবিতার নতুন কালের সাথে রবীন্দ্রনাথ সংযোগ রেখে চলেছিলেন। অনুজ কবিতা পত্রিকাতেই বের হয়। এ–ভাবেই বাঙলা কবিতার নতুন কালেল সাথে রবীন্দ্রনাথ সংযোগ রেখে চলেছিলেন। অনুজ বুদ্ধদেব বসুকে লেখা চিঠিপত্রে তার অনেক কথা উজ্জ্বল হয়ে আছে।

বুদ্ধদেব বসু কোনো বিশেষ মতবাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে কবিতা পত্রিকা সম্পাদনা করেন নি। এদিক থেকে তিনি স্বতন্ত্র। বহু তরুণ প্রতিভাবে তিনি সাহিত্যে ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হবার সুযোগ করে দেন।

কবিতা পত্রিকাতেই সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের পদাতিক কবিতাটি প্রকাশিত হয়। সময়সেনের সাড়া জাগানো কবিতা, কবিতা পত্রিকাতেই ছাপা হয়। প্রকাশিত হয়েছিল তরুণ কবিদের লেখা অনেক গদ্য কবিতা।

রবীন্দ্রনাথও তখন প্রবল বেগে পরিবর্তিত হয়েছেন। তরুণ কবিদের কাছে তিনি জীবন্ত। রবীন্দ্র কবিচিত্তে সুদুর নিসর্গ মুগ্ধতাও তেমন নাই। সমাজ-মানুষই কবিকৃতির বিরাট অংশ জুড়ে বর্তমান। আমাদের সমাজ পরিস্থিতিকে কবি নানাভাবে আঘাত করে চলেছেন। শোষিত, নিপীড়িত, পদানত, অন্ত্যজ মানুসের সগোত্রতা লাভের বাসনা কবচিত্তে তীব্র হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথকে ঘিরে তরুণ কবিদের মধ্যে তখন চলছিল রবীন্দ্রানুসরণ ও রবীরেন্দ্রাত্তরনের প্রয়াস। নতুন কবিদের কালেও রবীন্দ্রনাথ চিরনোতুন। সেই সময়কার পরিস্থিতি বিস্লেষণ করে অধ্যাপক ডা: ক্ষুদিরাম দাস বলেন–

> "সেই সময় সাহিত্যকসমাজে একদিকে যেমন রবীন্দ্রবিহ্বলতা আর একদিকে তেমনি হিমালয় লঙ্ঘনের দু:সাহসিক প্রচেষ্টা। কল্লোল থেকে কবিতায় এসে আধুনিক উৎসাহের এই দিকটি কাব্যমূল্যে যাই হোক, অভিযানের দিক থেকে অবিস্মরণীয়, কারণ, সাহিত্যের ইতিহাসে এই ধরনের উৎসাহ ও প্রস্তুতির দৃষ্টান্ত বিরল। আর এই সাম্প্রতিক সাহিত্যপটভূমিও সায়াহ্নের রবীন্দ্রনাথের রূপকে উজ্জ্বলভাবে ফুটিয়ে তুলতে সাহায্য করেছে, দেখিয়েছে যে তিনি শুধু সে যুগেরই আধুনিক নন, সর্বকালের আধুনিকতার মূর্তি।"

১৯৩৭ সালের দিকে নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সংঘ প্রগতি নামে একটি সংকল প্রকাশ করে এবংসেটি রবীন্দ্রনাথকে উৎসর্গ করা হয়। তাতে রবীন্দ্র কবিতার উল্লেখও করা হয়। সংকলনে লিখেছিলেন হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়,সমর সেন, বুদ্ধদেব বসু, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অরুণকুমার মিত্র, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বিভূতি ভূষণ বন্দোপাধ্যায়, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখ। লেখকরা বিশেষ কোনো মতাদর্শে প্রভাবিত ছিলেন না তবে অন্যায় ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে ছিলেন তীব্র প্রতিবাদী কণ্ঠ।

১৯৩৯ সালে অগ্রণী পত্রিকা প্রকাশিত হয়। লেখকরা ছিলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র, অরুণ মিত্র, সমর সেন, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, দিনেশ দাস, জ্যোতিন্দ্র মৈত্র প্রভৃতি তরুণ কবি-সাহিত্যিক।

১৯৪০-এর দিকে ঢাকা থেকে প্রকাশিত হল ক্রান্তি। এটি ছিল প্রগতি লেখক সংঘের সাহিত্য সংকলন। ক্রান্তিতে লিখলেন রণেশ দাশগুপ্ত, অচ্যুত গোস্বামী, কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, সোমেন চন্দ প্রমুখ।

বিশ্ব শতকের তিরিশের ভাঙলা কবিতায় বিদেশী প্রভাব, তরুণ কবিদের কবিকৃতিতে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। রাশিয়ায় সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা এদের তরুণ কবিদের সমাজতন্ত্রের প্রতি আগ্রহ জাগায় এবং কাব্য-কবিতায় শ্রমিক-কৃষক-মেহনীজনতার অধিকার প্রতিষ্ঠার কথা তুলে ধরেন। ১৯২২ সালে প্রকাশিত হল

টি এস এলিয়টের ওয়েস্ট ল্যান্ড। যুদ্ধবিধ্বস্ত মাটির উপর দাঁড়িয়ে এলিয়ট ব্যধিগ্রস্থ ধনতন্ত্রের ছবি তুলে ধরলেন। চারদিকে ধূসর, অনুর্বর জমি, সফলহীন। যুদ্ধোত্তর মানুষ সেই অনুর্বর পৃথিবীর অধিবাসী। ধূসর পৃথিবীর অন্ত:সারশূন্য মানুষ। বাঙালি তরুণ কবিদের অনেকেই স্বাভাবিকভাবে এলিয়টের দ্বারা অনুপ্রাণিত হলেন। তাদের মানসিকতার সাথে এলিয়টের মানসিকতার কিছুটা মিল খুঁজে পেলেন। ওয়েস্টল্যান্ড আধুনিক যুগের মহাকাব্য। তরুণ কবিত পাউন্ড, এলিয়টকে গ্রহণ করলেন রবীন্দ্রনাথকে বিনম্র প্রণতি জানিয়েও। রবীন্দ্রনাথকে মনে হয়েছিল কাছে থেকে দূরের। এ ব্যাপারে তাদের পথ দেখালেন সাগর পারের পশ্চিমা করিবা। কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে তারা ছেড়ে যেতে পারলেন না কোনকালেই। এটা তারা ভালোভাবেই বুঝেছিলেন। বাঙলা কবিতায় এলিয়টের প্রভাবের কথায় ড: দীপ্তি ত্রিপাঠী বলেছেন-

'এলিয়টের প্রভাবে বাংলা আধুনিক কাব্যের যে পরিবর্তন হল তা প্রধান মেজাজের। আত্মসচেতনতা, মননের বৈচিত্র, নৈর্বক্তিকতার আদর্শ এবং ঐতিহ্যের দিকে মনোযোগ ছাড়াও প্রেম, ধর্ম, মৃত্যু, বিধাতা কাল প্রভৃতি সম্বন্ধে তারা নতুন করে ভাবলেন।'

তিরিশের তরুণ কবিরা পশ্চিমা কবি ইয়েটস, এজরা পাউন্ড, স্পেনআর, অডেন, এলিয়টের দ্বারা দীক্ষিত হলেন। কল্লোলের সময় থেকেই তরুণ বাঙালি কবিতদের মধ্যে দেখা দিয়েছিল রবীন্দ্রবিমুখতা। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ থেকে বিচ্ছিন্ন হতে তারা কোন দিনই পারলেন না। রবীন্দ্র যুগের জলহাওয়াতেই এই কবিরা বড় হয়েছেন, চোখ মেলে চেয়েছেন। দেখেছেন পিছনে, সম্মুখে রবীন্দ্রনাথ। আগোগোড়া তারা রবিকরোজ্জ্বল। পৃথিবীর ব্যধিগ্রস্ত ধনতন্ত্রের বিভৎসরূপ আলগা হয়ে পড়ল দেশি-বিদেশী কবিদের চোখের সামনে। কবিমানস ক্ষতবিক্ষত হন। বিদেশী কবিদের অনেকেরই দৃষ্টিতে ধরা পড়ল সমাজের বাস্তব চেহারা। একদিকে তারা যেমন পরিচিত হলেন সমাজতন্ত্রের সাথে তেমনি পরিচিত হলেন ফ্যাসিবাদের সঙ্গে। যুদ্ধোত্তর কবিমন হল সমস্যাজীর্ণ। সমাজ পরিস্থিতির পরিবর্তনের স্বপ্নে অনেকে সাম্যবাদী ভাবধারায় উদবোধিত হলেন। কবিরা দেখলেন শোষণহীন সমাজের স্বপ্ন।

বাঙলা কাব্যের তরুণ কবিরা বিদেশী সাহিত্যের মায়াকভস্কি, এলুয়ার, আরাগঁ, প্রমুখের দ্বারাও প্রভাবিত হলেন। তাদের কবিকৃতিতে মার্কসবাদী চেতনার প্রসার ঘটল এবং কবি শোষিত, নিপীড়িত দরিদ্র মানুষের মুক্তির ব্যাপারে সচেতন হলেন। একদিক দিয়ে এই বিদেশী কবিদের রচনায় শ্রেণী সতেনতার দিকটি যেমন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তেমনি উচ্চারিত হয়েছে শোষিত, পদানত, মানুষের প্রতি মানবিক সহানুভূতি। যাই হোক, এই সময়ের তরুণ বাঙালি কবিদের অনেকেই যেমন বিদেশীয় কাব্য-ভাবনায় অনুপ্রাণিত হয়েছেন তেমনি আবার অনেক তরুণ কবি কোনো মতাদর্শ ছাড়াই দেশীয়

ভাবধারায় উদবোধিত হয়ে কবিতা লিখেছেন। একদিকে প্রেমেন্দ্র মিত্র, বিষ্ণু দে, অমিয় চক্রবর্তী, সমর সেন, সুভাষ মুখোপাধ্যায় অপর দিকে াজিত দত্ত, জসীম উদদীনের মতো দেশীয় লোক-ঐতিহ্য অনুসারী কবিরা। তবে তাদের কবিকৃতিত সমাজও তুচ্ছ নয়। জীবনানন্দের কবিতায় দেশীয় ঐতিহ্য থাকলেও ইয়েটস এর প্রভাব চোখে পড়ে। বিষ্ণু দে'র কবিতায় মার্কসীয় প্রভাব যথেষ্ট। সেই সঙ্গে রয়েছে এ দেশীয় ও বিদেশীয় পুরানের অনুসরণ। তরুণ কবিরা পশ্চিমা কবিদের কাছে যেমন ঋণী তেমনি রবীন্দ্রনাথের কাছে। রবীন্দ্রনাথকে গ্রহণ করেই তারা অভিযাত্রী হলেন নতুন পথের সন্ধানে। রবীন্দ্রনাথও আরো উজ্জ্বল হয়ে উঠলেন্ এই রবীন্দ্রনাথও প্রবল সমাজবাদী, ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী কণ্ঠ। এই রবীন্দ্র প্রভাব সম্পর্কে তরুণ কবি বিষ্ণু দে বলেন-

'রবীন্দ্রব্যবসা নয়, উত্তরাধিকার ভেঙে ভেঙে
চিরস্থায়ী জটাজালে জাহ্নবীকে বাঁধিনা, বরং
আমরা প্রাণের গঙ্গা
খালা রাখি, গানে গানে নেমে
সমুদ্রের দিকে চলি, খুলে দিই রেখা আর রং...'

শুরু হল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। আবার পৃথিবীব্যাপী দেখা দিল নির্লজ্জ দানবীর বিভৎসতা। বিপর্যস্ত হল মানুষের জীবন, সমাজ, সভ্যতা ও অর্থনীতি। এই পরিস্থিতির মধ্যেই কবিকে বেঁচে থাকতে হয়েছে সমাজ থেকে রস টেনে নিয়ে। অবক্ষয়, নি:সঙ্গতা, বিচ্ছিন্নতাবোধ, শুধু নগরজীবনকেই নয় গ্রাম-জীবনকেও করেছে কলুষিত। এই জীবন থেকে কিবরা সরে থাকতে পারেন না। তাদের কবিকৃতিতে এই জীবনের ছবি ফুটে উঠেছে। রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ফলে শোষিত জনগণের মুক্তি, এ দেশের কবি-সাহিত্যিকদেরও একদা নতুন সমাজের স্বপ্ন দেখিয়েছিল। সেই সমাজতান্ত্রি সমাজব্যবস্থার উপর ফ্যাসিস্ট শক্তির আগ্রাসন তাদের স্তম্ভিত করে। ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে তাদের প্রতিবাদী কণ্ঠ ঘৃণায়, প্রতিবাদে উচ্চকিত হয়ে ওঠে। এই জঘন্য ফ্যাসিস্ট আগ্রাসনের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথও প্রতিবাদ জানান। কবি এসে দাঁড়ালেন মানুষের সপক্ষে। মানবতাবাদী কবি ফ্যাসিস্ট 'দানবের সাথে সংগ্রামের জন্য তরুণদের আহ্বান জানালেন।

'কল্লোল যুগের কথাসাহিত্যও যথার্থ মানুষমুখী হয়ে উঠে। কথাসাহিত্যের সঙ্গে পারস্পরিক আদান প্রদানের প্রভাব কবিতাতেও এসেছে। তাঢ়াড়া 'কল্লোলে'র লেখকরা ছিলেন একাধারে কবি ও কথাশিল্পীও। বুদ্ধদেব বসু, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, মণীশ ঘট (যুবনাশ্ব) যেমন কবি তেমনি কথাসাহিত্যিক। সমাজ অভিঘাতের দিকটি তাদের কবিতায় যেমন পড়েছে তেমনি কথাসাহিত্যেও

পড়েছে। কল্লোলের গল্প, উপন্যাসের চরিত্রগুলো একেবারে সমাজের নীচু তলার মানুষ। কথা-সাহিত্যেও যুদ্ধোত্তোর সমাজমানসের ছবি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। অবক্ষয়িত সমাজের পরিচিত ছবি কথাসাহিত্যের বাস্তবায়িত হয়। সমাজতান্ত্রিক শোষণে গ্রামগুলোর দুরবস্থা অত্যন্ত করুন। শোষিত, নির্যাতিত, নি:স্ব সাধারণ মানুষের জীবনের ছবি কবিতার মতো কথাসাহিত্যেও চিত্রিত হয়েছে। যুদ্ধোত্তর নাগরিক জীবনও হয়ে পড়ে কলুষিত ও ব্যধিগ্রস্ত। মধ্যেবিত্ত জীবনে নেমে এসেছে বিচ্ছিন্নতার অন্ধকার। সামাজিক অবক্ষয়ের শিকার সাধারণ মানুষ। দূরত্ব ভেড়ে উঠেছে গ্রাম ও শহরে। শহরের ফুটপাতে উঠে এসেছে গ্রাম। ফুটপাতে, বস্তির অন্ধকারে মানুষ বাধ্য হয়েছে পশুকৃত জীবনযাপনে। অবক্ষয়িত সমাজে নারীকে পরিণত হতে হয়েছে পণ্যে। গ্রামগুলো ধ্বংস প্রায়। এই পঙ্কিল জবনের ছবি কথাসাহিত্যে রূপায়িত হয়েছে। 'কল্লোলে'র তরুণ লেখকদের মধে মণীশ ঘট, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্য সেনগুপ্ত, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় প্রমুখের গল্প, উপন্যাসে সামাজিক অবস্থার চিত্র সুস্পষ্ট। মণীশ ঘটকের 'পটলডাঙার পাঁচালীতে সামাজিক অবক্ষয়ের চিত্র অত্যন্ত উজ্জ্বল। ধনতান্ত্রিক শোষণে শোষিত নি:স্ব মানুষের কাহিনী এখানে বর্ণিত। পটলডাঙার পাঁচালী নগর সভ্যতার অন্ধকারে পড়ে থাকে সাধান মানুষের পদাবলী। মানুষের অনিকেত জীবনের চালচিত্র বর্ণিত হয়েছে এতে। হৈ মানুষের অধিকাংশই সমাজসৃষ্ট ভিখিরী, ভবঘুরে ও সর্বহারা ছিন্নমূল মানুষ। শৈলজানদ্রের 'কয়লা কুঠির রহস্যে' শ্রমিক জীবনের করুণ কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের 'বেদে' ছন্নছাড়া মানুষের কথা। কয়লাখনির কুলি জীবন নিয়ে লেখা মৈলজানন্দের 'মা'। প্রেমেন্দ্র মিত্র সাধারণ ধুলো-মাটির জীবনকেই তুলে ধরেছেন 'পাঁকে'। প্রেমেন্দ্র মিত্র সমাজসচেতন কবিও। আমি কবি কবিতায় সাধারণ শ্রমজীবী মানুষকেই সম্মান জানিয়েছেন। কবিতায় সমর সেন নগর কলকাতার বিকৃত মানসিকতার ছবি এঁকেছেন। যতীন্দ্রনাথ থেকে প্রেমেন্দ্র মিত্র, বিষ্ণু দে, সমর সেন, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, বিমলচন্দ্র ঘোষ প্রমুখ কবিরা সমাজের কথা বলেছেন। 'কল্লোল', 'প্রগতি', 'কবিতা'র কবিরা মানুষকেই মর্যাদা জানিয়েছেন। তাদের মানুষপ্রীতি ও যথার্থ আন্তরিক।

বিশ শতকের তিন চার দশকের বাঙলা কবিতার গতিপ্রকৃতি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে তরুণ বাঙালি কবিরা যেমন পরিবর্তিত সমাজ পরিস্থিতির সঙ্গে সম্পর্ক রেখে মানুষের মুক্তির ব্যাপারে সমাজ ভাবনায় উদবোধিত হয়েছেন এবং কবিকৃতিতে মানুষের মর্মবেদনাকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন তেমনি আবার বিশুদ্ধ কবিকল্পনাতেও অনুপ্রাণিত হয়েছেন। কিন্তু রবীন্দ্রবিরোধী হয়েও তারা কোনভাবেই রবীন্দ্রনাথকে অতিক্রম করে যেতে পারলেন না। রবীন্দ্রনাথও দ্রুত পরিবর্তিত হয়েছেন। পৌঁছেছেন মাটি-মানুষের দ্বারে। তরুণ বাঙালি কবিরা রবীন্দ্রমুক্ত হতে গিয়েও রবীন্দ্র স্বাক্ষর বুকে

নিয়ে সম্মুখে অগ্রসর হয়েছেন। তরুণ কবিকুল রবীন্দ্রমুক্ত তো হতে পারলেনই না বরং রবীন্দ্রনাথেই ফিরে এলেন সম্মুখে চলমান রবি। তাদের সামনের ও পিছনের পথও সূর্যকরোজ্জ্বল।

'কল্লোল', 'প্রগতি', কবিতার তরুণ কবিরা রবীন্দ্র প্রদর্শিত রোমান্টিকতা ও সমাজবাস্তবতা- এই দুই ধারাতেই অনুপ্রাণিত। তাদের অনেকের সঙ্গেই ছিল রবীন্দ্রনাথের মুকট সম্পর্ক। তরুণ অমিয় চক্রবর্তী ছিলেন কবির সাহিত্য সচিব। রবীন্দ্রনাথের কাজেই তিনি পেয়েছিলেন 'মানুষকে দেখবার চোখ'। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বুদ্ধদেব বসু, সমর সেন প্রমুখের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্টতা ছিল। তাঁদের কবিকৃতি বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের অভিমত তাঁরা জানতে চেয়েছেন। অনুজ কবিদের কবিতা পড়ে কবি তাঁর মতামত তাঁদের লিখে জানিয়েছেন। জীবনানন্দের কবিতা সম্পর্কেও রবীন্দ্রনাথ তাঁর মতামত জানিয়েছিলেন। তাঁদের অনেকেরই প্রথম কাব্যগ্রন্থে রবীন্দ্রানুসৃতি স্পষ্ট। বুদ্ধদেব তাঁর কবিতা পত্রিকার জন্য রবীন্দ্রাথের কবিতা নিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ সব দিক দিয়ে তাঁদের দলে মিশতে না পারলেও এই তরুণ কবিরা রবীন্দ্রপ্রেরণা থেকে বঞ্চিত হন নি কোনদিন। তাঁরা জানতেন তাদের মাথার উপরে আছেন রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথকে মনে রেখেই তাঁরা অগ্রসর হয়েছেন নতুনের সন্ধানে। বুদ্ধদেব বসুকে লেখা চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন–

> "তোমরা কবিতার নতুন পথ তৈরী করতে লেগে যাও– আমার পথ চলে গেছে কোন বেঠিকানায়। সেদিকটাতে তোমাদের পণ্যের ব্যবসায় তোমরা তুলে দিয়েছ। নতুন ব্যবসায়ের হিসাব-নিকাশী এখনো দেখা দেয়নি, মনে মনে লাভের অঙ্ক কষে চলেচ, আশা করি মহাজনী জমে উঠবে–এতকালের সমস্ত খাতাপত্র বাতিল করে দিয়ে। তোমাদের পথটা বিশেষ দুর্গম বলে বোধ হচ্ছে না, যদি সঙ্কোচ না থাকত তোমাদের দলে ভিড়তে পারতুম।"

অস্তাচলের পথে যেতে যেতে নিজেকে বদলিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। পৌছেছেন মানুষের দ্বারারে। বুদ্ধদেব বসু, জীবনানন্দ দাশ, অমিয় চক্রবর্তী থেকে চল্লিশের সুভাষ মুখোপাধ্যায়, বিমলচন্দ্র ঘোষ প্রায় সব কবিই রবীন্দ্রনাথকে অঙ্গীকার করে নিয়েছেন। তাঁদের কবিমনের অন্তরালে শোনা যায় রবীন্দ্রনাথেরই ধ্বনি-প্রতিধ্বনি। চল্লিশের সুভাষ মুখোপাধ্যায় মনে করেন–

> "আর বাংলা কবিতায় সব আধুনিকেরই প্রস্থান ভূমি রবীন্দ্রনাথ। প্রবাব না বলে আমি বলব রবীন্দ্রনাথই তাদের প্রেরণার উৎস।"

রবীন্দ্রানুজ কবিদের অনেকেই মার্কসবাদী চিন্তাধারাকে কবিতায় তুলে ধরেছেন এবং শ্রেণী শোষণমুক্ত সমাজের স্বপ্ন দেখেছেন। আবার সেই সঙ্গে তাঁরা রোমান্টিকও। এই দ্বৈধতা উল্লেখযোগ্য। বাঙলা কবিতার আলো-বাতাসের সঙ্গে মিলে আছেন রবীন্দ্রনাথ। বাঙালী কবিকে তার মধ্যে বেঁচে থাকতে হবে, বড় হতে হবে। তাঁকে অস্বীকার করা অসম্ভব। কারণ তিনি একালেও সবচেয়ে

আধুনিক। গোধূলিতেও তাঁর বড় পরিচয় তিনি মানুষের সপক্ষ কবি। সেই সঙ্গে নিসর্গ-কল্পনারও। রবীন্দ্রোত্তর কবিরা রবীন্দ্র বিদ্রোহী হয়েও রবীন্দ্রপ্রভাবিত। যৌবনে একদিন তাঁরা রবীন্দ্রনাথকে সামনে রেখেই হয়েছিলেন রবীন্দ্র বিরোধী। সমাজ, মানুষকে দেখেছেন অন্য চোখে। কিন্তু সেই রবীন্দ্রবিরোধীতাই হল তাঁদের আরতি। কবি জীবনানন্দ দাশের কথায়–

> "ইংরেজ কবিরা যেমন যুগে-যুগে ঘুরে ফিরে সেক্সপীয়র-এর কেন্দ্রিকতার থেকে সঞ্চারিত হয়ে বৃত্ত রচনা করে ব্যাপ্ত হয়ে চলেছে, আমাদের কবিরাও রবীন্দ্রনাথকে পরিক্রমা করে তাই করবে–এই ধারণা প্রত্যেক যুগসন্ধির মুখে নিতান্ত বিচার সাপেক্ষ বলে বোধ হলেও অনেক কাল পর্যন্ত অমূলক বা অসঙ্গত বলে প্রমাণিত হবে না–এই আমার মনে হয়।"

বিশ শতকের প্রথম দিকের সত্যেন্দ্রনাথ, যতীন্দ্রনাথ, নজরুল থেকে চল্লিশের দশকের সুভাষ, বিমলচন্দ্র প্রমুখ কবিরা সমাজ-মানুষ দ্বারা অনুপ্রাণিত। আবার কেউ কেউ সমাজসচেতন হয়েও রোমান্টিক। তিন চারের দশকে সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার ফলে তাঁরা শোষিত, বঞ্চিত মানুষের মুক্তির ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে ওঠে। কবিরা হয়ে পড়েন আন্তর্জাতিক। শোষিত বঞ্চিত, নিপীড়িত মানুষের মর্মবেদনা তাঁদের কানে এসে পৌঁছায়, কিন্তু, যথার্থ মানুষের কবি তাঁরা হতে পারেন নি। যেমন পারেননি রবীন্দ্রনাথও। কারণ, তাঁরা শ্রমিক, কৃষক জীবনের শরিক হতে পারেননি। রবীন্দ্রনাথেও এই বেদনা প্রবল। রবীন্দ্রনাথও পদানত মানুষের গৃহ-দ্বারে এসে দাঁড়িয়েছেন গভীর বেদনা বুকে নিয়ে। সেই রুদ্র মানবের আত্মপরিচয় বঞ্চিত কবিকে অপরিস্ফুটতার অসম্মান নিয়ে চলে যেতে হচ্ছে। একালের তরুণ কবিরা রবীন্দ্রোত্তরণ করতে গিয়ে অনেক পথ পেরিয়ে রবীন্দ্রনাথেই ফিরে এসেছেন। তাঁরা বুজেছেন রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিয়ে রবীন্দ্রোত্তরণ অসম্ভব। কিন্তু, তাঁদের রবীন্দ্রবিদ্রোহ নতুন কালকে অনুপ্রাণিত করল। তাঁদের কবিকৃতিতে সমাজ যেমন আছে তেমনি আছে নিসর্গ ও বিশুদ্ধ কবিকল্পনাও। তাঁদের কবিকৃতিকে বুদ্ধদেব বসু বলেন:

> "একে বলা যেতে পারে বিদ্রোহের, প্রতিবাদের কবিতা, সংশয়ের ক্লান্তির, সন্ধানের, আবার এরই মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে বিস্ময়ের জাগরণ, জীবনের আনন্দ বিশ্ববিধানে আস্থাবান, চিত্ত বৃথি। আশা আর নৈরাশ্য, অন্তমুর্খিতা বা বহির্মুখিতা, সামাজিক জীবনের সংগ্রাম আর আত্মিক জীবনের তৃষ্ণা, এই সবগুলো ধারাই খুঁজে পাওয়া যাবে, শুধু ভিন্ন কবিতে নয়, কখনো হয়তো বিভিন্ন সময়ে একই কবির রচনায়।"

Z_¨mÎ:

১. জীবেন্দ্র সিংহ রায়, কলেণ্ঢালের কাল, কলকাতা, ২০০৮, পৃ-১৪৪
২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৯
৩. প্রাগুক্ত।

M) XvKvq AvawbKZvev‘x mvwnZ¨ Av‡›‘vj‡bi weiæ‡× cÖwZwµqv

আধুনিকতাবাদী বাংলা কথা সাহিত্য উপাদান বিষয় ও বিন্যাসকুশলতায় কিছু কিন্তু লেখক বিশিষ্টতার যে মাত্র। যোগ করেছেন, ও যুগপৎ অপূর্ব ও অনন্য। যে জীবন বীক্ষা রূপ ও রসে তার রচনায় চারুকৃত তা তাদের স্বাপোর্জিত গল্প, উপন্যাস কিংবা কবিতায় তারা সংযুক্ত করেন অভিন্ন অভিপ্রায়। উত্তর সামরিক (১৯১৪-১৭) বাংলা কথা সাহিত্যে এদের আবির্ভাব কিছুটা অবাঞ্চিত; যদিও এ আবির্ভাবের আংশিক সামান্য পটভূমি প্রস্তুত করেছে সময় ও সমাজ। উত্তর সামরিক বিশ্বে যে না অর্থক সামাজিক রাজনৈতিক অর্থনৈতিক প্রতিবেশ আরোপিত হয়েছিল। একটু বিলম্বে ভারতবর্ষে তার ঘটেছিল সংক্রমন। বস্তুত রুশ বিপ্লেবের (১৯১৭) হ্যাঁ অর্থক পরিনাম ভারতবর্ষের জনচিত্তে তাৎক্ষনিক কোন প্রভাব বিস্তার করেনি; ১৯২৮ সালে স্বশ্রেনিচ্যুত মুষ্টিমেয় ক'জন বুদ্ধিজীবীর ভারতীয় কমিউনিষ্ট পার্টির প্রতিষ্ঠা ব্যতীত রুশ বিপ্লবের তথা মার্কসাবাদী তত্ত্বের প্রভাব কিংবা বিস্তার অন্তত উত্তরে অনুসন্ধানীয়। যদি ও এই সময় সীমায় অগ্নিবীনায় (১৯..) সুর তুলেছেন বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬) রচিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৬১-১৯৪১) রুপক সাংকেতিক নাটক ও সমকালিন জীবনস্পর্শী উপন্যাস সমূহ। তবুও বাংলা কথা সাহিত্যের আসরে আধুনিকতাবাদী লেখকদের আবির্ভাবকাল সামাজিক নৈরাশ্যে পীড়িত, পঙ্ক বিলাস, ছন্দ প্রচ্ছদে অনিকেত মানুষ, আত্মবিবরাবনা, অতৃপ্তির ও অচরিতার্থতার ক্লিন্ন বিকার, রবীন্দ্র বিরোধিতা সূত্রে বাস্তবতার নির্মোকে রোমান্টিক ভাবালুতা অধিকাংম শিক্ষিত বাঙ্গালি মন অনিবার্যভাবে সময়ের অঙ্গতিতে স্বল্প পরিমানের হলেও হয়েছে। এ জগৎ অসঙ্গতির চলমান সভ্যতার সৌধ গড়ে ওঠে বিপরীত ধারা। নবাগত এই যুগের গুণগত ও মাত্রাগত বৈশিষ্ট্যর যুগটীকা ললাটে ধারণ করেই কল্লোল (১৯২৩) পত্রিকার আত্মপ্রকাশ। এর কিছুকাল পরে সুরেশ চক্রবর্তীর সম্পাদনায় ১৯২৫ সালে উত্তরা প্রকাশ লাভ করে কালি কলম পত্রিকাটি মুরলীধর ও শৈলজা রঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের যৌথ সম্পাদনায় ১৯২৬ সালে বের হয়। ১৯২৭ সালে 'প্রগতি' পত্রিকাটি বুদ্ধদেব বসু ও অজিত কুমার দত্তের উদ্যোগে সম্পাদিত হয়ে বের হতে থাকে। এছাড়া ১৯৩১ সালে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত সম্পাদিত 'পরিচয়' (১৯৩১) পত্রিকা প্রকাশিত হয়। 'পূর্বাশা' ১৯৩২ সালে বের হয়। 'কবিতা' পত্রিকা যথাক্রমে বুদ্ধদেব বসু, প্রেমেন্দ্র মিত্র, সমর সেন সম্পাদনায় ১৯৩৫ সালে প্রকাশিত হয়। নিরুক্ত ১৯৪১ সালে সঞ্চয় ভট্টাচার্য ও প্রেমেন্দ সম্পাদনায় ১৯৪৮ সালে 'সাহিত্যপত্র' বের হয়।

নবীন মূল্যবোধ ও যুদ্ধোত্তর যুগ চৈতন্যের ধারকরূপে 'কল্লোল' পত্রিকার ভূমিকা সাহিত্যের ইতিহাসে কল্লোলযুগ অভিধায় চিহ্নিত। যদিও এর আগেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (১৯২১) এর জগন্নাথ হলের

ছাত্রদের বার্ষিকী বাসন্তকায় (১৯২২) এর সূচনা হয়েছিল। সিগমুন্ড ফ্রয়েডের মনোসমীক্ষণ তত্ত্বের প্রচার (১৯১৩) প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, রুশ চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন (১৯৩০) মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার রাজনৈতিক কর্মীর শাস্তি (১৯২৯) আইন আমন্যে আন্দোলন (১৯৩১) নক্রর্থক সন্ত্রাসবাদ, বিশ্বমুদ্রা, বাজারের মন্দা, দুর্ভিক্ষ ইত্যাদি ঘটনার ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া আত্মস্বীকৃত করেই সূচিত হয়েছে সাহিত্যের কথিত কল্লোল যুগ। এ যুগের সাহিত্য এই অপচয়িত যুগের অপচয়মান মানুষের বিকৃতির অসঙ্গিতির শিল্পরূপ। কথিত আছে কল্লোল এর (১৯৩০) তরুন লেখকরা রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে ঘোষণা করেছিল। বস্তুত রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে কল্লোলের বিদ্রোহ ছিল তথাকথিত বিদ্রোহ এবং কল্লোল একাই কোন যুগ সৃষ্টি বা সুপরিণত পূর্ণাঙ্গ সাহিত্যতত্ত্ব' করতে পারেনি। অচিন্তকুমার সেনগুপ্তের 'কল্লোল যুগ' গ্রন্থে তিনি বলেন, কল্লোলের সঙ্গে শুধু কালিকলমের নামটাই লোকে জুড়ে দেয়, উত্তরা'র কথা দিব্যি ভুলে থাকে। কল্লোল কালি কলমের বহু সম্পূর্ণ কাজ উত্তরা কার দিয়েছে। যেমন আরো পরে করেছে পূর্বাশা অচিন্তকুমার সেনগুপ্ত এখানে সুধীন্দ্রনাথ দত্তের পরিচয় কিংবা বুদ্ধদেব বসুর কবিতার কথা বলেননি। তার অনুক্ত হলে যা বলেছেন তাতেই কল্লোল যুগ এককভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় না। আমাদের বক্তব্য হল আধুনিক কবিতার সূচনা ও বিকাশে কল্লোল ছাড়াও আরও একাধিক পত্রিকার ভূমিকা রয়েছিল যা পূর্বোক্ত, অধ্যায় আলেচনায় বোধ্যগম্য হয়।

আধুনিকতাবাদী ও সাহিত্য আন্দোলনের পক্ষে যেমন মতালম্বী লেখক ও সম্পাদক বিদ্বৎসমাজ ছিল তেমনি বিপরীত ক্রমে প্রতিক্রিয়াশীল মননশীল ব্যক্তি থেকে শুরু করে সাধারন পাঠক শ্রেণিও ছিল।

কল্লোলের গল্প, কবিতা, উপন্যাস প্রকাশিত হবার পূর্বেই অনেক উদীয়মান সাহিত্যিকদের সৃজন সাহিত্যকর্মের জন্য কড়া ভাষায় প্রতিক্রিয়া হয়েছি। কল্লোল প্রগতি কালিকলম লেখকগোষ্ঠী তার পাল্টা ও জবাব দিচ্ছিল। অর্থাৎ বাদানুবাদ পুরো দমে চলেছিল সে সময়ের পত্রিকাগুলোর পাতায় আজও জলন্ত সাক্ষী হয়ে আছে। যদিও বাংলা সাহিত্যের মধ্য গগনে তখনও বিরাজ করেছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আছেন সেখানে অন্তজ পতিত মানুষের কথাকার শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। কিন্তু ঔপনিষদীয় দর্শন পরিশ্রুত সার্বমঙ্গলিক রৈবিকচেতনা কিংবা বাঙ্গালির আবেগ জীবনের নব্যনীতিবাদী শরৎচন্দ্রীয় শিল্পামাধুর্যে যুদ্ধপরবর্তী নবীন শিল্পীরা বিশ্বাস স্থাপন করতে চাইছিল না নিজেদের স্বার্থেই তারা নিমজ্জিত হলেন বিস্তৃতি ও বিসঙ্গতির পঙ্কে রচিত হলো পঙ্কতিলক (১৯১৯) পাপের ছাপ (১৯২২) পাক (১৯২৬) প্রভৃতি উপন্যাস। মূল্যবোধ নৈতিকতা দেশাচার ও বিশ্বাবিচ্যুৎ এর শিরোনামে রচনায় রূপান্তিত হলো মানুষের অবচেতন যৌনাকাঙ্খা মধ্য জীবনের বহুমাত্রিক অসঙ্গিতি ও সমন্বয়, সমাজের নীচুতলার অবজ্ঞাত অপজাত মানুষের আদিম বাসনা ও সংগ্রামশীলতা, মানুসের অস্তিত্ব সংকট ও অস্তিত্ব মুক্তির ইতিকথা। এই সময়ের অনেক সাহিত্যকই শুধুমাত্র শুদ্ধপ্রেমের বিরোধিতা করার স্বার্থেই

তাদের কবিতায় প্রেমিকার দেহীরুপকে ইচ্ছাকৃত উপস্থাপন করেছেন। সমকালীন কবিদের মতো মনীশ ঘটকের কবিতায় দৈহিক বাসনার প্রাধান্য থাকলেও একমাত্র অন্যন্য সাধারন সৃষ্টি। জনৈকা কবিতাতে তিনি প্রেমর দেহজ কামনা বাসনা ও দেহগত আকর্ষণের কথা ব্যক্ত করেছেন। তিরিশি যুগের প্রেমচেতনার বন্দনা করেছেন। এবং চিন্তা চেতনায় রবীন্দ্রিক রোমান্টিকতা পরিহার করতে সচেষ্ট হয়েছেন এজন্য রোমান্টিক প্রেম পুরোপুরি অস্বীকার করার লক্ষ্যে তিনি বলেছেন, 'প্রেম নয়, যদি ভালো লেগে ছিল তোরে; বলা বাহুল্য, মনীশ ঘটক প্রেম এবং ভালোলাগাকে ভিন্নভাবে দেখার প্রয়াস পেয়েছেন। অর্থাৎ নারীপুরুষের কামনা তাড়িত সম্পর্ককে কবি প্রেম বলতে দ্বিধাবোধ করেছেন। কেননা তিনি জানেন,

পারিতাম যদি নিবিড় আলিঙ্গনে

বক্ষে বাধিয়া চম্বন চিত্রণে

রঙ্গিয়া দিতে ও রাঙ্গা ওষ্ঠপুট

হয়তো বেদনা রহিত না অস্ফুট (জনৈকা, শিলালিপি)

শীতলপাটি কবিতায় যুবনাশ্ব অসাধারণ এক কাহিনী সংবলিত প্রেমের দেহজ বাসনা রূপ একেছেন। দক্ষিণ দুয়ারি ঘরে দিনের বেলায় সহজ সরল এক গ্রামীন নারী শীতল পাটি বিছিয়ে শুয়ে ঘুমিয়ে আছে। তার শাড়ির আচল বিস্ত্রস্ত, এলোমেলো এবং কোন দিবাস্বপ্নে থর থর কাপে চম্পকাধর, এ সময় প্রেমিক কবি তার ওষ্ঠপ্রান্তে একে দেবে চুম্বন, কবির এই দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণ দেহজ বাসনা তাড়িত। তিনি যে, রাবীন্দ্রীক অতীন্দ্রিয় প্রেমবাদের ঘোর বিরোধী ছিলেন।

কবিতায় তার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া। দেবী তো নহ কবিতায় যুবনাশ্বের .... দৈহিক প্রেমের চরম প্রকাশ পরিলক্ষিত হয়। রবীন্দ্রনাথ যেখানে প্রেমিকাকে স্বর্গলোকের অপ্সরা হিসেবে কল্পনা করেছেন সেখানে মনীষ ঘটক রবীন্দ্র বিরোধী মনোভাব নিয়েই দেবী তো নহ' কবিতার নামকরণ করেন। এ কবিতায় তিনি নারী দেহের বিমূর্তায়ন উপেক্ষা করেছেন এবং নারী দেহে সর্ম্পকিত সকল কল্পনা বিলাস পরিহার করে প্রেমিকাকে রক্তে মাংসে গড়া নিছক মানুষীরূপে অংকন করেছেন। যেমন

দেবী তো নহ তোমারে তবে কেমনে পূজা করি

তোর মুখে দিব্যপ্রভা বৃথাই খুজে মরি

তোমার আছে দেহ, আছে নিটোল দুটি স্তন

ললিত বাহু, বিশাল উরু তপ্ত প্ররশন,

রক্তরাঙ্গা দাড়িম্বের মতন দুটো ঠোট

সেসুধা খরে তাহারি তরে লব্ধ অলি জোটে 'মৃত্যুময়ী' কবিতায় প্রেমের দেহজ কামনা বসনা জারিত পার্থিব দৈহিক সুধার সার্থক উদ্ভাসন পরিলক্ষিত হয়। চিলেকোটায় নরনারীর মিলন দৃশ্য কবি স্মৃতির পাতা থেকে চয়ন করেছেন। এ কবিতায় নর নারীর যৌনক্রিয়া বর্ণনা করতে গিয়ে ভূমিকা হিসেবে দীর্ঘ কাহিনী উপস্থাপিত হয়েছে। আদিম ক্রিয়াটি কখন, কোথায়, কিভাবে সংঘটিত হয়েছিল তার গানিতিক তথ্য পর্যন্ত কবি উপস্থাপন করেছেন।

মনীশ রটক অচিন্ত্যকুমার কল্লোলের প্রথম 'মশালচী' হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন। তাঁর সাহিত্য সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে অচিন্ত্যকুমার বলেছেন, একেবারে একটা নতুন সংসার অধন্য ও অকৃতার্থের এলাকা। কানা, খোড়া, ভিক্ষুক, গুন্ডা, চোর আর পকেমটারের রাজপাট। যত বিকৃত জীবনের কারখানা। বলতে গেলে মনীশই কল্লোলের প্রথম মশলাচী সাহিত্যের নিত্যক্ষেত্রে এমন সব অভাজনকে যে ডেকে আনল যা একেবারে অভূতপূর্ব। তাদের একমাত্র পরিচয় তারাও মানুষ জীবনের দরবারে একই সহ মোহর মারা একই সনদের অধিকারী। মানুষ? না মানুষের অপচ্ছায়া? যে জীবন ভগ্ন রুগ্ন পর্যদুস্ত তাদেরকে সে সরাসরি ডাক দিলে, জায়গা দিলে প্রথম পঙক্তিতে তাদের নিজেদের ভাষায় বললে তাদের মত দগদগে অভিযোগ জীবনের এই খলতা এই পঙ্গুতার বিরুদ্ধে কষায়িত তিরস্কার। দেখলে তাদের ঘা তাদের পাপ, তাদের নির্জ্জতা, সমস্ত কিছুর পিছনে দয়াহীন দারিদ্র্য 'রাত বিরাতে' মৃত্যুঞ্জয় মন্থশেষ ভূখা ভগবান ইত্যাদি গল্পে তিনি যাদেরকে আমাদের সমানে উপস্থিত করেছেন তারা সবাই শুধু কর্দয পঙ্কিল জীবনের সঙ্গে পরিচিত অন্ধকার সেই প্রদেশ সভ্যতার আলো প্রবেশ করতে যেন না পায়। কিন্তু তমসাচ্ছন্ন সেই প্রতিবেশও মনীষ ঘটক মনুষ্য সূক্ষ ও সুতীক্ষ্ম আলোক রেখাটিকে চিনে নিতে ভুল করেনি। মনীশ ঘটকের গল্পগুলি পাঠ করলে সমাজের সবচেয়ে ঘৃণিত ও কদর্য মানুষের জীবনযাত্রার সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয় ঠিকই কিন্তুকোন তাদেরই এ অবস্থা। ঐ দুর্দশার জন্য দায়ী কারা সেই সব দায়ী বক্তিদের সঙ্গে এদের শ্রেণিগত দ্বন্ধের স্বরূপ কি এ সমস্ত বিষয়ে উল্লেখই নেই তার গল্পে। অচিন্ত্যকুমারের মতে, এই সব আধুনিকতাবাদী লেখকদের আধুনিক অর্থে কোন সক্রিয় সমাজচেতনা ছিল না।

আধুনিকতাবাদী লেখকদের মধ্যে বুদ্ধদেবের বসুর অবদান কোন অবস্থাতে ফেলনা নয়। বুদ্ধদেব বসুর বন্দীর বন্দনা (১৯৩০) ও কঙ্কাবতী (১৯৩৭) কাব্য গ্রন্থ ও যে গীতল কাব্যগন্থী শব্দ তথা রবীন্দ্রীক শব্দ ব্যবহার কথ্যরীতি ও কাব্যরীতির প্রবর্তনায় উচ্চারিত হয়ে উঠেছে। এমনকি দয়মতীর (১৯৫৫) জগৎ হয়ে স্বাগত বিদায় (১৯৭১– এর হয়েও বুদ্ধদেবকে গ্রহণ করতে হয়েছে। উদ্যম ও শ্রমের

অক্লান্ত সংগ্রাম স্বীকার করতে হয়েছে চৈতন্য ও অবচেতন মনোভূমির চকিত উদ্ভাসকে বুদ্ধ দেব বসুর কাব্যের ক্ষেত্রে এমনতর প্রচেষ্টা থাকলেও গল্পের ক্ষেত্রে রজনী হল উতলা' গল্পের (১৯২৬) প্রকাশের মধ্যেই নিন্দিত ও বির্তকিত হয়ে উঠলেন। সতের বছরের লেখকের প্রথম প্রকাশিত এই গল্পটির বিষয় বিধায় বহুবিধ অভিযোগের মধ্যে অবশ্যই প্রধান ছিল অশ্লীলতার অভিযোগ। অশ্লীলতার প্রথম অভিযোগ আনেন আত্মশক্তি পত্রিকায় বীনাপনি দেবী (মিসেস এ.সি.রায়) এমন লেখককে আতুড়েই ননু খাইয়ে মেরে ফেলা উচিত ছিল, এই রকম বিধান দিয়েছিলেন।

কল্লোলের কোন লেখকের বিদ্রোহ করার ক্ষমতা ছিল না। তবে ঐ পত্রিকার অধিকাংশ লেখক প্রথাগত ধারায় চলার পক্ষপাতী ছিলেন না, তারা নতুনত্বের বা স্বকীয়তার অনুসন্ধান করতে চেয়েছিলেন। অচিন্ত্যকুমার সেন গুপ্তের ভাষায়, কল্লোলের পথ সহজের পথ নয়, স্বকীয়তার পথ, কেননা তার সাধনাই ছিল নবীনতার, অনন্যতার সাধানা, যেমনটি আছে তেমনটিই ঠিক আছে এর প্রচন্ড অস্বীকৃতি।

সমাজ সভ্যতার প্রতিষ্ঠিত মূল্যবোধ আশ্রিত প্রথা একদিনে গড়ে উঠে না। তা ধীরে ধীরে পূর্ণাঙ্গ একটি রূপ লাভ করে। তার দ্বারা সমাজ উপকৃত হয় বলেই তাকে সম্ভ্রমে হোক বা সামাজিক তার দায় হোক মেনে চলে কিন্তু ঐ মূল্যবোধের মধ্যে কিছু কিছু ব্যক্তি আঘাত হানে স্বীয় অহংকে আত্মাপ্রকাশের জন্য হীনপন্থা অনুসরণ করে। তাই প্রথাগত রচনায় শৈল্পিক রচনায় যারা অভ্যস্থ তারা কল্লোল এর লেখালেখিতে আস্বস্তিবোধ করতে থাকেন। কল্লোল ডান ও বাম, কলাবৈকল্যবাদী ও সমাজসচেতন, রোমান্টিক ও মানবতাবাদী, সব শ্রেনির লেখকগণই লিখতেন। তাদের বিষয়বস্তু পরিধি ছিল বিস্তৃত বস্তি থেকে পতিতালয়। বিশেষ করে প্রাচীনপন্থীরা যে যৌনাতাকে সযত্নে পরিহার করে চলেন, তারা তাকে সহজেই এবং একটু বেশী বেশী করেই রচনার উপজীব্য করেন নেন। তাই

> "কল্লোল এর লেখকদের হৈ চৈমূলক তৎপরতা কিছু কাজ হল কিছুটা প্রাচীনপন্থীরা যেন ঘাবড়ে গেলেন। মজফফরপুর সাহিত্য সম্মেলনের সাহিত্য শাখার সভানেত্রীর ভাষণে অনুরূপা দেবী কল্লোল এর লেখকদের সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন, তাদের মাদের উচিত ছিল এমন সন্তানদের লালন পালন না করে 'সূতিকায়' নুন খাইয়ে মেরে ফেলা। তাতে সধবা বিধবা নির্বিশেষে সর্বদাই পুরুষের জলন্ত ক্ষুধিত দৃষ্টির শিকার হতে হতো না

এদের প্রতিক্রিয়া দেখে এসব লেখকগণ অনেক আনন্দ বোধ করতেন। তার বর্ণনা আমরা বুদ্ধদেব বসু লেখা প্রবন্ধের মধ্যে পাই। সমালোকে যথার্থই বলেছেন তাহলেও সেক্স স্পৃহা বুদ্ধদেবে দ্বিতীয় স্বভাব, আত্মগুহায়িত স্বভাবে তিনি যথার্থই কবি। তাই প্রেমের চিত্র রচনায়, নগ্নতার অঙ্গনে তিনি

যেমন নির্ভয় তেমনি ঝাঝহীনও বটে বুদ্ধদের নিজেই স্বীকার করেছেন যে, Sextual be habior তার ছোট গল্পের ক্ষেত্রে উৎকট হতে পারেনি-পরিপ্লুত কাব্যময়তা যেখানে প্রবলভাবে কাব্যময়তাকে জায়গা করে নিয়েছে। তার কথা, সাহিত্যেরপ্রবল কাব্যময়তা বাদ দিয়ে ঘটনা তেমন কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধদেব বসুকে লেখা এক পত্রে 'বাসর ঘর' গ্রন্থটির সমালোচনা প্রসঙ্গে যা বলেছেন, তা তার যে কোন উপন্যাস প্রসঙ্গে যেমন প্রযোজ্য, তেমনি ছোট গল্প সম্পর্কেও সমানভাবে প্রযোজ্য। রবীন্দ্রনাথের উক্তি "গল্প হিসেবে তোমার এ লেখা স্বতন্ত্র এ কবির লেখা গল্প হিসেবে তোমার এ লেখা আখ্যানকে উপেক্ষা করে বাণীর স্রোতে বয়ে চলছে। একটি নারী সমানভাবে প্রজোয্য রবীন্দ্রনাথের উক্ত গল্প হিসাবে তোমার এ লেখা সম্পূর্ণ স্বতন্দ্র। এ কবির লেখা গল্প, আখ্যানকে উপক্ষো করে বানীর স্রোতে বয়ে চলেছে। একটি নারী এবং একটি পুরুষ এই দুই তটের 'মাঝখানে' এর আবেগের ধারা। ধারার মধ্যে থেকে আবর্ত পাক খেয়ে উঠেছে, কিন্তু তার কারণগত আঘাত বাইরের দিক থেকে নয়, গভীর তলার দিক থেকে নয়; গভীর তলার দিক থেকে। কারণ যদি থাকতো বাইরে তা হলে তার ইতিহাস নিয়ে অখ্যানের উপকরণ জমে উঠতে পারত। তাহলে এর ভিতর থেকে দস্তুর মতো একটি গল্প লেখা দিতো। তুমি স্পর্ধা করেই সেটা ঘটতেও দাও নি। এই যে তোমার গল্প না বলা গল্পটিকে তুমি এমন করে দাড় করাতে পেরেছ যে তোমার কবিত্বের প্রভাবে" বুদ্ধদেব বসুর অধিকাংশ গল্প সম্পর্কে কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই প্রতিক্রিয়া পূর্ণাঙ্গ বা আংশিকভাবে প্রয়োগ করা চলে। 'রজনী হল উতলা', 'এমিলিয়ার প্রেম, চোরের কবিতা দেবী, বোন, এরা আর ওরা এবং আরো অনেকে, লুসিললিতা প্রথম ও শেষ প্রভৃতি গল্পের যৌনতার্সবস্বতাবাদ কিংবা কবিত্ব অথবা আগ্নগত ভাষণের মধ্যে বাস্তব জগতের ঘটনা অংশ বিরল বলাই সংগত। বেশীর ভাগ গল্পেই যৌবনাবেগের ধারা মনের গভীর তলার দিকে সুড়ঙ্গ কেটে কেটে এগিয়ে গেছে। বাইরের বাস্তব ঘটনার ধারার আলো বাতাস সেখানে প্রবেশ করতে পারেনি। সেটা তিনি নিজেই চাননি। মগ্ন চৈতন্যের কাল্পনিক সেই পরিবেশ তৈরী না করলে তিনি মার্লামের ফন এর মতো নারী ধর্ষণের সুখ স্বপ্নবিভোর কিভাবে হতেন তাঁর 'রজনী হল উতালা'র মত গল্প? বুদ্ধদেব বসু বাংলা সাহিত্য যেন আত্মমগ্ন যুবরাজ তার কাঙ্খিত সাহিত্য সাম্রাজ্যে বিরংখ্যা তাড়িত পুরুষ রমনীদের রমন রণের বাধাবধানহীন আয়োজন। কাব্য প্রতিভার সুঘ্রাণ স্পর্শে ধন্য হয়েছে বৃদ্ধদেব বসুর অধিকাংশ গল্প উপন্যাস। কবিতার কথা তো বলাই বাহুল্য। তার গল্পের পাত্র-পাত্রী অজস্র সমস্যার ভারে ভারাক্রান্ত সমকালীন সমাজের সঙ্গে দারুনভাবে নিঃস্পর্কিত, বরা সঙ্গতযে তার শিল্প সাহিত্যের সঙ্গে সমাজ বা সমাজের অর্থে রাজনীরত প্রত্যেক বা পরোক্ষ তেমন কেমন কোনো সম্পর্ক নেই। অথচ বুদ্ধদেব বসু তার একা প্রবন্ধে সমকালীন জীবনের সুকঠিন বাস্তবতাকে অস্বীকার করতে পারেনি। প্রগতি মাসিক পত্রে বলা হয় আত 'আধুনিক বাংলা

সাহিত্যে' প্রবন্ধে তিনি বলেন, "অতি আধুনিক সাহিত্যকে সাহিত্য বললে বুদ্ধদেব বসুর রজনী হল উতালার মত গল্পটির অশ্লীলতা বিষয়ে মুখর সবচেয়ে মুখর হয়ে আন্দোলন করেছিলেন সজনীকান্ত দাস। তার সম্পাদিত শনিবারের চিঠি পরবর্তী সংখ্যা থেকেই নানা ব্যঙ্গ বিদ্রুপ ও ব্যক্তিগত আক্রমনও শুরু হয়ে যায়। শনিবারের চিঠির আষাঢ় ১৩৩ এর বিরহ সংখ্যা বা কালপুরুষ নামে অতি আধুনিক লেখকদের বিভিন্ন রচনাকে বিবৃতকার লিখিত একটি ব্যঙ্গ নাট্যে (বেথলরাম গাজনদার দদ্মনামে) সজনীকান্ত লিখেন, দেখিতেছি প্রথম দৃশ্যটি কল্লোলে প্রকাশিত শ্রীযুক্ত বুদ্ধদেব বসু মহাশয়ের একটি গল্প 'রজনী হল উতালা' ও শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত মহাশয়ের কোনো এক উপন্যাসের ঘটনাবিশেষ লইয়া রূপ ধরিয়া উঠিয়াছে। মাত্র সাতশটি সংখ্যা প্রকাশের পরেই স্থগিত হয়ে যাওয়া এই পত্রিকায় সঙ্গে সজনীকান্ত সংযুক্ত হন অষ্টম সংখ্যা, ছদ্মনাম ভাবকুমার প্রধান, কবিতার শিরোনাম আবাহন যদিও আবির্ভাব কালে পত্রিকাটির লক্ষ্য ছিল ভিন্নতর। মেডিকেল কলেজে ডাক্তারি পড়ার জন্য নির্বাচিত হয়েও খেয়ালী আচরণে না অধ্যয়ন করে তাড়িৎ ইঞ্জিনিয়াারিং বিভাগে হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে গিয়েছেন। সেখানে ছাত্রাবাস শৃঙ্খলাবিরোধী কর্মে নেতৃত্বদানের অপরাধে কর্তৃপক্ষের বিরাগভাজন হয়ে পড়েন। একপর্যায়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজ পদার্থ বিদ্যায় ভর্তি হন এমএসএসি পড়ার জন্য। জীবন ও জীবিকার টানেই সেটিও সম্ভব হয়নি বলে গৃহশিক্ষকতায় নামমাত্র উপার্জনকেই প্রদান সম্ভবল করে বিজ্ঞান জগৎ থেকে অর্ন্তহিত হয়ে সাহিত্য সাধনার মধ্য দিয়েই জীবিকা নির্বার্হে মনোযোগী হন।

সজনীকান্তের এই সাহিত্য সমার্পিত হবার পূর্বে বাংলা সাহিত্য আন্দোলনের সাথে নীরদ চৌধুরীর জড়ানোর ব্যাপারটি লক্ষ্য করি। মোহিতলাল মজুমদার তারাই কৃতি ছাত্র অশোক চট্রোপাধ্যায়ের কাছে নিয়ে যান। অশোক চট্টোপাধ্যায় তখন শনিবারের চিঠির কর্ণধার। সম্পাদক যোগনন্দ দাশ ১৯২৪ এর শনিবারের চিঠি সাপ্তাহিক পত্রিকা হিসাবে প্রকাশিত হয়েছে। তার ভাবনা ছিল দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন তথা স্বরাজ্য দলের সমালোচনা। কিন্তু তদান্তীন কল্লোল ভাবনার কিছুটা অনুসারী জনপ্রিয়তার শীর্ষস্থানীধিকারী কবি নজরুল ইসলামেক আক্রমন করার সূত্রে সেটি উদ্দেশ্যেরও বদল ঘটে, শীঘ্রই সমসাময়িক সাহিত্যের প্রতি কটাক্ষ প্রদর্শন তার একমাত্র বৈশিষ্ট্য হয়ে ওঠে। সাপ্তাহিকটির প্রথম সংখ্যাটির প্রথম সংখ্যাতেই অশোক এবং হেমন্ত, 'গাজী আব্বাস বিটকেল' ছদ্মনামে নজরুলকে আক্রমন করেছিলেন, সেই পথেই সজনীকান্ত লিখেছিলেন কামস্কাটায় ছন্দে বিদ্রাহীর প্যারোডি যেটির শিরোনাম ব্যাংত নজরুলী বন্ধ পথে 'শনিবারের চিঠিতে' সজনীকান্তের প্রবেশাধিকার সহজ হয়েছিল, অবশ্য নজরুল মনে করেছিলেন তার সাহিত্য গুরু মোহিতলালই এটির স্রষ্টা। ফলে কল্লোল এ তার

আক্রমনাত্মক কবিতা সর্বনাশের ঘণ্টা মুদ্রিত হল। মোহিতলাল তখন 'দ্রোন শুরু' লিখে শনিবারের চিঠিতে প্রকাশের জন্য দিলেন এভাবেই শনিবারের চিঠির সাথে মোহিতলালের যোগ।

কথিত আধুনিকপন্থী লেখকদের বিরুপ সমালোচনা করতে থাকেন গোলক চন্দ্র ধাধা, ক্ষীনেন্দ্র ধ্রুপদগায়, অনুপ্রাসরগুন সেন, অরসিক রায়, কুড়ুল রাম, গনদাস, বনিক, নব বিষ্ণু শর্মা, নিখিলপ্রিয়া সেন (পুং) বটুকলাল ভট্ট, বস্তিসুন্দর বৎথিক প্রভৃতি নামে। এছাড়া গাজী আব্বাস বিটকেল নামে একাধিক লেখা লিখেছিলেন।

সাতাশতম সংখ্যা প্রকাশের পর সপ্তাহিকীটির বন্ধ হয়ে গিয়ে মাত্র তিনটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করে আবার নীরব হয়ে যায়। প্রায় দশ মাস পরে পুনরাবির্ভাব ঘটে ১৯২৭ সাল থেকে মাসিক হিসেবে। সম্পাদক যোগনন্দ থাকলেও সহকারী হন সজনীকান্ত ছ' মাস পর সম্পাদক হন নীরচন্দ্র চৌধুরী, সজনী কান্ত পান কর্মাধ্যক্ষের পদ। আট মাস চালিয়ে নীরচন্দ্র সম্পাদক পদত্যাগ করলে সজনীকান্ত সম্পাদক মুদ্রাকর ও প্রকাশকের দায়িত্ব পান আমরা আধুনিক সাহিত্য নীরদচন্দ্রের ভূমিকা নিয়ে পরে আলোচনা করবো। শনিবারের চিঠির প্রথম সংখ্যাতেই সজনীকান্ত স্বনামে লিখলেন, 'আধুনিক বাংলা সাহিত্য' নামে প্রবন্ধ। সেই প্রবন্ধে কয়েকজন সমকালীন লেখকের নাম করি সমালোচনা করে সৃষ্টি হল প্রচণ্ড বির্তকের আধুনিকতাবাদী এসব লেখকরা আরো উৎকট লেখা লিখতেন। এটি পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে।

শনিবারের চিঠি'র দু'টি বিভাগ 'মনিমুক্ত' এবং সংবাদ সাহিত্য মূলত অতি আধুনিক সাহিত্যকদের প্রতি আক্রমনের তীব্রতায় সাহিত্য ক্ষেত্র যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হল। সজনীকান্ত লিখিছেলেন।

> "এই কালের শনিবারের চিঠি যাহারা দেখিবার সুযোগ পাইবেন তাহারাই লক্ষ্য করিবেন কি প্রচন্ড বিস্ফোরণনা আমরা মাত্র তিনি চারজনে ঘটাইয়া ছিলাম। আমরা কয়জন একক শনিবারের চিঠি একা বিরুদ্ধ পক্ষ বড় বড় মহারথী একুনে সাতাশটি মাসিক মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্র। চারিদিকে ত্রাহি ত্রাহি রব উঠিয়াছিল; সেকালের অতি আধুনিকতা ও আধুনিকত্বের সমর্থক পত্রিকাগুলির পৃষ্ঠা খুলিলে ইহার পরিচয় মিলিবে

অর্থাৎ কল্লোলপন্থী এসব লেখক যারা সমস্ত জগৎটাকে নেকড়ে বাঘ বা পুতিগন্ধময় নর্দমারূপে উপলব্ধি করেন তাদের সজনীকান্তের হাত হতে নিষ্ক্রান্ত পাবার কোন উপায় ছিল না। সাহিত্যের সূচিতা রক্ষার জন্যই যেন তার কলমী চলত। সজনীকান্তের ভাষায় সাহিত্যে সংস্কারে আঘাত লাগিলে লেখার দ্বারাই যথাসাধ্য আঘাত করিতাম। অর্থাৎ তিনি তথাকথিত অনুকৃত এইসব তত্ত্বের ভিত্তিতে লিখিত সাহিত্যকে প্রচন্ডরূপে ঘৃণা করতেন সেজন্য তিনি যেভাবে গালি দিতেন তার বর্ণনা নীরদচন্দ্র

চৌধুরী স্বীয় স্মৃতিকথায় লিখেছেন, সজনী বাবুই তাহাদের বেশী আক্রমন করিতেন, কিন্তু তাহারা সজনীবাবুকে গালি দিতে ভরসা পাইত না, কারণ তাহার এরকম পাকা খিস্তি আয়ত্ব ছিল যে, সেই অবাচন বালকদের সাধ্যও ছিল না যে ,তাহার সঙ্গে খেউড়ে টেক্কা দেয়।

জগৎ ব্যাপারটা অতিশয় কদর্য এবং তার প্রতি একমাত্র সংগতভাব বিতৃষ্ণতা, একমাত্র উচিত কৃত্য মুখ্য ফিরিয়ে দেওয়া এধারণার অধিকারী চিন্তক ও লেখকদের সজনীকান্ত প্রচণ্ডভাবে উপহাস করতেন। যারা পেতো না তারাই নিজেদের দুর্ভাগা হিসেবে ভাবত। তাদের এই চিন্তার মধ্যেই কিন্তু তাদের কৃত্রিমতার অনুশীলনী ধরা পড়ে।

শনিবারের চিঠি পৃষ্ঠায় লঞ্চিত একজন আধুনিক কবি সমর সেন বলেছেন, আধুনিকদের শ্রদ্ধা করতো বলে শনিবারে চিঠি সবাই পড়তাম। এর একটি সংখ্যা পেলে এখনও পড়ি মেঘনাদবদধ কাব্যের প্রথম কয়েকটি লাইন বিভিন্ন আধুনিক কবিরা কীভাবে লিখবেন তার প্যারডি অতি আধুনিকদের বিরুদ্ধে নেতৃত্ব তার একরোখা মনোভাব এতটাই তীব্র ছিল যে, সজনীকান্তের কর্মধারায় একটা নতুন পথ তৈরী হচ্ছি। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের কথিত বিষ ভাণ্ডের সঙ্গে সুধাপত্র ও তার আয়ত্বে ছিল বলে, কল্লোল বৈরীতায় বিরোধীদের মধ্যে থেকে একে একে সবাইকে দলে টেনে নিতে পেরেছিলেন। অল্পকালের ব্যবধানে আধুনিকপন্থী প্রেমেন্দ্রকে যেমন বন্ধু করে ফেলেছিলেন, সঙ্গে সঙ্গে শৈলজা, ক্রমে ক্রমে নজরুল, পিছু পিছু নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ তার নিত্যসঙ্গী হয়ে উঠেছেন।

যদিও তার সাথে অধুনাতন সাহিত্যক অমঙ্গল বিলাসের সঙ্গে ঘনিষ্টভাবে যুক্ত মধ্যযুগের আদি পাপ সংক্রান্ত পুনরুজ্জীবনের পন্থীরা সজনীর সাথে পারছিল না, তখন তারা অন্য সুরে কথা বলা শুরু করল। অচিন্ত্যকুমারের ভাষায় "আসলে সজনীকান্ত তো কল্লোলেরই লোক ভুল করে অন্য পাড়ায় ঘর নিয়েছে তাই রোয়াকে না বসে বসে বসেছে অন্য রোয়াকে।" হেমেন্দ্রকুমার অবশ্যই কথাকেই আরো জোর দিয়ে বলেছেন, ব্যক্তিগত বিদ্বেষের বশবর্তী হয়ে সজনীকান্তকে কল্লোলের দলকেও আক্রমন করেছিলেন বলে মনে হয় না। সেও ছিল জান শনিবারের চিঠির চাহিদা বাড়াবার জন্যেই তিনি তুলেছিলেন অশ্লিলতার অজুহাত। ব্যবসায়িক চাল ছাড়া আর কিছু নয় কারণ যে শ্রেণির রচনার জন্য তিনি কল্লোলকে আক্রমন করতেন ঠিক সেই শ্রেণির গলই প্রকাশিত হয়েছে শনিবারের চিঠিতে কিন্তু সজনীকান্ত তাঁর আত্মস্মৃতিতে বলেন শনিবারের চিঠির অভিযোগ ছিল অশ্লীলতার বিরুদ্ধে কথাটা ঠিক নয়। আমাদের জেহাদ ঘোষিত হয়েছিল ডানের বিরুদ্ধে ন্যাকামির বিরুদ্ধে দুর্বল ও অধমের লালায়িত সৃজ্জনীলেহনের বিরুদ্ধে।

শনিবারের চিঠি'র সম্পাদক হিসেবে নীরচন্দ্র চৌধুরী ও অতি আধুনিকপন্থীদের সাথে বিরোধে জড়ান। তিনি কথিত আধুনিক কবি যোত্রিত লাল মজুমদারেকে সমালোচনা করতেন যদিও তার শিক্ষক ছিলেন। নীরবচন্দ্র চৌধুরী মোহিতলালকে সাহিত্যতত্ত্ববিদ হিসেবে জ্যেষ্ঠের সম্মান দিয়েছেন। কিন্তু তাকে তিনি চিহ্নিত করেন ঐতিহ্যবাদীরূপে। সেকালের কল্লোল কালিকলমের তরুন লেখকরা শুরু করেছিলেন মোহিতলালকে রবীন্দ্রনোত্তর আধুনিক বলে, নীরদচন্দ্র তাকে মনে করতেন ট্রাডিশনালিষ্ট সমকালীন অতি আধুনিকবাদী তরুণ বোদলেয়ারীয় মতানুসারী লেখক সমাজের তার বিরাগ ছিল অত্যন্ত প্রকট। ভবতোষ দত্ত বলেন, এসব লেখকদের উগ্র বিদ্রোহকে তিনি নেহাতই অন্তসারশূন্য পাশ্চাত্য অনুকরণবলে মনে করতেন।

নবীন লেখকদের আর্দশচ্যুতি নিয়ে প্রবল তর্কবিতর্ক চলছিল। এই উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন তার বহু পরিচিতি সাহিত্য ধর্ম প্রবন্ধটি। প্রবন্ধ লিখে তিনি মালয় ভ্রমনে যান। জাহাজে বসে লিখেন 'সাহিত্য নবত্ব' ১৯২৭ সালে যথাক্রমে 'বিচিত্রা' ও 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত হল। রবীন্দ্রনাথের এই দুটি প্রবন্ধের বক্তব্যকে দুই পক্ষই নিজের নিজের অনুকূলে বলে গ্রহণ করে নিয়েছিলেন। ফলে বির্তকেরও অবসান হল না। রবীন্দ্রনাথ ফিরে এসে জোড়াসাকোর বিচিত্রা ভবনে সাহিত্যেকদের একসভা আহবান করেন। সভায় উপস্থিত ছিলেন আধুনিকতাপন্থী নবীন লেখকরা এবং সনাতন সাহিত্যাদর্শে বিশ্বাসী লেখকরা। দ্বিতীয় দলের পক্ষে, মোহিতলাল মজুমদার, সজনীকান্ত দাশ, নীরদচন্দ্র চৌধুরী, নীরদ তার চৌধুরী তার আত্মজীবনীর দ্বিতীয় খণ্ডে এই সকার যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়েছেন তাতে দেখা যাচ্ছে তিনি এ পক্ষের বক্তব্য বুঝিয়ে বলেছিলেন।

মোহিতলাল উপস্থিত থাকলেও কিছু বলেননি। প্রসঙ্গক্রমে একটি তথ্য এখানে স্মরণ করি। কয়েক মাস আগে প্রকাশিত সাহিত্য নবত্ব প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ মোহিতলালের কবিতার বিশেষত্ব সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছিলেন মোহিতলালেরর পক্ষে অবশ্যই তা শ্লাঘনীয়। সাহিত্যে নবত্ব কি রকম হয় সে দৃষ্টান্ত দিতে মোহিতলালের কাব্যের অকৃত্রিম পৌরুষের উল্লেখ করেছিলেন।

বিচিত্রা সভায় মোহিতলালের কোনো কথা বলেন। বলেছিলেন নীরদ চৌধুরী। কী বলেছিলেন সেটা অবশ্য বিশদ করে বলেননি। তবে তার বলা যে খুব ভালো হয়নি সেটা স্বীকার করেছেন। সেই বলেছেন তার স্তানা এই যে বিরোধীপক্ষের বলা হয়েছিল আরও খারা। রবীনন্দ্রনাথ শান্তভাবে উভয় পক্ষের কথাই শুনলেন। পরে আলোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ যা বলেছিলেন, বিশ্ব ভারতী প্রকাশিত রবীন্দ্ররচনাবলী (২৬ খন্ড) পরিশিষ্টে তা মুদ্রিত আছে।

নীরদ চৌধুরী লিখিছেন তারা সন্তুস্ট হয়ে ফিরে এলেন। কিন্তু শনিবারের চিঠি এরপর বাণ নিক্ষেপ করল প্রমথ চৌধুরী কে লক্ষ্য করে। প্রথম চৌধুরী নাকি এদের বলেছিলেন অপরিণত ও অনভিজ্ঞ। মোহিতলালের কানে কথাটা আসে। তিনি নীরদ চৌধুরীকে জানিয়ে দেন। স্বভাবতই নীর চৌধুরী অভিমান লাগল। কয়েকদিনের মধ্যেই প্রথম চৌধুরী সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ তৈরী করে ফেললেন। শনিবারের চিঠিতে সেটা প্রকাশিত হল। সজনীকান্ত লিখিছেন প্রবন্ধটি মোটের উপর নিরীহ অথচ উচ্চাঙ্গের রচনা। লেখক প্রমথ চৌধুরী ও মানুষ প্রমথ চৌধুরীর রচনা ও চরিত্রগত বেশিষ্ট্য নির্দেশক এমন সরল রেখা আর প্রকাশিত হয় নাই। নীরদ চন্দ্র লেখক ও মানুষের সামঞ্জস্য বিধান করিতে প্রভুত জ্ঞান ও মুনশীয়ানা প্রয়োগ করিয়াছিলেন। লেখাটি শনিচক্রের সবারই খুব উপভোগ্য মনে হয়েছিল, মোহিতলালের তো কথাই নেই। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য ধর্ম প্রবন্ধটি যেমন চাঞ্চল্যে সৃষ্টি করেছিল, নীরদ চৌধুরীর এই লেখাটিও তেমনি চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করল। আক্রমন এল চারদিক থেকে। ধূর্জটি প্রসাদ প্রবোধ বাগচীও আসরে নামলেন। নীরদ চৌরধুর তাতে ক্ষ্যান্ত না হয়ে আবার লিখলেন শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুর জের। সজনী কান্ত ও অন্যান্যরাও যোগ দিলেন। এই স্মরনীয় বিতর্কে নীরদ চৌধুরী ছিলেন পুরোভাগে। বস্তুত এসব ঘটনার অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ, সাহিত্যের দু'টি শাখায় বিদ্রোহ প্রায় যুদ্ধ ঘোষণায় পরিণত হয়েছিল। বাস্তবতার নতুন পসরা নিয়ে নিয়ে 'কল্লোল', কালি-কলম-এর পৃষ্ঠায় নতুন কথাসাহিত্যের যে প্রসার পরিলক্ষিত হয়েছিল, তাদের বিরুদ্ধে তার প্রধান অভিযোগ ছিল। বেআব্রুতার, অশ্লীলতা, তিরিশের দশকে প্রথম দু-এক বছরের মধ্যে যেসব পত্রিকার অবসান হওয়ায়, সে যুদ্ধ শেষ পর্যন্ত শান্তিতে পর্যবসিত হয়েছিল। তাছাড়া তারই আগ্রহে ও পৃষ্ঠপোষকতায় ততদিনে ধীরে ধীরে দেখা দিয়েছেন একে একে তারা শতকর, বনফুল, গোপাল, হালদার, সম্বুদ্ধ, বীরুপাক্ক, পরিমল গোস্বামী, শরবিন্দু বন্দোপাধ্যায়ের মতো লেখকরা। ভট্টাচার্য প্রমুখ লেখক গোঙ্গীর ঘথোচিত সম্মান অর্থ্যর্থনায় সৃজনীকান্ত দাসের অগ্রণী ভূমিকার কথাও অবশ্য উল্লেখ্য। তাঁর ব্যক্তিত্বের আকর্ষণে সমসাময়িক শিল্পীীদের অন্যতম দেবী প্রসাদ রায় চৌধুরী।

প্রমোদ চট্টোপাধ্যায় কিংবা চৈতন্যদেব চট্টোপাধ্যায় তাঁর সঙ্গে আন্তরিকতা স্থাপন করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে 'বঙ্গশ্রী' সম্পাদনার সময় তাঁর মানসভাবনায় যে পরিবর্তন এসেছিল, তাতে তাঁর বিদুষণের ধরণ অনেকটা বদলে গিয়েছিল। এ কথা স্বীকার করা দরকার, 'বঙ্গশ্রী' সম্পাদনায় সজনীকান্তর স্বরূপ অন্যভাবে বিকশিত হয়েছে- 'বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস' রচনার কাজে সুকুমার সেনকে উৎসাহিত করা তাঁর অন্যতম কীর্তি। আসলে, সাময়িক পত্রিকার সম্পাদনার মধ্যে আনন্দ ও কর্তব্য সাধনের যে তপ্তি আছে সেটার প্রতি প্রগাঢ় আকর্ষণে 'চিত্রলেখা', 'বিজলী', 'যুগবাণী', 'নতুন পত্রিকা', 'অলকা',

'যুগান্তার', 'আনন্দবাজার পত্রিকা', শারদীয়, সর্বোপরি 'সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার সম্পাদনায় তিনি নিযুক্ত হয়েছেন।

অতি আধুনিকদের বিরোধিতায় তরুণ কথাসাহিত্যিকদের প্রতি তাঁর উষ্মা প্রশমিত হওয়ার কারণ ছিল, বিরুদ্ধাবাদীদের প্রায় সকলেই তাঁর দলভুক্ত হয়েছিলেন। কিন্তু তিরিশের দশকে প্রথম প্রকাশিত 'পরিচয়' ও 'কবিতাকে অবলম্বন করে যে নতুন কাব্য সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল- তার প্রতি তিনি সমর্থন জানাননি। 'প্রগতি পত্রিকার প্রধান কবি জীবনানন্দকে আক্রমণ করবার ধরণ এই পর্বে তীব্রতা পেয়েছিল আরও কঠিনভাবে। সজনীকান্তের অতি আধুনিকতাবাদীদের ভাজনের বিরুদ্ধে ন্যাকামির বিরুদ্ধে, দুর্বল ও অক্ষমের লীয়ালিত সৃক্কনী লেহনের বিরুদ্ধে' তাঁর এতটাই বদ্ধমূল ছিল যে, ষাটের দশকের শুরুতে, তাঁর জীবনের প্রান্তবেলায় তাই বাংলা কবিতার জনপ্রিয় ও অগ্রগতিকে মান্য মনে করতে পারেননি। নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের সাইত্রিশতম অধিবেশনে প্রদত্ত কাব্য সাহিত্য শাখার সভাপতির অভিভাষণে তাই স্বভাবব্যঙ্গচ্ছলে জানিয়েছিলেন: "আজকাল যে কোনও সাময়িকপত্র, বিশেষ করিয়া একান্তভাবে কবিতার নামে উৎসর্গিত পত্রিকা খুলিলেই কবিতা শিরোনামায় প্রকাশিত বহু বিচিত্র বস্তু দৃষ্টিগোচর হয় যাহার কোনটি পাটিগণিত, কোনটি ইতিহাস, কোনটি গদ্য নিবন্ধ, আবার কোনটি বিজ্ঞাপনের খাতে প্রকাশিত হইলে সঙ্গত ও শোভন হইত। ইহার মধ্যে জাল ও ভেজালের সংখ্যাই বেশি।

N) AvaywbKZvev‘x‡‘i cwZ iex›‘bv‡_i ‘wófw½ I g‡bvfve

সমাজের আমূল পরিবর্তন অর্থে বিপ্লবী রবীন্দ্রনাথ ছিলেন না। কিন্তু কর্মে যমন আধুনিকক ছিলেন তেমনি সমাজ, রাষ্ট্র ব্যক্তি, ধর্ম, শিক্ষা, ইতিহাস, সাহিত্য চিন্তায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আধুনিক এবং আধুনিকতাবাদী একজন সর্বগ্রামী প্রতিভাধীরা বক্তি ছিলেন। সমাজ, রাষ্ট্র, ব্যক্তি, ধর্ম শিক্ষা, সাহিত্য, ইতিহাস ইত্যাদি তাঁর দৃষ্টিতে জনসাধারণের ইতিহাস। ভারত ইতিহাসের আলোচনায় শাস্ত্র ও শাস্ত্রে প্রতাপের বাইরে জনসাধারণের স্তরে বিভিন্ন ধর্মে গোষ্ঠীর মানুষের মিলনের কথা বলেছেন। যা আধুনিক চিন্তারই বহি প্রকাশ। মধ্যযুগের ভক্তসাধক কবীর, দাদু, রজ্জবের মতো মানুষরাই মলিনের প্রেরণা সঞ্চার করেছেন। বাংলা আউল বাউলদের মধ্যে এই প্রেরণা কাজ করেছে। শিক্ষিত জনে লিখিত সাহিত্যের সঙ্গে তিনি লোকসাহিত্যের যোগ ঘটাতে চেয়েছেন। লোক সাহিত্য চর্চায়ও তিনি একজন পথিকৃত। তাঁর সমবায় ভিত্তিক অর্থনীতি চিন্তায় ব্যক্তির স্বার্থে ও সামাজিক কল্যাণের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষার আকাঙ্খাই কাজ করেছে। সম্পত্তিকে ব্যক্তির আত্মপ্রকাশের জন্য প্রয়োযনীয় বলে স্বীকার তিনি করেছেন। কিন্তু ব্যক্তির ধনস্ফীতি যাতে অধিকাংশ মানুষের দারিদ্রের কারণ হতে না পরে, এজন্যই উৎপাদন, ভোগ ও বিপণন সর্বত্র সমবায়নীতির প্রতিষ্ঠ তাঁর কাম্য। ব্যক্তিদমনের জোর জবরদস্তিক অনেক ভালো ব্যবস্থাও পতন ঘটায়। সাম্প্রতিক ইতিহাসে তার অনেক দৃষ্টান্ত মিলেছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁস সময়েই এ বিষয়ে সচতেন হতে পেরেছিলেন। যন্ত্রের উপর মানুষের প্রভুত্ব। কেন্দ্রীভুত ক্ষমতার বদলে তিনি ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের কথা বারবার বলেছেন। তাতে ব্যক্তি মূল্য পায়, আত্মশক্তি মর্যাদা পায়। আধুনিক যন্ত্রযুগে পরিবেশ দূষিত হচ্ছে। পরিবেশ দূষণরোধ নিয়ে তিনি অনেক আগে ভেবেছেন। ভুমির ক্ষয়রোধম সুবাতাস ও বৃষি। টপাতের জন্য অরণ্য সৃষ্টির দিকেও তিনি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। গ্রাম তার গ্রাম্যতা মুক্ত হোক, পূণ্যতালাভের আকাঙ্খায় বদলে এ দেশের মানুষ বৃহৎ সামাজিকতাবোধ থেকে জনহিতকর কর্মে আত্মনিয়োগ করুক-কবির এমনিতর বহু শুভ কামনার মূলে আছে তাঁর আধুনিক মন। জন্ম-নিয়ন্ত্রণ আন্দোলনের নেত্রী মিসেস মার্গারকে সমর্থন করে নারীকে অবাঞ্ছিত মাতৃত্ব ও দেশকে জনসংখ্যা স্ফীততি থেকে মুক্তিদানের প্রতিষ্ঠায় কবি তাঁর উৎসাহ জানিয়েছিলেন। গান্ধীজী স্যাংগারকে ব্রক্ষচর্য ও সয়যমের কথা বলেছিলেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের আধুনিক মন কৃত্রিম বৈজ্ঞানিক উপায়ে জন্ম নিয়ন্ত্রণ পর্যন্ত

এগিয়েছে, ব্রক্ষচর্য ও সংযমের দরজায় তাঁর মন প্রতিহত হয়ে ফিরে আসেনি। একই সঙ্গে মানুষের শুভবুদ্ধির কথাও তিনি মনে করিয়ে দিয়েছেন। নইলে জন্ম নিয়ন্ত্রণের কৃত্রিম পদ্ধতির অনেক অপপ্রয়োগ হবে। মানুষের নীতিনৈতিকতায় জোর দিলেও শিক্ষাব্যবস্থায় তিনি আলাদাভাবে ধর্মশিক্ষার স্থান অস্বীকার করেছেন। প্রকৃতির কাছ থেকে এ শিক্ষা' প্রবন্ধ। তাঁর শিক্ষাচিন্তারও মূল কথা ব্যক্তির মুক্তি, সর্বপ্রকাশ শৃঙ্খল থেকে মুক্তি। শৃঙ্খলাকে তিনি অন্তরের সুষমা বলেই মেনেছেন। ব্যক্তির সর্বাঙ্গীন মুক্তি সাধক রবীন্দ্রনাথ পরিচয় আছে তাঁর গানে- 'আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে'। 'ত্রাসের দাসত্বে' যে ব্যক্তি বাঁধা নয়, যে ব্যক্তি ধুলায় ঘাসে মুক্তি পায়, সে ব্যক্তি রুপকার রবীন্দ্রনাথ গুরু নন, সাধক নন, একজন আধুনিক মানুষ, শাশ্বতভাবে আধুনিক মানুষ।[১]

সাহিত্যের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আধুনিক চিন্তাভাবনায় প্রতিভূ রোমান্টিক ভাবনায় আত্মস্থ ছিলেন। তাঁর দৃষ্টিতে সমন্বয় ধর্মী সংস্কৃতি আস্তা শাশ্বত সত্যে অবিচলিত বিশ্বাস বিত্তদ্ধ সৌন্দর্যচেতনা এবং অতিন্দ্রীয় প্রেমানুভূতি উনবিংশ শতকের ভিরীয় শান্তি ও প্রাচুর্যের যুগ গড়ে উঠেছিল। এর কিছুটা ইংরেজি রোমান্টিক কবিদের নিকট থেকে পেয়েছিলেন, কিছুটা উত্তরাধিকার সূত্রে ভারতীয় ঐতিহ্যের কাছ থেকে।

রবীন্দ্রনাথ রোমন্টিকতা ইংরেজ রোমান্টিক কবিদের অনেক বেশী ব্যাপক, গভীর এবং সম্পূর্ণ এদেশের কথিত আধুনিক কবিরা প্রথম রবীন্দ্রনাথের মধ্যে আশ্রয় খুজলেন। সাহিত্য আকাশে তখন রবীন্দ্রনাথ সর্বগ্রাসী প্রভিভা নিয়ে দেদীপ্যমান। রবীন্দ্রনাথের জীবনে ও শিল্পো উনবিংশ শতাব্দীর মূল্যবোধগুলো একটি অপূর্ব পূর্ণ লাভ করেছিল। কিন্তু তাদের আত্মপ্রকাশের সাথে বাধা মনে করলেন। এ প্রসঙ্গে কবি সুধীন্দ্রনাথ মন্তব্য প্রসঙ্গনীয়:

''রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যে যে দেশ ও কালের প্রতিবিম্ভ পরে, তার সঙ্গে আজ কালকার পরিচয় এত অল্প যে তাকে পরীর দেশ বললেও বিস্ময় প্রকাশ অনুচিত।

নতুন সৃষ্টির তাগিদে এবং নবীনদের প্রতিষ্ঠার গরজে রবীন্দ্র সৃষ্টির প্রচণ্ড প্রভাবকে অতিক্রম করে যাওয়ার চেষ্টায়রত আধুনিকতাবাদীদের তিনি কী চোখে দেখেছিলেন তা আমাদের এ অধ্যায় আলোচনা বিষয়।

সাহিত্য আধুনিকতার সাথে বাস্তবতা বা বাস্তব প্রসঙ্গটি অত্যন্ত উচ্চস্বরে আওয়াজ নিদান করে অবস্থান করে। রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে বাস্তবতা বস্তুতন্ত্র ইত্যাদির অভাবকে দায়ী করে বিতর্ক সৃষ্টি করা হয়।

১৩১৮ বঙ্গাব্দে (১৯১১) রবীন্দ্রনাথসাহিত্য কেন্দ্র করে শুরু হয় বাস্তবতবাদী বিতর্ব। রবীন্দ্রবিরোধী সমালোচকেরা রবীন্দ্রনাথকে রবীন্দ্রনাথকে 'বস্তুতন্ত্রতা' শুণ্য ও কাল্পনিক সাহিত্যসৃষ্টির অভিযোগে অভিযুক্ত করেন। এই সমালোচকদের মধ্যে প্রধান ছিলেন বিপিনচন্দ্র পাল ও রাধাকমল মুখোপাধ্যয়। রবীবন্দ্রনাথের বাস্তববিমুখতা ও কল্পনাসর্বস্বতা নিয়ে বিশশতকের দ্বিতীয় দশকে যে বিতর্কের সূত্রপাত ঘটে, তা-ই বাংলা সাহিত্যে বাস্তবতা উপস্থানার মানদণ্ডে সাহিত্যের মূল্য যাচাইয়ের প্রথম প্রয়াস। মোটামুটিভাবে ১৩১৮ থেকে ১৩২২ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত সময় রবীন্দ্রসাহিত্যের বাস্তবতাবিষয়ক এ বিতর্কের স্থায়িত্বকাল। এ-পর্যন্ত সময রবীন্দ্রনাথকে প্রতিপাদন করতে হয় সে তিনি বাস্তবতার উপস্থাপক; তবে ওই বাস্তবতা বাহ্যবাস্তবতার অনুলিপিমান নয়, তা কবিহৃদয়ের উপলব্ধিজাত 'সত্য' বা বাস্তবতা। তিনি বলেন, বস্তুজগতের অনুলিপি করায় উৎসাহী উপলব্ধি করে, কবি চিত্রণ করেন সে সত্য বা বাস্তবতাকে। তাঁর মতে কবির উপলব্ধিজাত সত্য ও বাস্তবতার উপস্থাপন প্রসঙ্গে সবপ্রথম মন্তব্য করেন প্রিয়নাথ সেনকে লেখা চিঠিতে। ১৩০৭ বঙ্গাব্দে (১৯০০ খ্রিস্টাব্দ) লিখিত এ-চিঠিগুলোতে রবীন্দ্রনাথ বাস্তবতাসম্পর্কে যে-মন্তব্য করেন, তাকে রবীন্দ্রনাথের বাস্তববিষয়ক নিরপেক্ষ অভিমত বলে গণ্য করা যায়। পরবর্তী সময়ে যখন তিনি বিরেরধীদের অভিযোগ খণ্ড করে নিজেকে বাস্তবতামনস্ক ব'লে প্রমাণিত করায় তৎপর হয়েছেন, কিংবা আরো পরে আধুনিক কথাসাহিত্যিকদের বাস্তবতার সকল স্তরের চিত্রণকে অশিল্পিত ও অসাহিত্যিক ব্যাপার বলে রায় দিয়েছেন, তখন তাঁ বাস্তবতাবিষয়ক ধারণা ও ব্যাখ্যা এক রকম থাকেনি। তাঁর বাস্তবতা ব্যাখ্যাও নিরপেক্ষ থাকেনি। বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন বিষয়কে বাস্তবতা বলে নির্দেশ করেছেন রবীন্দ্রনাথ, এতে অকেটা নিজের সুবিধামতো ব্যাখ্যা তৈরি করার ঝোঁকও লক্ষ্য করা যায়। বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন বিষয়কে বাস্তবতা বলে নির্দেশের এই প্রবণতা থেকে বোঝা যায় বাস্তবতা নিয়ে রবীন্দ্রনাথ কখনো স্বস্তিবোধ করেননি। 'বাস্তবতা' পরিভাষাটি ব্যবহারেও রবীন্দ্রনাথ সুস্থির ছিলেন না। প্রিয়নাথ সেনকে লেখা চিঠিতে (১৩০৭) রবীন্দ্রনাথ 'যরিয়ালিজম' পরিভাষাটি ব্যবহার করেন বাহ্যবাস্তবতা এবং 'রিয়াল মানুষ' শব্দটি দিয়ে

প্রাত্যহিক বাস্তবতা সাধারণ মানুষকে নির্দেশ করেন। আবার 'সাহিত্যধর্ম' (১৩৩৪) প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ 'রিয়াল' শব্দটির প্রতিশব্দ করেন 'যথার্থ' বা 'সার্থক'।[২] কবিচিত্তে যে-সত্য উপলব্ধি করে এবং কবিদৃষ্টি বস্তুকে যেভাবে দেখে, তাকেই 'রিয়াল' বা 'যথার্থ' বা 'সার্থক' বলে অভিহিত করেন রবীন্দ্রনাথ। 'রিয়ালিজম' 'রিয়াল' প্রভৃতি শব্দ ব্যবহারেও সুস্থিরতায় অভাব থেকে স্পষ্ট হয় যে বাস্তবতা প্রসঙ্গে তিনি স্বস্তিবোধ করেন নি।

প্রিয়নাথ সেনকে লেখা চিঠি রবীন্দ্রনাথের যে-বাস্তবতা ধারণা প্রকাশ ঘটেছে, তাতে স্ববিরোধিতা লক্ষ্য করা যায়। একাবার তিনি মন্তব্য করেন যে বাহ্যবাস্তবতা ও প্রাত্যহিক বাস্তবতার সাধারণ মানুষ অসম্পূণ ও অমার্জিত। সাহিত্যে এই অমার্জিত বাস্তবতা প্রাথমিক উপাদানরূপে গ্রহণ করা চলে, তবে কল্পনা সহযোগী একে সম্পূর্ণ বা আদর্শায়িত ক'রে কাব্যে উপস্থাপিত করতে হয়। রবীন্দ্রনাথ বাস্তবতাকে কল্পনার মিশ্রনে সাহিত্যের প্রাথমিক উপদান বলে মনে করেন এবং তাঁর মতে এই বাস্তবতাকে সাহিত্যের নতুন ক'রে সষ্টি করতে হয়; তাকে করে তুলতে হয় সম্পূর্ণ সৃষ্টি। তিনি বলেন, 'কোন রিয়াল মানুষ প্রত্যহ আমাদের কাছেযেরকম প্রতীয়মান সেরকমভাবে কাব্য স্থান পাবার যোগ্য নয়। কারণ রিয়াল মানুষকে যথার্থ ও সম্পূর্ণরূপে জানাবার শক্তি আমাদের না থাকাতে আমরা তাকে প্রতিদিন খণ্ডিত বিক্ষিপ্ত এবং অনেকসময় পূর্বাপর বিরোধীভাবে না দেখে উপায় পাইনে-কাজেই তাকে নিয়ে কাব্যে কাজ চলে না। সুতরাং কাব্যে বাহির নানাদিক থেকে নানা উপকরণ আহরণ করতে হয়। 'ভাষা ও ছন্দ' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ 'সত্য' সম্পর্কে যা বলেছেন, তাই তাঁর বাস্তবতা সম্পর্কে ধারণা:

সেই সত্য যা রচিব তুমি,

ঘটে যা তা সব সত্য নহে। কবি, তব মনোভুমি

রামের জন্মস্থান, অযোধ্যার চেয়ে সত্য জেনো।[৩]

অন্য একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ বলেন যে নগ্ন বাহ্যবাস্তবতার উন্মুক্ত উপস্থাপনা সাহিত্যে অবশ্যই ঘটতে পারে। তিনি বাহ্যবাস্তবতার অবিকল উপস্থাপনাকে 'Realism ব'লে অভিহিত করেন । তিনি চিঠিতে নগেন্দ্র গুপ্তের একটি উপন্যাস আলোচনাকালে এ মন্তব্য করেন। নগেন্দ্রগুপ্তের ওই উপন্যাসে বাস্তবতার নিঃসঙ্কোচ নিরাবরণ প্রকাশ ঘটেনি বলে

রবীন্দ্রনাথ ক্ষুব্ধ হন। তিনি বলেন, 'নগেন্দ্র গুপ্তের তপস্বিনী পড়ে দেখলম। ঠিক হয় নি। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে বাঙ্গলা উপন্যাসে তিনি উন্মুক্ত Realism এর অবতারণা করতে যাচ্ছেন। তাতে আমি কিছুই আপত্তি করিনে। কিন্তু সেটা পারা চাই। যেমন নাচতে বসে ঘোমটা বসে ঘোশটা সাজে না, তেমনি এরকম বিষয় লেখতে হলে হাতে কিছু রাখা চলে না। সম্পূর্ণ নির্ভিগ্ন নগ্নতা ভালো, কিন্তু স্বল্প আবরণ রাখতে গেলেই আব্রু নষ্ট হয়। এ বইয়ে তাই হয়েছে। গ্রন্থকার সাহসপূর্বক সবকথা পরিষ্কারভাবে শেষ পর্যন্ত বলতে পারেনি, সেইজন্য তার Selfconcioas ভাব প্রকাশিত হয়ে রচনাটিকে লজ্জিত করে তুলেছে। নগেন্দ্রবাবু তাঁর ঘটনা বিন্যাসের স্বাভাবিক পরিণামের পূর্বেই হঠাৎ থেমে যাওয়াতে বোঝা যাচ্ছে নিঃসঙ্কোচ নিবারণ তাঁর লেখনীর পক্ষে সহজ নয়, ওটা তিনি জবরদস্তি করে করেছেন। ফর ইনস্ট্যান্স সেই বিধবা মেয়েটার সঙ্গে একজন ছোকরার ঘনিষ্ঠতার কথা যদি উত্থাপন করলেন তবে তার অন্তোষ্টি সৎকার না করে ছাড়লেন কেন? ও রকম স্থলে যা হতে পারে সেটাকে সরলভাবে তার সম্পূর্ণ বীভৎসমূর্ত্তিতে পরিস্ফুট করলেন না কেন? এ সব জিনিষ তিনি ছুঁতে ঘৃণা করেন অথচ নাড়তে প্রবৃত্ত হয়েছেন, সেইজন্য সবকথা ভাল করে প্রকাশ করতেও পারেননি, ভাল করে গোপন করতেও পারেন নি।' এ সময় রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যে বাস্তবতার উপস্থাপনা প্রসঙ্গে দু'রকম ধারণা পোষণ করছেন। তিনি মনে করেন বাস্তবতা প্রাথমিক উপদানস্বরূপ গৃহীত হতে পারে, কবি কল্পনা সহযোগ তাকে করে তুলবেন সুন্দর ও সম্পূর্ণ বাস্তব। বঙ্কিমচন্দ্রের মতোই তাঁরও বিশ্বাস বাস্তবতা অসম্পূর্ণ ও সামান্য। শুধুমাত্র কল্পনার মিশ্রণেই তাকে সম্পূর্ণ করে তোলা সম্ভব। আবার সাহিত্যে বাস্তবতার নিঃসঙ্কোচ নিবারণ উপস্থাপনার অনুমোদনও করেন তিনি। তিনি মনে করেন 'নির্ভীক নগ্নতা ভাল'। রবীন্দ্রনাথের বাস্তবতা বিষয়ক এ-ধারণা ও দৃষ্টিভঙ্গি পরে সম্পূর্ণ বদলে যায়। বাস্তবতার নগ্ন নিবারণ অসঙ্কোচ প্রকাশকে তখন তিনি অশিল্পিত ব্যাপার ব'লে নিন্দা করেন।[৪]

চৈত্র ১৩১৮-র বঙ্গদর্শন পত্রিকার মুদ্রিত হয় বিপিনচন্দ্র পালের প্রবন্ধ 'চরিতচিত্রে রবীন্দ্রনাথ'। বিপিনচন্দ্র এ-প্রবন্ধে রবীন্দ্রসাহিত্যকে 'বস্তুতন্ত্রহীন' ব'লে অভিযুক্ত করেন এবং রবীন্দ্রসাহিত্যের বস্তুতন্ত্রহীনতা নির্দেশে ব্যাপৃত হন। তাঁর মতে রবীন্দ্রনাসাহিত্য বস্তুতন্ত্রহীন এ-কারণে যে তাতে বাস্তবতার ব্যাপক চিত্রণ ঘটেনি। এর জন্য তিনি রবীন্দ্রানাথের অভিজাত পরিবারে জন্মগ্রহণ ও ওই প্রতিবেশের গণ্ডিতে আবদ্ধ থাকার সংকীর্ণ মানসিকতাকে দায়ী

করেন। তিনি বলেন প্রকৃত বাস্তবতার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ ও গভীর পরিচয় ছিলো না। সাধারণত সমাজের অভিজাত সম্পদায় তাদের উচুঁ প্রসাদের ছাদ থেকে দরিদ্র জীবনকে দেখে থাকে। সুউচ্চ চোখে পড়ে। ওই চালার নীচে এবং জঞ্জালপূর্ণ ক্ষুদ্রকুটির প্রাঙ্গনে যে-আশা-ভয়, অনটন-ক্লেশ, লোভ-ত্যাগের স্রোত বয়ে চলে তা তাদের চোখে পড়ে না। তা দেখঅর অন্তর্দৃটিষ্ট এবং অবকাশও তাদের থাকেনা। নিজেদের ভোগবিলাসপূর্ণ সখ্য সৌখিনতার জাগৎই তাদের কাছে প্রত্যক্ষ ও সত্য, এবং ওই জীবনের বৃত্তেই তারা বন্দী হয়ে থাকে। তাই বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর সাধারণ জীবন তাদের কাছে থাকে অজ্ঞতা ও অপ্রত্যক্ষ। রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। অভিজাত জীবন ও প্রতিবেশে বেড়ে-ওঠা রবীন্দ্রনাথের পক্ষে বৃহত্তর দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনবাস্তবতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ও ব্যাপক পরিচয়ের সুযেগ যেমন হয় নি, তেমনি রবীন্দ্রনাথেরও ইচ্ছে ছিলোনা ওই বাস্তবতার সঙ্গে নিবিড় পরিচয় করার। রবীন্দ্রনাথ তাই সাধারণ জীবনবাস্তবতাকে দেখেছেন দূর থেকে আবেগ ও কল্পনার দৃষ্টিতে। বিপিনচন্দ্র মনে করেন, যেহেতু সাধারণ জীবনবাস্তবতা সম্পর্কে রবীনাথের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সামান্য, তাই তাঁর রচনা বাস্তবঘনিষ্ঠ নয়, তাঁর সকল রচনাই কাল্পনিক সৃষ্টি। তিনি বলেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর রচনা বাস্তবতা প্রাথমিক উপাদানস্বরূপে গ্রহণ করেন এবং কল্পনার মিশ্রণে ওই বাস্তবতা পুন: সৃষ্টি করেন, তাই ওই সাধারণ জীবনবাস্তবতা তাঁর কাব্যে মধুর ও স্বপ্নময় বলে বোধ হয়। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে বিপিনচন্দ্র বলেন,‘ রবীন্দ্রনাথ শতরঞ্জ গালিচামণ্ডিত ত্রিতল প্রাসাদকক্ষে বসিয়ো, মানসচক্ষে কর্দ্দমমর্দ্দিত পিচ্ছল পল্লীপথ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। সুচিক্কনবপু, সুমার্জিত রুচি স্বজনবর্গে পরিবৃত থাকিয়া, সুদূর দরিদ্রপল্লীর শুষ্কদেহ রুক্ষকেশ নরনারী সকলের অপূর্ব্বক তৈলচিত্রে অঙ্কিত করিয়াছেন।’[৫] রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিকে তিনি ‘মায়িক’ বলে অভিহিত করেন,[৬] কারণ তাঁর মতে রবীন্দ্রনাথ শুধু সাধারণ মানুষের আবেগগত জীবনের চিত্রণ করেন, তাদের হৃদয় সঙ্কটও টানাপোড়েনের পরিচয় তুলে ধরেন; কিন্তু ওই ‘পূর্ণ কুটিরের জীর্ণকন্থার কীটাণুলীলা ও শীর্ণদেহ, দীর্ণ প্রাণ কুটিরবাসীদিগের কলহ-কোলাহল’ বা প্রাত্যহিক জীবনবাস্তবতার নগ্ন নিরপেক্ষক উপস্থাপন করেন নি।[৭] ফলে রবীন্দ্রনাথের ‘কাব্য যেমন কচ্চিৎ বস্তুতন্ত্র হইয়াছে, তাঁর চিত্রিত লোকচরিত্রেও অনেকসময় এই বস্তুতন্ত্রতার অভাব দেখিতে পাওয়া যায়।’[৮] তবে বিপিনচন্দ্রের মতে রবীন্দ্রনাথ যেখানে তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বা নিজের শ্রেণীচরিত্রের চিত্রণ করেছেন, সেখানে তাঁর রচনাৎ

অসাধারণ বস্তুতন্ত্রতা লাভ কররিয়াছে।'[৯] কিন্তু সাধারণ জীবনবাস্তবতা ও লোকচরিত্রের উপস্থাপনার রবীন্দ্রনাথ সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছেন।

রবীন্দ্রসাহিত্যের বাস্তবতাবিষয়ক এ-আলোচনায় বিপিনচন্দ্র পালের বাস্তবতা ধারণা ও সাহিত্যে বাস্তবতা উপস্থাপনা বিষয়ক মতামত পরিস্ফুট হযে উঠেছে। বিপিনচন্দ্র সমাজবাস্তবতার সকল অংশে ও জীবনের সকল দিকের যাথাযথ ও অনুপুঙ্ক উপস্থাপনার পক্ষপাতী। বাস্তবাতাকে কল্পনার মিশ্রণে নতুন করে সৃষ্টি করা হলে বাস্তবতার মহিমা ও চরিত্র নষ্ট হয় ব'লে তিনি মনে করতে ব্যর্থ হয়েছেন, কারণ ওই দরিদ্র সাধারণের হৃদয়াবেগ ও মনোগত সঙ্কটের কাল্পনিক গাথা রচনা করেছেন মাত্র। রবীন্দ্রনাথের বাস্তবতা বিষয়ক বিপিনচন্দ্রের এ-অভিমতের প্রতিধ্বনি শোনা যায় রাধাকমল মুখোপাধ্যায়ের 'লোকশিক্ষক বা জননায়ক' (১৩২১) প্রবন্ধে। তিনিও 'বস্তুতন্ত্রহীণ' বলেই এ-সাহিত্য 'সার্বজনীন নহে'। বিরোধী এই সমালোচকদের অভিযোগ খণ্ডনের দায়িত্ব শুধু রবীন্দ্রনাথ পালন করেন নি, রবীন্দ্রনুরাগী বিভিন্ন সমালোচক-প্রাবন্ধিক যেমন, প্রথম চৌধুরী, অজিতকুমার চক্রবর্তী প্রমুখও পালন করেন।

বিপিনচন্দ্র পাল রবীন্দ্রসাহিত্যের বিরুদ্ধে 'বস্তুতন্ত্রহীনতা'র যে অভিযোগ আনেন, তা খণ্ডনে এগিয়ে আসেন অজিতকুমার চক্রবর্তী। 'রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য ও দেশচর্য্যা খণ্ডনের পাশাপাশি রবীন্দ্রসাহিত্যের বৈশিষ্ট্য ও অন্যন্য নির্দেশ করেন। তিনি সাহিত্যে বাস্তবতার উপস্থাপনা প্রসঙ্গেও অভিমত জ্ঞাপন করেন। অজিতকুমার বলেন, রবীন্দ্রসাহিত্যে সমাজবাস্তবতার অবিকল ও ব্যাপক উপস্থাপনা ঘটে নি বলেই ওই সাহিত্যকে বস্তুতন্ত্রহীন বলা যাবে না। রবীন্দ্রসাহিত্যে আছে আদর্শবাস্তবতার উপস্থিতি। তিনি বলেন সাহিত্য জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কিত এ-অর্থে যে সাহিত্য জীবনবাস্তবতা থেকে উপাদান গ্রহণ করে। কিন্তু ওই উপাদানরাশ এবং আদরূপে সাহিত্যে উপস্থাপিত হতে পারে না, তারণ অকিতল উপস্থাপনার মধ্যে দিয়ে কখানো শিল্পগুণসমৃদ্ধ সাহিত্য সৃষিট করা যায় না। বাস্তবতাকে সাহিত্যে তুলে ধরতে হয় পরিশোধিত রূপে, তবেই শিল্পসৃষ্টি সম্ভব। সাহিত্য জীবনবাস্তবতার পরিশোধিত, পরিমর্জিত ও আদর্শায়িত রূপ বলে তিনি মনে করেন। রাবীন্দ্রসাহিত্যে বাস্তবতার আদর্শয়িত রূপের পরিচয় পাওয়া যায়। এখানেই রবীন্দ্রসাহিত্যের অন্যান্যতা। অজিতকুমার সাহিত্যে শিল্পিত বাস্তবতা বা মহৎ আদর্শে উপস্থাপনায় বিশ্বাসী। তিনি বলেন, 'জীবন আপনাকে

সাধারণত যেমনভাবে প্রকাশ করে, সাহিত্যের প্রকাশ তাহার অনুরূপ হয় না। সাহিত্যে জীবনচিত্রে সুখে হউক দুঃখে হউক পরিণামে একটি বৃহৎ শান্তির আদর্শ থাকা চাই। .... একটা বড় পরিণামের মধ্যে মেশা চাই-কিন্তু মানবজীবনে সংসারের ক্ষেত্রে মানুষের মনের এই পরিপূর্ণ অভিব্যক্তিটি কি সকল সময় দেখা যায় ঃ না– সেইজন্যই তো জীবন এবং সাহিত্য কএক জিনিষ নয়– জীবনের বাস্তবিকতা সাহিত্যে নাই এবং সাহিত্যের ভাবসম্পূর্ণতা জীবনে নাই অথচ সেইজন্যই আবার পরস্পরকে পরস্পরের প্রতি প্রয়োজন।'[১০] তিনি মনে করেন জীবনের 'বাস্তবিকতা' ও সাহিত্যের 'ভারসম্পূর্ণতা'র শ্রিণই সাহিত্যের লক্ষ্য। রবীন্দ্রনাসাহিত্যে এ-দুয়ের মিশ্রণ ঘটেছে এবং ও সাহিত্যে জীবনের 'মহৎ আদর্শ'– এর কথা আছে। বিপিনচন্দ্র অভিযোগ করেন যে পল্লীজীবন ও সাধারণ জীবনবাস্তবতা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাতের প্রত্যক্ষ ও ব্যাপক অভিজ্ঞতা ছিলো না ব'লেই জীবনবাস্তবতা বস্তুতন্ত্রহীন; এবং রবীন্দ্র সাহিত্যে বাস্তবতার মধুর অংশটুকুর চিত্রণ ঘটেছে মাত্র। অজিতকুমার এ অভিযোগ খণ্ডন করতে গিয়ে যে যুক্তি দেন, তাতে তাঁর ভাববাদী ও সমাঞ্জস্যবাদী মানসিকতার পরিচয় ধরা পড়ে। তাঁর মতে বাস্তবতার দারিদ্র, দুঃখ, রূঢ়তা বা হুলটুকু সত্য ন্য, জীবনের মধু বা স্বপ্ন-কল্পনা-হৃদয়াবেগই সত্য বা আসল। তিনি বলেন রচনাকে 'অসম্ভব ও মায়িক বলিবার কোন হেতু নাই। ''ঘটে যা তা সব সত্য নহে।" সুতরাং প্রত্যক্ষ সংসারে যে হুলটুকু পাওয়া যায়, সাহিত্যে সে হুলটুকু ঢাকা পড়ে সম্পূর্ণতার আদর্শ না থাকিত, তবে সংসার তাহাকে এত আদর করিত না'।[১১] অজিতকুমার চক্রবর্তী সাহিত্যে বাস্তবতার নগ্ন নিরাবরণ উপস্থাপনার বিরোধী। তাঁর মতে বাস্তবতার নিরপক্ষে চিত্রণ নয়, 'সম্পূর্ণতার আদর্শ' তুলে ধরাই সাহিত্যের লক্ষ্য। রবীন্দ্রনাথের কাব্য ও গল্পে পাওয়া যায় ওই সম্পূর্ণতার আদর্শ। এখাইে ওই সাহিত্যের শ্রেষ্ঠত্ব।

রাধাকমল মুখোপাধ্যায় 'লোকশিক্ষক বা জননায়ক' জ্যৈষ্ঠ ১৩২১ প্রবাসী) প্রবন্ধে রবীন্দ্রসাহিত্যের বিরুদ্ধে তিনটি অভিযোগ তোলেন:

GK: রবীন্দ্রসাহিত্য বস্তুতন্ত্রহীন,

'B: এ-সাহিত্য জনসাধারণের উপযোগী নয়;

‖Zb: এ-সাহিত্যকে লোক-শিক্ষার কাজে ব্যবহার করা যাবে না। রাধাকমল সাহিত্যে সমাজবাস্তবতার অবিকল উপস্থাপনার পক্ষপাতী এবং বিশ্বাসী সাহিত্যের উপযোগীতাবাদে। তিনি মনে করেন সাহিত্যসৃষ্টির মধ্যদিয়ে লেখক মূলত লেকশিক্ষা দেয়ার দায়িত্ব পালন করবেন এবং লোকশিক্ষক হয়ে ওঠাই হবে লেখকের লক্ষ্য। তাঁর মতে রবীন্দ্রসাহিত্য সাবজনীন নয়; কারণ এ-সাহিত্যে এ-দেশের বৃহত্তর দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সমস্য-সঙ্কোটের উপস্থাপন ঘটে নি। ওই সঙ্কট-সমস্য সমাধানের কোনো পথও রবীন্দ্রনাথ নির্দেশ করেন নি। এ-কারণেই এ–সাহিত্য অসম্পূর্ণ ও অবাস্তব ও বস্তুতন্ত্রহীন; এবং এ-কারণেই এ-সাহিত্য লোকশিক্ষার দায়িত্ব পালনের যোগ্যতা রাখে না। রবীন্দ্রসাহিত্যেল বস্তুতন্ত্রহীন স্বরূপ নির্দেশ ক'রে তিনি বলেন 'রবীন্দ্রনাথ যে জগৎ গড়িয়েছেন তাহা ভাবের রাজ্য, তাহার সহিত বাস্তবজীবনের সামঞ্জস্য নাই।....তাঁহার সবই সুন্দর, সবই মহৎ, শুধু তাহা সজীবন নহে। রবীন্দ্রসাহিত্য বস্তুতন্ত্রহীন।... বস্তুর জগৎ গড়িতে পারেন নাই, তাঁহার জগৎ স্বপ্নের জগৎ, তাহা তাঁহার কল্পনায় ধারণা হইয়াছে মাত্র, জাতি হৃদয়ে স্থান পায় নাই। কারণ প্রকৃত জাতি তো কয়েকজন ইংরেজি শিক্ষিত উকিল ব্যারিস্টার মাস্টার কেরাণী সম্পাদক লইয়া নহে। বাঙ্গালী জাতিকে চিনিতে হইলে পর্ণ কুটীরবাসী অশিক্ষিত কৃষ্ণক, তাঁতি জেলে, মজুর, কামার, তেলি ও নাপিতের অভাব ও অভিযোগ, আশা- আকাঙ্খা জানিতে হইবে'।[১২] রাধাকামালের যুক্তি হচ্ছে রবীন্দ্রসাহিত্যে অশিক্ষিত দরিদ্র সাধারণের জীবনবাস্ততার চত্রিণ ঘটেনি এবং রবীন্দ্রনাথ শুধু সমাজের একটি ক্ষুদ্রাংশের বৃত্তান্ত রচনা করেছেন, তাই রবীন্দ্রসাহিত্য বস্তুতন্ত্রীহন, অসম্পূর্ণ ও সীমাবদ্ধ।

রাধাকমলের এ-প্রবন্ধ প্রকাশিত হবার পর রবীন্দ্রসাহিত্যের বাস্তবতা ও সাহিত্যে বাস্তবতার উপস্থাপনা বিষয়ক বিতর্ক প্রবণ হয়ে ওঠে এবং বাস্তব বিষয়ক বিতর্ক এক সময় হয়ে ওঠে সাহিত্যের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বিষয়ক এ-বিতর্ক। বিরোধী সমালোচকের অভিযোগ খণ্ডন করে রবীন্দ্রনাথ লেখেন একাধিক প্রবন্ধ। এ-সব প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ তাঁর রচনার বিরুদ্ধে আনীত বস্তু তন্ত্রহীনতার অভিযোগ খণ্ডনের পাশাপাশি সাহিত্যের লক্ষ উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেন একই রকম ভূমিকা পালন করেন রবীন্দ্ররাগী প্রমথ চৌধুরীও। রাধাকমলের 'লোকশিক্ষক বা জননায়ক' প্রবন্ধের প্রত্যুত্তররূপ রবীন্দ্রনাথ লেখেন 'বাস্তব নামক প্রবন্ধ। প্রবন্ধটি শ্রাবণ ১৩২১ বঙ্গাব্দের সবুপত্রে প্রকাশিত হয়। এ-প্রবন্ধে রবীন্দ্রথ সাহিত্যের বস্তুতন্ত্রতা বা বাস্তবতা সম্পর্কে তার

অভিমত ব্যক্ত করেন এবং লেখকের ভূমিকা সম্পর্কেও বক্তব্য প্রকাশ করেন। রবীন্দ্রনাথের মতে স্রষ্টা বেদনাময় চৈতন্য দিয়ে যে-সত্য উপলব্ধি করেন এবং কাব্যে যে-সত্য বিধৃত করেন, তা-ই চরম বাস্তব। তিনি মনে করেন নানা প্রয়োজনের কোলাহলপূর্ণ প্রাত্যহিক বাস্তবতার চিত্রণ কখনো সাহিত্যেসৃষ্টিস্বরূপে গণ্য হতে পারে না। তা কোলাহলের গাথা, সাহিত্য নয়। প্রাত্যহিক বাস্তবতার অবিকল উপস্থাপনা কাব্যকে বাস্তবঘনিষ্ঠ করে তোলো উপায় নয়। কাব্যের বাস্তবতার ভিন্ন ব্যাপর। রবীন্দ্রনাথ মনে করেন কবি তাঁর বেদনাময় চৈতন্য দিয়ে বিশ্ববস্তু ও বিশ্বরসকে নিজের জীবনে যেভাবে উপলব্ধি করে থাকেন, নিখিলের সংস্রবে এস যেভাবে জগৎ ও জীবনকে উপলব্ধি করে থাকেন, তা-ই ও একান্ত বাস্তব। এই বাস্তবতা নিত্যকালের ও চিরন্তন। কিন্তু বাইরের বস্তুর হাটের বস্তবতার নিত্যতা নেই, এবং বাস্তবতা সম্পর্কিত ধারণা ও বস্তুর মূল্য নিমত পরিবর্তণশীল। রবীন্দ্রনাথ বলেন:

কবি যদি একটি বেদনায় চৈতন্য লইয়া জন্মিয়া থাকেন, যদি তিনি নিজের প্রকৃতি দিয়াই বিশ্বপ্রকৃতি ও মানব প্রকৃতির সহিত আত্মীয়তা কমিয়া থাকেন, যদি শিক্ষা অভ্যাস প্রথা শাস্ত্র প্রভৃতি জড় অবরণের ভিতর নিখিলের সংস্রবে যাহা অনুভব করিবেন তাহার একান্ত বাস্তবতা সম্বন্ধে তাহার মনে কোনো সন্দেহ থাকিবে না। বিশ্ববস্তু ও বিশ্বাসকে একবারে অব্যবহিভাবে হাটে বস্তু দর নিজের জীবন উপলব্ধি করিয়াছেন, এইখানেই তাঁহার জোর।... বাহিরের হাটে বস্তুর দর কেবল উঠা-নামা করিতেছে-সেখানে নানামুনির নানা মত, নান া লোকের নানা ফরামাশ, নানা কালে নানা ফ্যাশন। বাস্তবের সেই হট্টগোলের মধ্যে পড়িলে কবির কাব্য হাটের কাব্য হইবে। তাঁহার অন্তরের মধ্যে যে ধ্রুব আদর্শ আছে তাহারই পরে নির্ভর করা ছাড়া অন্য উপায় নাই। সেই আদর্শ হিন্দুর আদর্শ বা ইংরেজের আদর্শ নয়, তাহা লোকহিতের এবং ইস্কুল-মাস্টারের আদর্শ নহে। তাহা আনন্দময়, সুতরাং অনির্বাচনীয়। কবি জানেন, যেটা তাঁহার কাছে এতই সত্য সেটা কাহারো কাছে মিথ্যা নহে।... কাব্যের বাস্তবতা সম্বন্ধে কবির নিজের মধ্যে প্রমাণ, তিনি জানেন, বিশ্বের মধ্যেই সেই প্রমান আছে। সেই প্রমানের অনুভূতি সকলের নাই-সুতরাং বিচারকের আসেন যে খুশি, বসিয়া যেমন খুশি রায় দিতে পারেন, কিন্তু ডিক্রিজরির বেলায় যে তাহার ঘটিবেই এমন কোনো কথা নাই। [১৩]

রবীন্দ্রনাথ মনে করেন বাহ্য-বাস্তবতার উপস্তাপনা নয়, রসসষ্টিই সাহিত্যের লক্ষ্য। রসের মধ্যেই নিত্যতা আছে, কিন্তু বস্তুর মধ্যে নিত্যতা নেই। তাঁর মতে লোকশিক্ষকের ভূমিকা

গ্রহণও কবির দায়িত্ব নয়, কারণ লোশিক্ষাদানের উদ্দেশ্য সাহিত্য সৃষ্টি হয় না। সাহিত্য আনন্দের সৃষ্টি এবং সাহিত্যের কাজ আনন্দ দান। 'লোকহিত' প্রবন্ধে (সবুজপত্র, ভাদ্র-১৩২১) রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের উপযোগিতাবাদ তথা রাধাকমলের উপযোগিতাবাদী-দৃষ্টিভঙ্গির সমালোচনা করেন। তিনি বলেন যে লোকহিত সাধনের সঙ্কল্প নিয়ে সাহিত্য সৃষিট করতে গেলে তা হবে সাহিত্যের নামে জঞ্জাল সৃষ্টি।[১৪]

রবীন্দ্রনাথের 'বাস্তব'শীর্ষক প্রবন্ধের সমালোচনা ও প্রত্যুত্তরে রাধাকমল লেখেন 'সাহিত্যে বাস্তবতা' নামক প্রবন্ধ। মাঘ ১৩২১-এর সবুপত্রের মুদ্রিত এ-প্রবন্ধে রাধাকমল রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যসৃষ্টি বিষয়ক মতের সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, সাহিত্য শুধু নিত্যরসের গুণেই টেকে না, কাব্য স্থায়িত্ব পায় নিত্যরস ও নিত্যবস্তুর গুণে। তাঁর মতে, সাহিত্য বিশুদ্ধ আনন্দের সৃষ্টি নয়, সমাজ ও মানুষের হিত সাধনের জন্য এর সৃষ্টি এবং যুগধর্ম প্রকাশেই এর সার্থকতা। তাই সাহিত্যকে হতে হবে বাস্তবঘনিষ্ঠ। সাধারণ জীবনবাস্তবতার উপস্থাপনার মধ্য দিয়েই সাহিত্য হবে বাস্তবঘনিষ্ঠ এবং বাস্তবতা অবলম্বন করেই সাহিত্য রসসৃষ্টি করবে, বিশুদ্ধ সৌন্দর্যসাধনা সাহিত্যের লক্ষ্য নয়। তাঁর মতে, 'রস জিনিসটার একটা আধার থাকা চাই-সেই আধঅরটাই হইতেছে বাস্তব। বাস্তবের পরিবর্তন হইতেছে-যুগে যুগে সংগে সংগে সাহিত্য রসও বিভিন্ন হইতেছে। তবুও বাস্তবের মধ্যে নিত্যতা আছে; আর ঐ নিত্যতা আছে বলিয়া আমরা দেশকালপাত্র অতিক্রম করিয়া, অর্থাৎ বাস্তবকে অতিক্রম করিয়া বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন প্রকার সাহিত্যরসের আস্বাদন করিতে পারি।[১৫] রবিন্দ্রনাথের বিশুদ্ধ রসসৃষ্টি বিয়াক অভিমতের বিরোধিতা ক'রে তিনি বলেন বাস্তবতাকে বাদ দিয়ে যে রসসৃষ্টি করাহয়, তা অলীক ও আবেদনশূণ্য। তিনি বলেন, সাহিত্যকে যদি পদ্ম ধরা যায় তবে বাস্তবতা হচ্ছে ঐ পদ্মের মৃণাল। এই বাস্তব অবলম্বন না থাকিলে সাহিত্যরূপী সৌন্দর্য্য ফুটতে পারে না। রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা করে তিনি বলেন, বাস্তকে হট্টগোল বলিয়া উড়াইয়া দিলে সাহিত্যের ধ্রুব আদর্শ বিকাশ লাভ করিবে না।[১৬] কারণ লতাকে উপেক্ষা করে তো ফুল ফোটে না, সাহিত্য যদি বাস্তবকে উপেক্ষা করে রসসৃষ্টি করতে চায় তবে সে রস কাগজের ফুরে মত অলীকও কৃত্রিম হইবে, সে রস হতে কেহ তৃপ্তি পাইবেনা জীবন।'[১৭] রবীন্দ্রনাথ যেমন বিশুদ্ধ শিল্পসৃষ্টির পক্ষপাতী, রাধাকমল তেমনি সাহিত্যের উপযোগিতাবাদে বিশ্বাসী। তিনি মেনে করেন লোকহিত সাধনের জন্যই সাহিত্য বাস্তবঘনিষ্ঠ হবে।

রাধাকমলের উপযোগিতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি ও সাহিত্যের বাস্তবঘনিষ্ঠতা বিষয়ক মতামতের বিরোধিতা করেন প্রমথ চৌধুরী। মাঘ ১৩২১ বঙ্গাব্দের সবুজপত্রে মুদ্রিত হয় তাঁর 'বস্তুতন্ত্রতা বস্তু কি' শিরোনামের প্রবন্ধ। প্রমথ চৌধুরী প্রবন্ধটির শুধু রবীন্দ্রসাহিত্যের বাস্তবতা বিষয়ক বিতর্কের একটি উল্লেখযোগ্য রচনাই নয়, আরো একটি কারণেও প্রবন্ধটি গুরুত্বপূর্ণ। এ-প্রবন্ধ ইউরোপীয় বাস্তবতাবাদী আন্দোলন, দর্শনে বাস্তবতাবাদের উদ্ভব ও রূপান্তরের ইতিহাস, বৈশিষ্ট্য ও ভাববাদের সঙ্গে বিরোধের কারণ আলোচনা করা হয়। এই আলোচনা ইউরোপীয় বাস্তবতাবাদী আন্দোলন সম্পর্কে পাঠকের মনে স্পষ্ট একটি ধারণা জাগাতে সক্ষম। প্রমথ চৌধুরী Realism এর বাংলা পরিভাষা করেন, 'বস্তুতন্ত্রতা' এবং প্রবন্ধে বস্তুবাদী সাহিত্যকে 'বস্তুতান্ত্রিক সাহিত্য' বরেন এবং তিনি গণ্য করেন একই সাহিত্য আন্দোলন রূপে। তাই ফ্লবেয়ারের সঙ্গে প্রাকৃতবাদকে তিনি রিয়ালিস্ট' বলেই অভিহিত করেন। অন্যান্য ভাবুবাদীর মতো প্রমথ চৌধুরীও সাহিত্যিক বাস্তবতাবাদে অস্বস্তবোধ করেন এবং শ্রেষ্ঠ বলে গণ্য করেন ভাববাদ । ইউরোপীয় বাস্তবতাবাদীদের বাস্তবমনতাকে তিনি দেখেন অবজ্ঞা ও উপহাসের দৃষ্টিতে। তিনি বলেন, 'জোলা প্রভৃতি রিয়ালিজমের দলবল সরস্বতীকে আকাশপুরী হতে শুধু নামিয়েই সন্তুষ্ট হননি, তাকে জোর করে মর্ত্যের ব্যাধিমন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। কারণ রোগ যে বাস্তব, সে কথা আমরা চীৎকার করে মানতে বাধ্য।'[১৮] প্রমথ চৌধুরী সাহিত্যের বাস্তবতার অবিকল উপস্থাপনার পক্ষপাতী নন এবং সাহিত্যের উপযোগিতাবাদেও অধীন নয়। বাস্তবমনস্কতা সাহিত্য সৃষ্টির প্রধান শর্ত হৎতে পারে না বলে তিনি মনে করেন। সাহিত্যের বাস্তবঘনিষ্ঠতার পক্ষপাতী রাধাকমল মুখোপাধ্যায়কে আক্রমণ ককের তিনি বলেন,'পঙ্কজ অপেক্ষা পঙ্কে যে অধিক পরিমাণে বাস্তবতা আছে, এই বিশ্বাসে জোলা প্রভৃতি বস্তুতান্ত্রিকেরা মানব মনের এবং মানবসামাজের পঙ্কোদ্ধার করে সরস্বতীর মন্দির জড়ো করেছিলেন। রাধাকমল বাবু কি চান যে আমরাও তাই করি?[১৯] প্রমথ চৌধুরী মতে বাহ্যবাস্তবতার অনুলিপিকার বিশ্বের রিপোর্টার মাত্র, স্রষ্টা নয়। তিনি বলেন, 'আমরা যখন বহির্জগতের সত্যসুন্দর মঙ্গলের কেবলমাত্র স্রষ্টা, তখন আমরা বন্ধজীব; এবং আমরা যখন নূতন সত্য সুন্দর মঙ্গলের স্রষ্টা তখন আমরা মুক্ত জীব। যাঁর স্বাধীনতা নেই তাঁর সাহিত্যে কোনো কিছুরই সৃষ্টি করবার ক্ষমতা নেই। তিনি বড় জোড় বিশ্বের রিপোর্টার হতে পারেন, তার বেশি নয়।'[২০] তিনি মনে করেন যথার্থ কবি সমাজের ফরামশ খাটেন না, বরং তিনি মানব সমাজে

নতুন প্রাণ সঞ্চার করেন। তাই সাহিত্যকে সামাজিক উদ্দেশ্য সাধনের উপায় করে তোলাও সম্ভব নয়। প্রমথ চৌধুরী সাহিত্য রিয়ালিজম ও আইডিয়ালিজমের মিশ্রণ ঘটাবার পক্ষপাতী। তিনি মনে করেন বাস্তবতা স্রষ্টার সৃষ্টিকর্মের প্রাথমিক উপাদান স্রষ্টা তাকে পরিশোধিত ও সুসম্পুর্ণ করে সাহিত্যে উপস্থাপিত করেন।[২১]

প্রমথ চৌধুরীর প্রবন্ধের প্রত্যুত্তরে রাধাকমল লেখেন 'সাহিত্য ও স্বদেশ' (সাহিত্য, বৈশাখ ১৩২২) প্রবন্ধ। এ-প্রবন্ধ রাধাকমল মুখোপাধ্যায়ের পূর্বেকার বক্তব্যই পুনরাবৃত্ত হয়। রবীন্দ্রসাহিত্যকে তিনি বস্তুতন্ত্রহীন বলে অভিযুক্ত করেন এবং লোকশিক্ষকের ভূমিকার পালনই সাহিত্যিকের দায়িত্ব বলে দাবি করেন। তবে সাহিত্যে বাস্তবতার উপস্থাপনা প্রসঙ্গে তিনি যে মন্তব্য করেস তার মধ্যে বাস্তবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি নয়, ভাববাদী দৃষ্টিভঙ্গি ও বিশ্বাসই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তিনি বলেন, 'কবির সাহিত্যেল সাধনা অতীত হওয়া।'[২২] তাঁর বাস্তবতা বিষয়ক ধারণা সঙ্গে ভাববাদীদের বাস্তবতা উপস্থাপন বিষয়ক ধারণার ভিন্নতা নেই। তিনিও মনে করেন বাস্তবতা হবে স্রষ্টার প্রাথমিক উপাদান, লেখক তাকে পরিশোধিত করে সৃষ্টি করবেন এক আদর্শ বাস্তব। সবুজপত্রে-এ জ্যৈষ্ঠ ১৩২২) মুদ্রিত 'কবির কৈফিয়ত' প্রবন্ধে বিরোধীদের অভিযোগ খণ্ডনের পাশাপাশি রবীন্দ্রনাথ ব্যাখ্যা করেন বাস্তবতার অবিকল উপস্থাপনায় তাঁর অনীহার কারণ, এবং নির্দেশ করেন বাস্তবতা ও স্রষ্টার চৈতন্যের সম্পর্কে। তিনি বলেন, বাস্তবতায় জীবনসংগ্রাম যতো কঠোর তীব্র নিরানন্দই হোক, কবি কখনো ওই বাস্তবতার চাপে মৃতপ্রায় হন না বা বাস্তবতার ধূলিকেল্‌দ তাঁকে তাপিত করে না। কবির বীণায় বাজে বিশ্বপ্রকৃতির প্রকৃত সুর, সে সুর আনন্দোর। রবীন্দ্রনাথ মনে করেন দুঃখ দৈন্য-সংগ্রাম-সন্তাপের মধ্যেও প্রকৃতিতে বেজে চলে পূর্ণতা ও আনন্দের বাণী; কবিও প্রকৃতরি সঙ্গে সুর মিলিয়ে সেই পরম সত্রের স্তোত্রই উচ্চারণ করবেন মাত্র, আর কিছু নয়। করিব এই সৌন্দর্যবন্দনাই রবীন্দ্রনাথের কাচে চরম সত্য, আর তিনি বাস্তবতার গাথা রচনাকে গণ্য করেন অসুন্দর কর্মরূপে। বাস্তবতাবাদীদের উপহাস করে তিনি বলেন, 'বড়াই করিতে হইবে যে আনন্দকে অবজ্ঞা করিব আমরা এমনি বাহাদুর। চন্দন মাখিতে লজ্জা, তাই বাইসরিষা বেলেস্তারা মাখিয়া দাপাদাপি করি।

আমার লজ্জা এই বেলেস্তারাটাকে।'[২৩]

রবীন্দ্রসাহিত্যের বাস্তবতা বিষয়ক এ-বিতর্কে লক্ষ্য করা যায় বিভিন্নজন বাস্তবতাকে রেখেছেন ব্যক্তিগত দৃষ্টিতে এবং বাস্তবতার বিভিন্ন অপেক্ষা গণ্য করেছেন বাস্তবতা বালে। বিপিনচন্দ্র পালের কাছে বাস্তবতা হাচ্ছে সাধারণ প্রাত্যহিক সুখ-দুঃখ, রিরংসা, ঈর্ষাভরা জীবন। তিনি মনে করেন মধু ও হুলভরা সাধারণ জীবনের নিরাবেগ ও নিরপেক্ষ পরিচয় তুলে ধরেই একজন লেখক বস্তুনিষ্ঠ হয়ে উঠতে পারেন।[২৪] মধু ও হুলভরা সাধারণ জীবনের নিরপেক্ষ চিত্রণ না ক'রে রবীন্দ্রনাথ শুধু জীবনের মধুর অংশের চিত্রণ করছেন বলে রবীন্দ্রসাহিত্য তাঁর কাছে বস্তুতন্ত্রহীণ। এখানে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য প্রসঙ্গে সুধীন্দ্রনাথ দত্তের একটি মন্তব্য উল্লেখ করা যায়। সুধীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রকাব্যের জগতকে 'পরীরর রাজ্য' বলে অভিহিত করেন। কারণ সৌন্দুর্যমণ্ডিত। প্রাত্যাহিক তিক্ত বাস্তবতাকে সেখানে খুঁজে পাওয়া যায় না, হৃদয়ের মহত্তম আবেগ বা গভীর আনন্দ-বেদনা-নিবেদনই ওই পৃথিবীতে জচরম বাস্তব। সৌন্দর্যই ওই পৃথিবীতে পরম সত্য। সুধীন্দ্রনাথত বলেন,.....প্রত্যেক সত কবির রচনাই তাঁর দেশ ও কালের মুকুর এবং রবীন্দ্রসাহিত্যে যে-দেশ ও কালের প্রতিবিম্ব পড়ে, তাদের সঙ্গে আজকালের পরিচয় এত অল্প যে উভয়ের যোগফলকে যদি পরীর রাজ্য বলা যায়, তাহলে বিস্ময় প্রকাশ অনুচিত।'[২৫] রাদাকামল মুখোপাধ্যায়ের কাছে বাস্তবতা হচ্ছে দেশের শ্রমজীবীদের জীবন ও তাদের সঙ্কট। দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অর্থনীতিক-পারিবারিক-সামাজিক জীবনসঙ্কটের ব্যাপক পরিচয় ও সঙ্কটের সমাধান নির্দেশ করা হয়নি বলে রবীন্দ্রসাহিত্যকে তিনি বৃস্তুতন্ত্রহীন বলে অভিযুক্ত করেন। অজিত কুমার চক্রবর্তী, প্রমথ চৌধুরী প্রমুখের কাছে বাহ্যবাস্তবতা অসম্পূর্ণ ও অসুন্দর। তাঁরা সাহিত্যে সম্পূর্ণ, সুন্দর ও আদর্শায়িত বাস্তবতার উপস্থাপনা দেখতে চান। তাঁরা মনে করেন বাহ্যবাস্তবতার সঙ্গে কল্পনার মিশ্রণে কবি সৃষ্টি করবেন আদর্শায়িত বাস্তবজগৎ। প্রমথ চৌধুরী সাহিত্যে বাস্তবতার নগ্ন চিত্রণকে বলেছেন 'পঙ্কোদ্ধার'।[২৬] রবীন্দ্রনাথের কাছে বাস্তবতা বা সত্য হচ্ছে আত্মোপলব্ধি । স্রষ্টা তাঁর চৈতন্য দিয়ে যে সত্য উপলব্ধি করেন তা-ই চরম সত্য বা বাস্তব। কাব্যে বাহ্যবাস্তবতার চিত্রণ করা হলে ওই কাব্য হয়ে ওঠে, তাঁর মতে, হাটের কাব্য, শিল্প নয়। বাস্তবাতর অবিকল উপস্থাপনার প্রবণতাকে তিনি 'কবির কৈফিয়ত' প্রবন্ধে' রাইসরিয়ার বেলেস্তারা মাখিয়া দাপাদাপি বলে উপহাস করেন।'[২৭]

ভাববাদী রোম্যান্টিক রবীন্দ্রনাথ লেখকের বাস্তবমঙ্কতা ও সাহিত্য প্রাত্যহিক বাস্তবতা চিত্রণের প্রবণতার প্রবল বিরোধী। পাশ্চাত্য বাস্তবতাবাদী বা প্রাকৃতবাদী ঔপন্যাসিকদের বাস্তবতা উপস্থাপনার প্রবণতাকে তিনি উপহাস ও তাচ্ছিল্য করেছেন। ১২৯৯ বঙ্গাব্দে প্রাকশিত 'মানব প্রকাশ' প্রবন্ধে তিনি জোলাকে 'অশ্লীল' বলে অভিহিত করেন।[২৮] কারণ জোলার উপন্যাসে শুধুমাত্র বাহ্যবাস্তবতার উপস্থাপনা ঘটেছে, মহৎ হৃদয়বৃত্তি উপেক্ষিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের মতে, 'জোলা অশ্লীল' কেননা তা কেবল আংশিক অনাবরণ।'[২৯] বাস্তবতার অনুপুঙ্খ উপস্থাপনারীতি তাঁর কাছে বিরক্তিকর। ইন্দ্রিরা দেবীকে রেখা চিঠিতে (৮ এপ্রিল ১৯৯২) তিনি বলেন যে ইংরেজি উপন্যাস পড়তে তাঁর অস্বস্তি হয়, কারণ সেখানে প্যাঁচের উপর প্যাঁচ, অ্যানলিসিসের উপর অ্যানালিসিস।'[৩০] ক্লেদাক্ত ও অসুন্দর বাস্তবতার কারণে অ্যানা জানান।[৩১] রবীন্দ্র-পরবর্তী তিরিশি আধুনিক কথাসাহিত্যিকদের বাস্তবতা উপস্থাপনার প্রবণতাও রবীন্দ্রনাথকে ক্ষুব্ধ করে। বাংলা সাহিত্য বিংশ শতাব্দীর তৃতীয়দশকে আবির্ভূত হয় একযোগত্র তরুণ লেখক, তাঁরা ত্রিশের দশকে বিকাশ বা প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন। সাধারণভাবে এ-লেখকের তিরিশি আধুনিক লেখকগোত্ররূপে চিহ্নিত হয়ে থাকেন। তাঁরা বাংলা কথাসহিত্যকে নানাভাবে বাস্তবঘনিষ্ঠ করে তোলার প্রবাস চালান। তাঁদের এ-প্রবণতা রবীন্দ্রনাথের কাছে অসুন্দর বরে গণ্য হয়। আধুনিকদের বাস্তবতা উপস্থাপনার প্রবণতা ও বাস্তবতামুখী সাহিত্য সৃষ্টির প্রয়াস রবীন্দ্রনাথকে এতো ক্ষুব্ধ ও বিচলিত করে যে নানাভাবে তিনি আধুনিক কথাসাহিত্যিকদের উপহাস ও আক্রমণ করে চলেন। তরুণ কথাসাহিত্যিকরা যে তাঁর সঙ্গে মতাদর্শগত এক ব্যাপক সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছিলেন তা নয়, রবীন্দ্রনাথ অনেকটা একতরফাভাবে নানা চিঠিপত্র, প্রবন্ধ, নাটক-কাবনাট্য-উপন্যাস প্রভৃতিতে তীব্রভাবে আধুনিক কথাসহিত্য ও সাহিত্যিকদের আক্রমণ করে চলেন এবং আধুনিকদের বাস্তবতাঘনিষ্ঠ রচনাকে হেয় প্রাতপন্ন করার জন্য এক ধরনের ধর্মযুদ্ধ চালান।[৩২]

রবীন্দ্রনাথ আধুনিক লেখকদের বাস্তবতামুখিতা বা আধুনিক কথাসাহিত্যের প্রতি প্রথম আক্রমণাত্মক মন্তব্য করেন আধুনিক চেতনার দীক্ষিতশত্রু সজনীকান্ত দাসকে লেখা চিঠিতে। সজনীকান্ত দাস বাঙালি সমাজ ও ব্যক্তিজীবনে আধুনিক সাহিত্যের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে অবহিত করে ২৩ ফাল্গুন, ১৩৩৩ বঙ্গাব্দে রবীন্দ্রনাথকে একটি চিঠি লেখেন। ওই চিঠিতে সজনীকান্ত রবীন্দ্রনাথের কাছে এর প্রতিকার ও প্রার্থনা করেন। সজনীকান্তের চিঠির অংশবিশেষ এ-রকম: 'লেখার বাইরেকার

চেহারা যেমন বাধবাঁধনহারা ভেতরের ভাবও তেমনি উচ্ছৃঙ্খল। যৌনতত্ত্ব সমাজতত্ত্ব অথবা এই ধরনের াকিছু নিয়েই এগুলি লিখত হচ্ছে। যাঁরা লেখেন তাঁরা Continental Literature -এর দোহাই পাড়েন। যাঁরা এগুলি প'ড়ে বাহবা দেন তারা সাধারণ প্রচলিত সাহিত্যকে রুচিবাগীশদের সাহিত্য বলে দূরে সরিয়ে রাখেন। পৃথিবীতে আমরা স্ত্রী-পুরুষের যে সকল পারিবারিক সম্পর্ককে সম্মান করে থাকি এই সব লেখাতে সেই সব সম্পর্ক বিরুদ্ধ সম্বন্ধ স্থাপন করে আমাদের ধারণঅকে কুসংস্কার শ্রেণীভুক্ত বলে প্রচার করার একটা চেষ্টা দেখি। .... Realistic... নাম দিয়ে এগুলিকে সাহিত্যের একটা বিশেষ অঙ্গ বলে চালাবার চেষ্টা হচ্ছে। ... কোনো প্রবলপক্ষের তরফ থেকে এর প্রতিবাদ বের হওয়ার একান্ত প্রয়োজন আছে। যিনি আজ পঞ্চাশ বছর ধরে বাঙলাসাহিত্যকে রূপে-রসে পূষ্ট করে আসছেন তাঁর কাছেই আবেদন করা ছাড়া আমি অন্যা পথ না দেখে আপনাকে আজ বিরক্ত করছি। বাঙলাসাহিত্য যতার্থ রূপ নেবার পূর্বেই এই ধরনের লেখার মোহে পড়ে নষ্ট হতে বসেছে, আমার এই ধারণা। সেজন্যে আপনার মতামতের জন্যে আমি আপনাকে এই চিঠি দিচ্ছি।' রবীন্দ্রনাথ এর উত্তরে ২৫ ফাল্গুন ১৩৩৩-এ লেখা চিঠিতে আধুনিকদের সম্পর্কে তাঁর অভিমত ব্যক্ত করেন। তিনি আধুনিকদের 'কলম'কে অভিহিত করেন 'বে-আব্রু' বলে। তিনি বলেন, আধুনিক সাহিত্য আমার চোখে পড়েনা।ভ দৈবাৎ কখনো যেটুকু দেখি, দেখতে পাই হঠাৎ কলমের আব্রু ঘুচে গেছে। আমি সেটাকে সুশ্রী বলি এমন ভুল করো না। কেন করিনে তার সাহিত্যিক কারণ আছে নৈতিক কারণ এস্থলে গ্রাহ্য না হতেও পারে। ... সুসময় যদি আসে তখন আমার যা বলবার বলব।' রবীন্দ্রনাথের নিজেরই ছিলো সহজাত আধুনিকতাবিরোধিতা, আর সজনীকান্ত উদ্দীপ্ত করে তোলেন। রবীন্দ্রনাথকে আধুনিকতার বিরুদ্ধে নামতে।

রবীন্দ্রনাথ সজনীকান্তের দ্বারা প্ররোচিত হন; তবে অমল হোমের আধুনিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধও রবীন্দ্রনাথকে আরো প্ররোচিত করে। ১৯২৬ খ্রিষ্টাব্দের ডিসেম্বরে অমল হোম দিল্লির প্রবাসী-বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের অধিবেশনে 'অতি আধুনিক বাংলা কথা সাহিত্য' শীর্ষক প্রবন্ধ পড়েন। এ-প্রবন্ধে তিনি তরুণ লেখকদের 'অতি আধুনিক' বলে অভিহিত করে তাঁদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। তাঁর কাছে আধুনিক বায়লা কথাসাহিত্যের অভীষ্ট রিয়ালিজমকে মনে হয়েছে ইরোপীয় সাহিত্যের যৌনতার অন্ধ নকল। রবীন্দ্রনাথ আধুনিক সাহিত্যকে প্রত্যক্ষভাবে আক্রমণ করেন ১৯২৭ খ্রিষ্টাব্দে 'সাহিত্য ধর্ম' (১৩৩৪) ও 'সাহিত্যে নবত্ব' (১৩৩৪) প্রবন্ধ দুটির মাধ্যমে। রবীন্দ্রনাথ আধুনিক সাহিত্যকে আক্রমণে অগ্রসর হন অমল হোম নির্দেশিত পথ ধরে; রবীন্দ্রনাথও আধুনিক সাহিত্যকে অভিযুক্ত করেন ইউরোপীয় যৌনতার অন্ধ অনুকরণ বলে। আধুনিকদের প্রতি রবীন্দ্রনাথের বিরূপতা ও আধুনিক সাহিত্যকে আক্রমণমূলক প্রবন্ধাবলির পটভূমিতে দাঁড়িয়ে ছিলেন

সজনীকান্ত-অমল হোমের মতো রক্ষণশীল সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির অনুরাগীরা। ১৩৩৩ বঙ্গাব্দ থেকে শুরু করে ১৩৩৫ বঙ্গাব্দ (১৯২৬-১৯২৮) পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ তাঁর নানা রচনায় আধুনিক কথঅসাহিত্যের বিষয়বস্তু ও লেখদের বাস্তবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির নিন্দা করে চলেন। বিচিত্রা-য় (শ্রাবণ, ১৩৩৪) মুদ্রিত হয় রবীন্দ্রনাথের 'সাহিত্য ধর্ম' প্রবন্ধটি; এবং প্রবাসী-তে (অগ্রাহয়ণ, ১৩৩৪) প্রকাশিত হয় 'সাহিত্যে নবত্ব' প্রবন্ধটি; এবং প্রবাসী-তে (অগ্রহায়ণ, ১৩৩৪) প্রকাশিত হয় 'সাহিত্যে নবত্ব' প্রবন্ধ। সজনীকান্ত দাস তাঁর আত্ম স্মৃতি-তে বলেন যে তাঁর ব্যাকুল পত্র-আবেদনের ফলে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার "সাহিত্য ধর্ম" প্রবন্ধে "আধুনিক সাহিত্যে"র বিরুদ্ধে লেখেন।'৭২ এ-দুটি প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ আধুনিক সাহিত্যের বাস্তবমনষ্কতাকে আক্রমণ করে। 'সাহিত্যধর্ম' প্রবন্ধে তিনি আধুনিক লেখকদের বাস্তবতার নগ্ন নিরাবরণ চিত্রণপ্রবণতাকে বে ুআব্রুতা' বলে নিন্দা করেন, তাঁর 'সাহিত্যে নবত্ব' প্রবন্ধে আধুনিক কথাসাহিত্যেকে শিল্পসৃষ্টিরূপে গণ্য করার ব্যাপারে সংশয় প্রকাশ করেন। তাঁর মতে, এ-রচনাগুলো অপটু লেখদের পাকশালায় রিয়ালিটর কারিপাউডার সহযোগে প্রস্তুত শস্তা, উত্তেজক রচনা মাত্র, মহৎ শিল্পকলা নয়।[৩৩]

'সাহিত্যধর্ম' প্রবন্ধে আধুনিক লেখদের বাস্তবতামনস্কতাকে আক্রমণ করার পাশাপাশি রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যে বাস্তবতা উপস্থাপনা বিষয়েও মত প্রকাশ করেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিরুদ্ধে বিপিনচন্দ্র, রাধাকমল প্রমুখের আনীত বস্তুতন্ত্রহীনতার অভিযোগ খন্ডনের সময় যে-মতবাদ ব্যক্ত করেছিলেন, এ-পর্যায়েও ব্যক্ত করেন বাস্তবতাবিষয়ক এই একই ধারণা ও বিশ্বাস। তুচ্ছ দৈনন্দিন জীবনাবাস্তবতার উপস্থাপনা তাঁর কাছে শিল্পসৃষ্টি নয়। রবীন্দ্রনাথ বাহ্যবাস্তবতার সত্যকে বলেন 'সাধারণ সত্য', আর সাহিত্রের সত্যকে বলেন 'সার্থক সত্য'। তার মতে, সাধারণ সত্যে একেবারে বাছবিচার নেই, সার্থক সত্য আমাদের বাছাই করা।[৩৪] তিনি মনে করেন শিল্পকলা উপস্থাপন করে সার্থক সত্য, সাধারণ সত্য তুলে ধরা তার উদ্দেশ্য নয়। তার মতে যে জিনিস আমরা প্রাত্যহিক প্রয়োজনে ব্যবহার করি, তা প্রয়োজনের ছায়াতে রাহুগ্রস্ত হয়ে পড়ে। এ-কারণে, তিনি বিশ্বাস করেন, সৌন্দর্য থাকা সত্ত্বেও সজনে ফুল, গোলাপজাম, সর্ষে ফুল বা রুই মাছের সৌন্দর্য বর্ণনা কাব্যের বিষয় হতে পারে না; কারণ এসব জড়িত জীবনের স্থুল প্রয়োজনের সঙ্গে। কাব্যে এগুলোর উল্লেখমাত্রই এগুলেঅর ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তার কথাই সর্বাগ্রে মনে পড়ে। তাই এগুলো কোনো অধরা সৌন্দর্যের আভাস আমাদের মনে জাগাতে পারে না। রবীন্দ্রনাথ মনে করেন, কাব্যের জন্যে রয়েছে বিশেষ কাব্যিক উপাদান যা ব্যবহারিক জীবন থেকে দূরবর্তী। স্থুল প্রয়োজনে ব্যবহৃত উপকরণাদির বিশুদ্ধ সৌন্দর্য সৃষ্টির শক্তি নেই। রবীন্দ্রনাথ এ-প্রবন্ধে আধুনিক কথাসাহিত্যের বাস্তবতা উপস্থাপনার প্রবণতাকে নানা বিদ্রুপাত্মক অভিধায় অভিহিত করেন। কখনো এ-প্রবণতাকে

নির্দেশ করেন 'সাহিত্যের হোলিখেলায় কাদামাখামাখির উৎসব' বলে, কখনো একে বলেন 'বিদেশের আমদানি বে-আব্রুতা', 'পালোয়ানির মাতামাতি', 'ধার করা নকল নির্লজ্জতা' ইত্যাদি। রবীন্দ্রনাথ মনে করেন 'বিদেশের আমদানি' এই বে-আব্রুতা' সাহিত্যের নিত্য পাদার্থ নয়, মানুষের রসবোধে যে আব্রু আছে সেইটেই নিত্য' আধুনিকদের বাস্তুতামনস্কতাকে আক্রমণ করে তিনি বলেন:

> এই ল্যাঙট-পরা গুলি-পাকানো ধুলোমাখা আধুনিকতারই একটা স্বদেশী দৃষ্টান্ত দেখেছি হোলিখেলার দিনে চিৎপুর রোডে। সেই খেলায় আবীর নেই, গুলাল নেই, পিচকারি নেই, গান নেই, লম্বা লম্বা ভিজে কাপড়ের টুকরো দিয়ে রাস্তার ধুলোকে পাক করে তুলে তাই চীৎকার শব্দে পরস্পরের গায়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পাগলামি করাকেই জনসাধারণ বসন্ত উৎসন বলে গণ্য করেছে। পরস্পরকে মলিন করাই তার লক্ষ্য, রঙিন করা নয়। মাঝে মাঝে এই অবারিত মালিন্যের উন্মত্ততা মানুষের মনস্তত্ত্বে মেলে না, এমন কথা বলিনে। অতএব সাইকো-অ্যানালিসিসে এর কার্যকারণ বহুযত্নে বিচার্য। কিন্তু মানুষের রসবোধই যে-উৎসবের মূল প্রেরণা সেখানে যদি সাধারণ মলিনতায় সকল মানুষকে কলঙ্কিক করাকেই আনন্দ প্রকাশ বলা হয়, তবে সেই বর্বরতার মনস্তত্ত্বকে এক্ষেত্রে অসংগত বলেই আপত্তি করব, অসত্য বলে নয়।[৩৫]

রবীন্দ্রনাথের মতে আধুনিক লেখদের বাস্তবতামনস্কতা হচ্ছে এক ধরনের অসুন্দর উন্মত্তা। সাহিত্যে এই উন্মত্তা প্রদর্শনের মধ্য দিয়ে শক্তির দম্ভ প্রকাশ করা যায়, কিন্তু, 'মাধুর্যহীন সেই রূঢ়তা" দিয়ে হৃদয়কে মুগ্ধ ও প্রশান্ত করে দেয়া যায় না। তাই শক্তির দম্ভকে বাহাদুরি দেবার কিছু নেই। তিনি বলেন :

> সাহিত্যে রসের হোলিখেলায় কাদা মাখামাখির পক্ষ সমর্থন উপলক্ষে অনেকে প্রশ্ন করেন, সত্যের মধ্যে এর স্থান নেই কি। এ-প্রশ্নটাই অবৈধ। উৎসরেবর দিনে ভোজপুরীর দল যখন মাতলামির ভূত পাওয়া মাদল করতালের খচোখচোখচকার-যোগে একঘেয়ে পদের পুনঃপুন আবর্তিত গর্জনে পীড়িত সুরলোককে আক্রমণ করতে থাকে তখন আর্ত ব্যক্তিকে এ-প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করাই অনাবশ্যক যে এটা সত্য কিনা; যথার্থ প্রশ্ন হচ্ছে, এটা সঙ্গীত কিনা, মত্ততার আত্মবিস্মৃতিতে এক রকম উল্লাহ হয়, ... আধুর্যহীন সেই রূঢ়তাকেই যদি শক্তির লক্ষণ বলে মানতে হয় তবে এই পালোয়ানির মাতামাতিকে বাহাদুরি দিতে হবে সেকথা

> স্বীকার করি। কিন্তু ততঃ কিম। এ পৌরুন চিৎপুরের রাস্তার, অমরপূরীর সাহিত্যকলার নয়।[৩৬]

রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যে মানুষের প্রবৃত্তিগত জীবনবাস্তবতার উপস্থাপনারও বিরোধী। তার মতে মানুষের প্রবৃত্তিগত জীবন সত্য হলেও, ওই স্থূল প্রবৃত্তিই মানুষের একমাত্র পরিচয় নয়। তা মানুষের জীবনের একটি গৌণ অংশ। তাই প্রবৃত্তিগত জীবনচিত্রণ কখনো সাহিত্য বা শিল্পের লক্ষ্য হতে পারে না। আধুনিক সাহিত্যের ইন্দ্রিয়রিরংসার অনুপুঙ্খ চিত্রণের প্রবণতাকে তিনি নির্দেশ করেন যুগের হুজুগরূপে।[৭৮] প্রবৃত্তিগত জীবনের অনুপুঙ্খ উপস্থাপনরীতিরও নিন্দা করেন রবীন্দ্রনাথ। তার মতে এ-দেশে অনুপঙ্খ নির্লজ্জ বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণধর্মিতা কখনোই মর্যাদা পাবে না এবং এই রীতির উদ্ভাবও এদেশে স্বাভাবিকভাবে ঘটেনি, এটি ইউরোপ থেকে ধার করা। আধুনিক কথাসাহিত্যিকরা জোর করে চাপিয়ে দিয়েছে। রবীন্দ্রনাথ বলেন, সম্প্রতি যে দেশে বিজ্ঞানের অপ্রতিহত প্রভাবে অলজ্জ কৌতুহলবৃত্তি দুঃশাসনমূর্তি ধরে সাহিত্যলক্ষ্মীর বস্ত্রহরণের অধিকার দাবি করছে সে দেশের সাহিত্য অন্তত বিজ্ঞানের দোহাই পেড়ে এই দৌরাত্যের কৈফিয়ত দিতে পারে। কিন্তু যে দেশে অন্তরে-বাহিরে ধার করা ব্যবহারে বিজ্ঞান কোনোখানেই প্রবেশাধিকার পায়নি সে দেশের সাহিত্যে ধার করা নকল নির্লজ্জতাকে কার দোহাই দিয়ে চাপা দেবে।'[৭৯] 'সাহিত্যধর্ম' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ আধুনিক বাংলা কথাসাহিত্যকে সমাজনীতি বিরুদ্ধ এবং এ-দেমের আবহাওয়া ও জীবনের সঙ্গে সম্পর্কহীন বলে অভিযুক্ত করেন।

আধুনিক সাহিত্যের প্রতি আক্রমণাত্মক ও বাস্তবতার প্রতি বীতশ্রুদ্ধ দষ্টিভঙ্গির পরিচায়ক রবীন্দ্রনাথের এ-প্রবন্ধটি বিচিত্রায় (শ্রাবণ ১৩৩৪) প্রকাশের পর বিতর্ক শুরু হয়। রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গির সমালোচনা করতে ও আধুনিক সাহিত্যের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ খন্ডনে এগিয়ে আসেন নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত ও শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। আর রবীন্দ্রনাথকে সমর্থন করে এগিয়ে আসেন দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচী। বিচিত্রায় (ভাদ্র ১৩৩৪) নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত রবীন্দ্রনাথের 'সাহিত্যধর্ম' প্রবন্ধের সমালোচনা ও প্রতিবাদ করে লেখেন 'সাহিত্যধর্মের সীমানা' নামক প্রবন্ধ। এ-প্রবন্ধে নরেশচন্দ্র আধুনিক কথাসাহিত্যিকদের পক্ষ নিয়ে আধুনিকদের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের অভিযোগ খন্ডনেই ব্যাপৃত ছিলেন; তবে এতে তাঁর বাস্তবতা-ধারণাও প্রকাশ পেয়েছে। তিনি সাহিত্যে বাস্তবতা সকল অংশের নিরাবেগ ও নিরপেক্ষ উপস্থাপনার পক্ষপাতী। রবীন্দ্রনাথ আধুনিকদের প্রবৃত্তিগত জীবন চিত্রণের প্রবণতাকে বে-আব্রুতা বলে নিন্দা করেন। তিনি অভিযোগ করেনে যে আধুনিক সাহিত্য বিদেশ থেকে আমদানীকৃত বেআব্রুতায় পরিপূর্ণ। নরেশচন্দ্র এর উত্তরে বলেন আব্রু-বেআব্রু ধারণা আপেক্ষিক ধারণামাত্র; তাই ভিন্ন দেমের মানুষের কাছে আব্রু বলে গণ্য হয়েছে

বিভিন্ন ব্যাপার। সাহিত্যে ও বে-আব্রুতা যাচাইয়ের নিত্য বা সনাতন মাপকাঠি নেই। তিনি বলেন যৌনসম্পর্কের রূপায়ন আধুনিক সাহিত্যেই প্রথম ঘটেনি। বঙ্গিমচন্দ্র থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত সকলের সাহিত্যেই ওই সম্পর্কের রূপায়ণ লক্ষ্য করা যায় এবং সবচেয়ে বেশি লক্ষ্য করা যায় রবীন্দ্রসাহিত্যে। রবীন্দ্রনাথের স্ববিরোধিতা ও রক্ষণশীল দষ্টিবঙ্গির সমালোচনা করে তিনি বলেন :

> কাবর কতক কথায় মনে হয় যে, যতক্ষণ লেখক কেবল মনের অভিসার লইয়া আলোচনা করে ততক্ষণ তিনি শ্লীলতার সীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকেন, যখন তিনি মন ছাড়িয়ো দেহ লইয়া টানাটানি করেন তখনই তিন বে-আব্রু। কিন্তু তাহাতেও কথাটা স্পষ্ট হয় না। শারীর ব্যাপার মাত্রই তো অপাংক্তোয় নয়, কেননা চুম্বনের স্থান সাহিত্যে পাশ করিয়া দিয়াছেন বঙ্গিমচন্দ্র হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত সকল সাহিত্যসম্রাট। আলিঙ্গনও কবিতায় রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং দৈনিক ব্যাপার লইয়া অপূর্ব রস উদ্বোধন করিয়াছেন। সুতরাং এখানেও একটা সীমারেখা আছে, যাহা অতিক্রম করিলেই সাহিত্য বে-আব্রু পদবাচ্য হইতে পারে। সে সীমারেখা কবি কোথায় টানিয়াছেন, তার বাহিরে কোন বই, ভিতরেই যা কোন বই, তাহা নির্ণয় করিবার কোনও নির্দেশই কবি দেন নাই।[৩৭]

নরেশচন্দ্র পাশ্চাত্য থেকে ঋণ গ্রহণ করার ব্যাপারটিকে দূষণীয় বলে মনে করেন না। তিনি মনে করেন 'আজ বিশ্বব্যাপী ভাববিনিময়ের দিনে বিলেতে যেটা ঘটিয়াছে, সে সম্বন্ধে নিরপেক্ষ থাকিতে পারি না।'[৩৮] তবে পাশ্চাত্য থেকে আধুনিক লেখকেরাই প্রথম ঋণ গ্রহণ করেনি। পাশ্চত্যের ভাবধারা আত্মস্থ করেন রবীন্দ্রনাথও। রবীন্দ্রনাথের লেখাতেও যে ইবসেন বা মেটারলিঙ্কের অনস্বীকার্য প্রভাব আছে, তাকেও বিদেশের আমদানি বলা যায় কিনা, নরেশচন্দ্র এ-প্রশ্ন তোলেন।

আধুনিকদের প্রতি রবীন্দ্রনাথের আক্রমণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গি ও রবীন্দ্রনাথের বাস্তববিমুখতার সমালোচনা করে শরৎচন্দ্র লেখেন 'সাহিত্যের রীতি ও নীতি' (বঙ্গবাণী, আশ্বিন ১৩৩৪) শীর্ষক প্রবন্ধ। শরৎচন্দ্র অভিযোগ করেনে যে রবীন্দ্রনাথ তার 'সাহিত্যধর্ম' প্রবন্ধে আধুনিক সাহিত্যকে নিরপেক্ষ মানদণ্ডে মূল্যায়ন করেননি। শরৎচন্দ্রের মতে আধুনিক সাহিত্যের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কিছুমাত্র পরিচয় থাকলে তাঁর পক্ষে এমন একদেশদর্শী মূল্যায়ন করা সম্ভব হতো না। তিনি মনে সংকীর্ণ ও রক্ষণশীল ভক্তদের উস্কানিতেই রবীন্দ্রনাথ আধুনিক সাহিত্যেকে এমনভাবে আক্রমণ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ আধুনিক সাহিত্রের বৈজ্ঞঅনিক বিশ্লেষণধর্মিতা এ-দেমের জন্য অনাবশ্যক মনে করেন, কারণ তাঁর মতে এ-দেশে বিজ্ঞানমনস্ক নয়। শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের এ-মত গ্রহণযোগ্য বলে মনে করেন না। তিনি বলেন এ-দেশে বিজ্ঞানমনস্ক নয় বলে চিরদিনই ওই বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণধর্মিতাকে উপক্ষো

করতে হবে এমন যুক্তি মেনে নেয়া যায় না। শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের বিশুদ্ধ সৌন্দর্যতত্ত্বেরও সমালোচনা করেন। তার মতে কাব্যের ও কথাসাহিত্যের জগত অভিন্ন নয়। কাব্যের জগতে কবি বাস্তবতাকে উপক্ষে করে সৌন্দর্যের সাধনায় মগ্ন থাকতে পারেন, কিন্তু কথাসাহিত্যে লেখককে অবশ্যই বাস্তবতানির্ভর হতে হবে। তিনি বলেন, 'কাব্যসাহিত্য ও কথাসাহিত্য এক বস্তু নয়। আধুনিক উপন্যাসসাহিত্য তো নয়ই। 'সোনার তরী'র যা লইয়া চলে, 'চোখের বালি'র তাহাতে কুলায় না। সজিনা ফুলে, বক ফুলে 'সোনার তরী'র াপ্রয়োজন নাই, কিন্দু বিনোদিনীর রান্নাঘরে সেগুলো না হইলেই নয়। তেপান্তর মাঠ এবং পক্ষীরাজ ঘোড়া লইয়া কাব্যের চলে, কিন্তু উপন্যাস সাহিত্যের চলে না। এখানে ঘোড়ার চার পায়ে ছুটিতে হয়, পক্ষবিস্তার করিয়া উড়ার সুবিধা হয় না। শরৎচন্দ্র কথাসাহিত্যে বাস্তবতা উপস্থাপনার পক্ষপাতী হলেও রবীন্দ্রনাথের মতো তিনিও সাহিত্যে যৌনজীবনের বস্তিৃতি বিবরণ দেয়াকে অরুচিকর বলে মনে করেন। সাহিত্যে এ-বাস্তবসত্যের উপস্থাপনা করতে গিয়ে তিনি নিজেও অস্বস্তি বোধ করেন বলে জানান; এবং রবীন্দ্রনাথের মতো তিনিও বিশ্বাস করেন যে ভিত্তির মতো সাহিত্যে যৌনজীবনও থাকবে প্রচ্ছন্ন বা গুপ্ত। শরৎচন্দ্রের মতে, 'বনিয়াদ তাহাতে কারুকার্য রচনা করা চলে। গাছের শিকড়, গাছের জীবন ও ফুলফলের পক্ষে যত প্রয়োজনীয়ই হোক তাহাকে খুড়িয়া উপরে তুলিলে তাহার সৌন্দর্য্যও যায়, প্রাণও শুকায়। এ-সত্য যে অভ্রান্ত তাহা ত না বলা চলে না। শরৎচন্দ্র সাহিত্যে বাস্তবতার সমগ্র রূপের উপস্থাপনায় উৎসাহী রনন। যৌনজীবন মানুষের জীবনের একটি প্রধান অংশ, শরৎচন্দ্র ওই বাস্তবতার উপস্থাপনায় কুণ্ঠা ও অস্বস্তি বোধ করেন।

'সাহিত্যে নবত্ব' (প্রবাসী, অগ্রহায়ন ১৩৩৪) প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ আধুনিক বায়লা সাহিত্যকে তীব্রভাবে আক্রমণ করেন। এ-প্রবন্ধে শিল্পগুণসমৃদ্ধ 'প্রকৃত সাহিত্যের' বৈশিষ্ট্য নির্দেশের পাশাপাশি রবীন্দ্রনাথ নির্দেশ করেন আধুনিক সাহিত্যের তুচ্ছতা ও নোংলা চারিত্র। রবীন্দ্রনাথ আধুনিককাল রূপে চিহ্নিত সময়কে বলেন সাহিত্যের সায়াহ্নকাল। আধুনিক লেখকদের বাস্তবতার উপস্থাপনকে বলেন, পাকের মাতুনি সাহিত্য যখন শক্তিমান থাকে তখন সে চিরন্তনকেই নবরূপে প্রকাশ করে। এ-ই হচ্ছে তার অপূর্বতা ও ওরিজিন্যালিটি। কিন্তু কখনো কখনো সাহিত্যের এ-শক্তি ফুরোয়, তখন সাহিত্য পৌছোয় শেষ দশায়; শুরু হয় সাহিত্যে বিকৃতির কাল। আধুনিক কাল হচ্ছে শেষদশার ডপরিচায়ক এবং আধুনিক লেখকরা শেষদশার নান্দীকার। এ-বিকৃতির কালে অসংযম ও মাতলামিই গণ্য হয় পৌরুষ বলে। তঁঅর মতে আধুনিকদের বাস্তবতার সকলস্তর উপস্থাপনার প্রবণতা অসংযম ও মাতলামিরই নামান্তর। রবীন্দ্রনাথ আধুনিকদের বাস্তবতামনস্কতাকে বিদ্রুপ করে বলেন, জল যাদের ফুরিয়েছে তাদের পক্ষে আছে পাঁক। তারা বলে, সাহিত্য ধারায় নৌকা চলাচলটা অত্যন্ত সেকেলে;

আধুনিক উদ্ভাবনা হচ্ছে পাকের মাতুনি-এতে মাঝিগিরির দরকার নেই-এটা তরিয়ে যাওয়া রিয়ালিটি।৮৬ আধুনিক লেখদের বাস্তবতজীবন থেকে নির্বিচারে বিষয়-উপাদান গ্রহণের প্রবণতা রবীন্দ্রনাথের কাছে দূষণীয়। সাহিত্যে দারিদ্র্য ও যৌনজীবনবাস্তবতা উপস্থাপনার প্রবণতাকে রবীন্দ্রনাথ গণ্য করেন পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণ বলে। তাঁর মতে এ-আধুনিক লেখকরা প্রতিভাহীন ও অপটু; প্রতিভাহীনতা ও অপটুত্বের কারণেই তারা নোংলা ও কুৎসিতকে দেখিয়ে বাজার মাত করার প্রয়াস চালাচ্ছেন। তিনি আধুনিকদের রচনাকে সাহিত্যসৃষ্টি বলে গণ্য করেন না; কারণ এসব রচনায় চিরন্তন সুন্দর ভাবের দ্যোতনা নেই। এতে আছে মুধু বিলেতি ভাবদারার অনুকরণে লালসা, অসংযম ও দারিদ্যেকে চড়া রঙে চিত্রিত করার ঝোঁক। তিনি বলেন :

> বিলিতি পাকশালায় বারতীয় কারির যখন নকল করে, শিশিতে কারি-পাউডর বাধা নিয়মে তৈরি করে রাখে; যাতে তাতে মিশিয়ে দিলেই পাঁচ মিনিটের মধ্যেই কারি হয়ে ওঠে-লঙ্কার গুড়ো বেশি থাকাতে তার দৈন্য বোজা শক্ত হয়। আধুনিক সাহিত্যে সেই রকম শিশিতে সাজানো বাধি বুলি আছে-অপটু লেখকের পাকশালায় সেইগুলো হচ্ছে রিয়ালিটির কারিপাউডার। ওর মধ্যে একটা হচ্ছে দারিদ্র্যের আস্ফালন, আর-একটা লালসার অসংযম।[৩৯]

এ-সব মন্তব্য তেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে রবীন্দ্রনাথ জীবনবাস্তবতার সামাগ্রিক চিত্রণের পক্ষপাতী তো ননই বরং সমগ্রী জীবন উপস্থাপন তাঁর কাছে আপত্তিকর। তাঁর ভাববাদী রোম্যান্টিক দৃষ্টিতে বাস্তবতার নিবারণ নগ্নরূপ কুৎসিত ও অসহনীয় বলে বোধ হয়েছে। আদুনিকেরা তাদের রচনায় উপস্থাপিত করতে চেয়েছেন জীবনাবাস্তবতার সকল স্তল। আধুনিকদের এ-দৃষ্টিভঙ্গি রবীন্দ্রনাথকে পীড়িত ও ক্ষুব্ধ করেছে এবং তিনি নানাভাবে তাদের তুচ্ছতা প্রতিপাদনে তৎপর হয়েছেন। তিনি দারিদ্র্য ও যৌনজীবন উপস্থাপনার প্রবণতাকে শস্তা সাহিত্যসৃষ্টির মোহ বলেও অভিহিত করেন। তার মতে :

দেশের দারিদ্যকে এরা কেবল নব্যসাহিত্যের নূতনত্বের ঝাজ বাড়াবার জন্যে সর্বদাই মাল-মসলার মতো ব্যবহার করেন। এই ভাবুকতার কারি পাউডারের যোগে একটা কৃত্রিম শস্তা সাহিত্যের সৃষ্টি হয়ে উঠেছে। এই উপায়ে বিনা প্রতিভায় এবং অল্পশক্তিতেই বাহবা পাওয়া যায়, এই জন্যেই অপটু লেখদের পক্ষে এ একটা মস্ত প্রলোভন এবং অবিচারক পাঠকের পক্ষে একটা সাহিত্যিক অপথ্য।[৮৮]

রবীন্দ্রনাথের মতে সাহিত্যে কুৎসিত ও স্থুলবাস্তবতা উপস্থাপনা করা অনুচিত, কারণ সাহিত্যে ভালোমন্দ, তুচ্ছতা মহত্ত্বে মূল্যভেদ আছে। তিনি বলেন:

> কিছুর সঙ্গে কিছুরই মূল্যভেদ যদি সাহিত্যেও না থাকে তা হলে পৃথিবীতে সকল লেখাইতো সমান দামের হয়ে ওঠে। কেননা অসীমের মধ্যে নি:সন্দেহেই তাদের সকলেরই এক অবস্থা-খন্ড দেশকাল পাত্রের মধ্যেই তাদের মূল্যভেদ। আম এবং মাকাল অসীমের মধ্যে একই, কিন্তু আমরা খেতে গেলেই দেখি তাদের মধ্যে অনেক প্রভেদ।[৪০]

বাস্তবঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠার জন্য সাহিত্যে লালসার চিত্রগণ ও তার কাছে আপত্তিকর। কারণ পাঠকের মনে এই আদিম প্রবৃত্তির উত্তেজনার সঞ্চার করা অতি অল্পেই হয়[৪১] বলে এ-পথে সহজেই খ্যাতি মেলে। শস্তা খ্যাতির মোহগ্রস্ত লেখদের পক্ষে শিল্পসৃষ্টি করা সম্ভব নয় বলে রবীন্দ্রনাথ মনে করেন। লক্ষণীয় যে বিপিনচন্দ্র পাল ও অন্যরা রবীন্দ্রনাতের বিরুদ্ধে যে-ধরনের অভিযোগ এনেছিলেন, রবীন্দ্রনাথও আধুনিক লেখদের বিরুদ্ধে আনেন একই ধরনের অভিযোগ। রক্ষণশীলেরা রবীন্দ্রসাহিত্যকে বিদেশি প্রভাবজাত বলে নিন্দা করেন। 'বাস্তব' প্রবন্ধে রক্ষণশীলদের উদ্দেশ্য করে রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'আমাদের কালের লেখদের মোটা অপরাধ এই যে আমরা ইংরেজি পড়েছি।'[৪২] 'সাহিত্যবিচার' (প্রবাসী, কার্তিক ১৩৩৬) প্রবন্ধে তিনি বলেন আমাদের সাহিত্য যে ইউরোপের প্রভাবে উজ্জীবিত সেটা গৌরবের কথা; এবং বলেন : 'সাহিত্য বিচারকালে বিদেশী প্রভাবের বা বিদেশী প্রকৃতির খোটা দিয়ে বর্ণ সংসকরতা বা ব্রাত্যতার তর্ক যেন না তোলা হয়।'[৪৩] রবীন্দ্রনাথই আবার আধুনিকদের পাশ্চাত্য প্রভাবকে অন্ধ অনুকরণ বলে নিন্দা করেন। নবীন সাহিত্যকে তিনি বে-আব্রু দেশকালের সঙ্গে সম্পর্কহীন বলে অভিযুক্ত করেন এবং নবীন সাহিত্যের বে-আব্রুতাকে বিদেশের আমদানি বলে নিন্দা করেন।[৪৪]

আধুনিক লেখকদের বাস্তবতাঘনিষ্ঠ সাহিত্যসৃষ্টির প্রবণতাকে রবীন্দ্রনাথ মনে করেন বাস্তবতা উপস্থাপনার নামে অনাচার। এ-অনাচারের প্রতিকারের জন্য সজনীকান্তের প্ররোচনায় রবীন্দ্রনাথ এক সাহিত্যসভা আহ্বান করেন। যদিও প্রকাশ্যে এ-সভাকে বলা হয় আধুনিক লেখকগোত্র ও শনিবারের চিঠি গোত্রের মধ্যে ঐক্যস্থাপনের প্রয়াস; তবে তরুণ লেখদের সামনে তাঁদের অনাচার ও শস্তাসাহিত্য সৃষ্টির অপ্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরার তাগিদই রবীন্দ্রনাথকে প্রধানত এ-সভা ডাকতে অনুপ্রাণিত করে। শনিবারের চিঠি প্রথম থেকেই আধুনিক সাহিত্যবিরোধী, যা প্রকাশ পায় ব্যঙ্গবিদ্রূপ ও আক্রমণের মধ্য দিয়ে। আধুনিক সাহিত্যের প্রতি বিদ্রুপাত্মক ও আক্রমণাত্মক এ-মনোভাবের কারণে আধুনিক লেখকগোত্রের সঙ্গে শনিবারের চিঠির সম্পর্ক ছিলো তিক্ত। তবে শনিবারের চিঠি-র সংকীর্ণ রক্ষণশীল আক্রমণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গি রবীন্দ্রনাথ বেশ পছন্দ করতেন। আধুনিকদের প্রতি ওই পত্রিকার বিদ্রূপ আক্রমণকে তিনি একটি চিঠিতে আর্ট বলে প্রশংসা করেন।[৯৪] আধুনিক লেখদের বিদ্রূপ ও আক্রমণ করার জন্য রবীন্দ্রনাথ মবিারের চিঠিকে এক রকম অনুপ্রেরণাই

দিয়েছেন। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যয়কে লেখা চিঠিতে (২৩ পৌষ ১৩৩৪) তিনি বলেন, "শনিবারের চিঠি"তে ব্যঙ্গ করবার একটা অসামান্যতা অনুভব করেছি। বোঝা যায় যে, এই ক্ষমতাটা আর্ট-এর পদবীতে গিয়ে পৌছেছে।'[৪৫] রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক আহূত সাহিত্যসভা ১৩৩৪ বঙ্গাব্দের ৪ঠা ও ৭ই চৈত্রের জোড়াসাকোর বিচিত্রা ভবনে রবীন্ত্রনাথের সভাপতিতেআব অনুষ্ঠিত হয়। ৪ঠা চৈত্রের সভায় শনিবারের চিঠি গোত্র উপস্থিত থাকেনি। ওই সভার ওপর লেখা একটি প্রতিবেদন বাংলার কথা নামক পত্রিকায় (৬ চৈত্র ১৩৩৪) আধুনিক লেখদের পক্ষ থেকে প্রকাশিত হয়; ওই বিবরণ পড়ে রবীন্দ্রনাথ ক্ষুব্ধ হন। সজনীকান্তের ভাষ্য থেকে জানা যায় 'অতি আধুনিকদের' লেখা ওই প্রতিবেদন ছিলো প্রথমদিনের সভার এক সম্পূর্ণ কল্পিত মিথ্যা বিবরণী, যা প্রকাশিত হলে রবীন্দ্রনাথ উত্তেজিত হইয়া ওঠেন এবং পরদিন ৭ই চৈত্র পুনরায় সভা ডাকেন।[৪৬] এ-সাহিত্যসভায় রবীন্দ্রনাথের প্রথম দিনের বাষণ সাহিত্যরূপ নামে প্রবাসী পত্রিকায় (বৈশাখ ১৩৩৫) মুদ্রিত হয় এবং দ্বিতীয় দিনের আলোচনা-ব্যাখ্যা- প্রশ্নোত্তর সাহিত্য সমালোচনা নামে প্রবাসীতে (জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৫) প্রকাশিত হয়।

সাহিত্যরূপ (১৩৩৫) প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ আধুনিক লেখদের নবযুগ প্রবর্তনের দাবির অসারতা প্রতিবাদ করার চেষ্টা করেন। আধুনিকদের উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন, নবযুগের কোনো সাহিত্যনায়ক যদি এসে থাকেন তাঁকে জিজ্ঞাসা করব, সাহিত্যে তিনি কোন নবযুগের অবতারণা করেছেন।'[৪৭] আধুনিক লেখদের বাস্তবতামনস্কতাকে বিদ্রুপ করে বলেন, কয়লার খনি বা পানওয়ালীর কথা অনেকে মিলে লিখলেই কি নবযুগ আসে।'[৪৮] আধুনিকদের বিষয়-প্রধান সাহিত্যসৃষ্টির প্রবণতাকে তিনি অপ্রকৃতিস্থতার লক্ষণ বলেও অভিহিত করেন।[৪৯] রবীন্দ্রনাথ বলেন, বিষয়প্রধান সাহিত্যই যদি এই যুগের সাহিত্য হয় তাহলে বলতেই হবে এটা সাহিত্যের পক্ষে যুগান্ত।'[৫০] সাহিত্য সমালোচনা (১৩৩৫) রচনাটিতে রবীন্দ্রনাথ তরুণ লেখদের ভগবান, প্রেম, মহত্ত্ব প্রভৃতি উন্নত আদর্শ-বিশ্বাস প্রত্যাখ্যান করার প্রবণতাকে আক্রমণ করেন। তার মতে এ-প্রবণতা সুস্থতার পরিচায়ক নয়, এটি অসুস্থতার ও বিকারের লক্ষণমাত্র। তিনি তরুণ লেখদের এ-প্রভণতাকে স্রোতক্ষীণ হয়ে পাঁক প্রধান হয়ে ওঠা বলে অভিহিত করেন।[৫১] আধুনিক সাহিত্যের তুচ্ছতা নির্দেশ করে তিনি বলেন :

> যে জিনিস বরাবর সাহিত্যে বর্জিত হয়ে এসেছে, যাকে কলুষ বলি, তাকেই চরম বর্ণনীয় বিষয় করে দেখানো একশ্রেণীর আধুনিক সাহিত্যকদের একটা বিশেষ লক্ষ্য। এবং এটাকে অনেকে স্পর্ধার বিষয় মনে করেন। কেউ কেউ বলছেন, এ-সব প্রতিক্রিয়ার ফল। আমি বলব প্রতিক্রিয়া কখনোই প্রকৃতিস্থতা নয়, তা ক্ষণস্থায়ী অবস্থামাত্র প্রকাশ করে, তা চিরন্তন

> হতে পারে না। যেমনতরো কোনো সময় বাতাস গরম হয়ে পতিক্রিয়ায় ঝড় আসতে পারে অথচ কেউ বলতে পারেন না, এরপর থেকে বরাবর কেবল ঝড়ই উঠবে।[৫২]

সুকুমার সেন বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (চতুর্থ খন্ড) গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিকদের বিরোধের বিভ্রান্তিকর তথ্য দিয়েছেন। তিনি জানিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ আধুনিক লেখদের প্রতি কোনো বিরোধ বা বিরূপতা প্রদর্শন করেননি, বরং একতরফা আধুনিকরাই রবীন্দ্রনাথকে উত্ত্যক্ত ও আক্রমণ করে চলেন। সুকুমার সেনের মতে সহিষ্ণু ও ক্ষমাশীল রবীন্দ্রনাথ আধুনিকদের অন্যায়-অশোভন আচরণ ও আক্রমণ সহ্য করেন। আধুনিকদের নোংলা সাহিত্যসৃষ্টির অনাচারও রবীন্দ্রনাথ নি:শব্দের সয়ে গিয়েছিলেন বলে তিনি উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, ... অতি আধুনিক সাহিত্যের নামে যে কাদাখেড়ু চলিতেছিল তাহা রবীন্দ্রনাথকে অত্যন্ত বিচলিত করিয়াছিল। কিন্তু ইহার বিরুদ্ধে তাহার কিছু করিবার ছিল না। তাঁহার প্রতি "অতি আধুনিকদের" অপ্রসন্নতা একরম স্বত"সিদ্ধ ছিল,[৫৩] কিন্তু প্রাপ্ত বিভিন্ন তথ্য ও রবীন্দ্রনাথের আধুনিক বাংলা সাহিত্য বিষয়ক নানা প্রবন্ধের ওপর বিথি্ত করে বলা যায় যে আধুনিক লেখকরা নয়, বরং রবীন্দ্রনাথই তার প্রতিভাহীন রক্ষণশীল ভক্তদের প্ররোচানায় আধুনিক লেখদের নানাভাবে বিদ্রূপ-আক্রমণ ও অবজ্ঞা প্রদর্শন করে ছিলেন। আধুনিকেরাই এ-সব বিদ্রূপ-উপেক্ষা প্রায় নি:শব্দে সয়ে চলেন। সুকুমার সেন বিচিত্রা ভবনে রবীন্দ্রনাথের আহূত সাহিত্যসভা প্রসঙ্গেও ভ্রান্ত তথ্য দিয়েছেন। তিনি বলেন আধুনিকেরা রবীন্দ্রনাথকে নানাভাবে আক্রমণ করেছেন আবার নিজেদের দু:সময়ে তারা রবীন্দ্রানাথের কাইে সাহায্য প্রার্থনা করেছেন; প্রতিপক্ষদ্বারা আক্রান্ত আধুনিকেরা মুক্তি ও ত্রাণের জন্য রবীন্দ্রনাথেরই দ্বারস্থ হন। তিনি জানিয়েছেন, "অতি আধুনিক" সাহিত্যের লনুরাগী অথচ রবীন্দ্রনাথের হেভাজন দুই চারিজন ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথকে ধরিয়া বসিলেন অতি আধুনিক ও অনতি-আধুনিক সাহিত্যের দ্বন্দ্ব মিটাইয়া দিবার জন্য। রবীন্দ্রনাথ মধ্যস্থতা করিয়ে রাজি হইলেন।'[৫৪] প্রকৃতপক্ষে সজনীকান্তের প্ররোচনায় রবীন্দ্রনাথ এ-সভা আহ্বান করেন। বাহাতে এ-সভা ছিলো শনিবারের চিঠি ও আধুনিকদের মধ্যে ঐক্য স্থাপনের প্রচেষ্ঠা, তবে মূলত এ-সভাকে রবীন্দ্রনাথ ব্যবহার করেন তরুণ লেখদের রচনা সম্পর্কে তার মনোভাব জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে। আধুনিক লেখদের কিছু প্রবণতা তার কাছে অনাচার বলে মনে হয় এবং এ-সাহিত্য তার কাছে প্রতীয়মান হয় শস্তা সাহিত্যরূপে। এ-সভায় রবীন্দ্রনাথ আধুনিকদের শস্তা মসাহিত্যসৃষ্টির অপ্রয়োজনীয়তা নির্দেশে তৎপর হন। এ-সভা অতি আধুনিক সাহিত্যের অনুরাগী অথচ রবীন্দ্রনাথের ভোজন কারো অনুরোধেও আহূত হয়নি।'[৫৫] রবীন্দ্রনাথ কেন? আসলে রবীন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্যে একটি 'প্রতিবান' য়ে দাড়িয়েছিলেন। তার মতামতের গুরুত্ব অনেকে দিতেন। তাই ঘরকর্মের বিচার সালিশ ভদ্রতার জন্য এড়াতে চাইলেও দায়সারা কোন মতামত

দেননি। তাঁর গুরুত্ব মাফিক সত্যমূল্যই দিয়েছেন। শনিবারের চিঠির সম্পাদক রক্ষণশীল ও সংকীর্ণ সজনীকান্ত দাসের প্ররোচনায় রবীন্দ্রনাথ এ-সভা আহ্বান করেন। সজনীকান্ত ছিলেন রবীন্দ্রানুরাগী এবং আধুনিক সাহিত্যের ঘোরবিরোধী।

অনিবার্যভাবে এরা শনিবারের চিঠি'র আক্রমণের লক্ষ্যে হয়ে দাঁড়ালেন। এদের অনেকের রচনায় এমন অনেক কতাই থাকত, যা এতোবৎকাল কেউই লেখেননি। সমাজের অনেক নীচুতলার কথা, হীনতার কথা, আবেগের কথা এরা লিখতে আরম্ভ করেছিলেরন। ফলে বিচলিত হয়েছিলেন অনেকেই। আাবর অনেকে এদের উৎসাহও দিয়েছেন। সজনী দাস স্বাভাবিকভাবেই এদের বিরুদ্ধে নামলেন। তিনি শনিবারের চিঠির সংখ্যার পর সংখ্যায় এই সাহিত্যেকদের বিদ্রূপে বিদ্ধ করতে লাগলেন। কিন্তু এটা তার যথেষ্ট মনে না হওয়অয় তিনি রবীন্দ্রনাথকে টেনে আনতে চাইলেন এর মধ্যে। উদ্দেশ্য স্পষ্ঠ। রবীন্দ্রনাথকে দিয়ে যদি এই সব সাহিত্যিকদের সম্বন্ধে বিরূপ মন্তব্য করিয়ে নেওয়া যায়, তাহলেই সবচেয়ে তার বড়ো আদালতে জয়লাভ ঘটে। সেজন্য তিনি রবীন্দ্রনাথকে এ বিষয়ে চিঠি লিখলেন। তারিখটা আগেই বলেছি–২৩ ফাল্গুন ১৩৩৩। বিষয়টা সজনীকান্ত দাসের আত্মস্মৃতিতে নিজের জবানিতেই শোনা যাক।

২৩শে ফাল্গুন ১৩৩৩ তারিখে শান্তিনিকেতনে তাঁহাকে এক দীর্ঘ পত্রাঘঅত করিলাম। তখনকার বাংলাসাহিত্যে, আমার মতে যে সকল অনাচার চলিতেছিল, আমি সেই সকলের উল্লেখ করিয়া তৎপ্রতি কবির দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া তাঁহার দ্বারাই প্রতিকার প্রার্থনা করিয়াছিলাম। তাঁহারই আগেকার সাহিত্য সমালোচনা হইতে নিম্নলিখিত উক্তিটি উদ্ধৃত করিয়া আমি তাঁহাকে সচেতন ও সক্রিয় হইতে অনুরোধ জানাইয়াছিলাম–

পৃথিবীতে যাহা কিছু ঘটে তাহাই যে কাব্যে অঙ্কিত হইবে এমন কোনো কথা নাই। .. কেবল কি পাপচিত্র আঁকিবার জন্যই পাপচিত্র আকা? যাহাতে বিশ্বজনীন নীতি নাই, তাহা কি কাব্য হইতে পারে?

সজনীকান্ত দাসের রবীন্দ্রনাথকে লেখা এই চিঠি সম্বন্ধে প্রতিবাদী পক্ষ কী বলেন, সেটা একবার মোনা যাক। অচিন্তাকুমার সেনগুপ্ত তঁঅর 'কল্লোল যুগ' পুস্তকে এই বাদানুবাদ সম্পর্কে লিখেছেন।

'তেরোশো তেত্রিশ সালের ফাল্গুনে শনিবারের চিঠির সজনীকান্ত দাস রবীন্দ্রনাথের কাছে আর্জি পেশ করলেন। যেন তিনি কত বড় অধিকারী, সমাজের পক্ষ থেে কত বড় ভার দেওয়া হয়েছে তাঁকে–এই মামলার এইটুকু আসল রসিকতা।'

বলে দিতে হয় না, কথাগুলিতে সজনী দাসের প্রতি ঠাট্টার সুর বেজেছে। এরপর তিনি চিঠিটি বিস্তারিতভাবে পেশ করেছেন। সজনীকান্ত দাস সে চিঠিতে সরাসরি 'কল্লোল' এবং 'কালিকলম' পত্রিকার নাম করে দোষারোপ করেন। তিনি অভিযোগ করেন যে এইসব পত্রিকায় সাহিত্যের নামে এমন সব লেখা চলছে যা প্রচলিত রীতি ভঙ্গ করে চলে, যৌনতত্ত্ব সমাজতত্ত্ব বিষয়ে লেখা হয়, সম্মানিত পারিবারিক সম্পর্কবিরুদ্ধ সম্বন্ধস্থাপনের কাহিনী প্রকাশিত হয় এবং রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে যদি মতামত পাওয়অ যায় তাহলে তা সাধারণের কাছে গ্রহ্য হবে।

এই চিঠির উত্তরে রবীন্দ্রনাথ যা লিখেছিলেন্ু ভয় পক্ষই তার উল্লেখ করেছেন- যদিও উভয়ের ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ বিপরীত। রবীন্দ্রনাথের চিঠির কথা বলতে গিয়ে অচিন্ত্যকুমার লিখেছেন: 'রসিকতাটা বুঝতে পেরেছিলেন রবীন্দ্রনাথ তাই সরাসরি খারিজ করে দিলেন আর্জি লিখলেন:

কল্যাণীয়েষু,

আধুনিক সাহিত্য আমার চোখে পড়ে না। দৈবাৎ কখনো যেটুকু দেখি দেখতে পাই হঠাৎ কলমের আব্রু ঘুচে গেছে। আমি সেটাকে সুশ্রী বলি এমন ভুল করো না। কেন করিনে তার সাহিত্যিক কারণ আছে, নৈতিক কারণ এস্থলে গ্রাহ্য নাও হতে পারে। সুসময় যদি আসে আমার যা বলবার বলব।

এই ক্ষুদ্র চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ বিষয়টা নিয়ে সোজাসুজি কথা বলতে না চাইলেও, তাঁর প্রবণতাটা এতে ধরা পড়ে। সজনীকান্ত দাস সামাজিক কারণে যে সব লেখার বিরুদ্ধতা করতে চাইছেন, রবীন্দ্রনাথের কাছে কিন্তু সেই সামাজিক বা নৈতিক কারণ বিচার্যই নয়। তিনি সাহিত্যিক কারণ, অর্থাৎ সত্য করে লেখা হয়েছে কি হয়নি, তার ওপরেই বিচার করতে চেয়েছেন। নতুন যারা লিখছিলেন, এতে তাদের উল্লসিত হওয়ার কিছু নেই, কারণ সত্য হয়ে না উঠলে তা সাহিত্যই হতে পারে না। ওদিক সজনীকান্ত যা নিয়ে আক্রমণ করতে চান, সেই নৈতিকতাকেও রবীন্দ্রনাথ বাতিল করে দিয়েছেন। কবির মনের উদারতা এখানে লক্ষণীয়।

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত এই যে চিঠিটি তাঁদের হয়ে দাখিল করেছেন, ওই একই চিঠিতে সজনীকান্ত দাসও স্বপক্ষের সমর্থন খুঁজে পেয়েছেন। তিনি চিঠির উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন:

'সুসময় আসিতে বিলম্ব হয় নাই। ... ১৩৩৪ সালের আষাঢ় মাসে বিচিত্রা আবির্ভূত হইল। দ্বিতীয় সংখ্যায় অর্থাৎ শ্রাবণের বিচিত্রায় রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যধর্ম নামক ঐতিহাসিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ঐতিহাসিক এই কারণে যে, ইহা লইয়া বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে ব্যাপক ও গুরুতর আন্দোলন আরম্ভ হয়। এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ আধুনিক সাহিত্যের বিরুদ্ধে কী লেখেন তাহা নুতন করিয়া জানিবার প্রয়োজন আছে।'

সজনীকান্ত দাস 'সাহিত্যধর্মে'র যে উর্দ্ধতিটি দিয়েছে, সেখানে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন বিদেমের অনুকরণে যে আব্রুহীনতা বাংলা সাহিত্যে এসেছে, তা নিত্য নয়। উম্মত্তের মতো পাক নিয়ে হেলি খেললে মানুষ রঙিন হয় না, মলিন হয়। রসের হোলিখেলায় সত্রের নাম করে পাকের স্থান যাঁরা করে দিতে চান তারা যথার্থ রসকে প্রবঞ্চিত করেন। আধুনিক সাহিত্য এই বাহাদুরি দেখিয়ে নাম করতে চায়।

ওই উদ্ধৃতির পরে সজনীকান্ত দাস বলছেন যে 'সাহিত্যধর্ম' প্রবন্ধে নৈর্ব্যক্তিক ভাবে কারো নাম না করেই বক্তব্য পেশ করেছেন রবীন্দ্রনাথ। নিত্য সাহিত্য সম্বন্ধে সাধারণ তত্ত্ব জানিয়েছেন এতে।

তাহাতেই নরেশ সেনগুপ্ত ভাদ্রের বিচিত্রায় গুরুতর প্রতিবাদ জানাইলেন (সাহিত্যধর্মের সীমানা), কিন্তু ভাদ্রের শনিবারের চিঠিতে আমার প্রবন্ধে অনেকগুলি নাম কিলবিল করিয়া বাহির হইয়া পড়িল। ভীরু শরৎচন্দ্রের প্রমাদ গণিলেন, বিশেষ করিয়া নরেশচন্দ্রের বিরুদ্ধে তাহার অভিমত স্পষ্টাক্ষরে ব্যক্ত করিয়াছিলেন দেখিয়া তিনি ভয় পাইলেন। তাড়াতাড়ি সামলাইবার জন্য আশ্বিনের বঙ্গবাণীতে 'সাহিত্যের রীতি ও নীতি' নামক এক দীর্ঘ প্রবন্ধ ফাঁদিয়া বসিলেন। প্রবন্ধটি 'ধরি মাছ না চুই পানি' প্রবাদের একটি প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। প্রবন্ধে ছিল:

উভয়ের (রবীন্দ্রনাথ ও নরেশচন্দ্র) মতদ্বৈধ ঘটিয়াছে প্রধানত সাহিত্যের[৫৬] আব্রুতা ও বে-আব্রুতা লইয়া। ইতিমধ্যে বিনাদোষে আমার অবস্থা করুণ হইয়া আসিয়াছে। শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত আমার মতামত এমনই প্রাঞ্জল ভাষায় ব্যক্তি করিয়াছেন যে... পালাইবার আর পথ রাখেন নাই।'

এই দীর্ঘ বিবরণ থেকে স্পষ্ট হয়ে যায় যে সাহিত্যের যে ধরণটা তখন তেরি হচ্ছিল–যাকে আব্রুতা অথবা বে-আব্রুতা বলা হয়েছে, সেটা নিয়ে সাহিত্যিক মহলে বেশ তোলপাড় চলছে। এমনকি, এইবাদ-প্রতিবাদে শরৎচন্দ্রের মতো ব্যক্তিত্ব সাফাই দিতে এসেছিলেন। সজনীকান্তের পক্ষে শরৎচন্দ্রকে 'ভীরু' বিশেষণেউপস্থিত করা কতদূর সৌজন্যসম্মত হয়েছে, সেকথা না বলেও এই প্রসঙ্গে দুটি ঘটনা উল্লেখ করা যেতে পারে।

সুধাকান্ত রায়চৌধুরী (রবীন্দ্রনাথের এককালীন সচিব) ১৩৬৮ (১৯৬১) ফাল্গুন 'শনিবারের চিঠি'র সজনীকান্ত স্মরণ সংখ্যায় লিখেছেন:

সজনীর অনেক মতকে রবীন্দ্রনাথ মেনে নিতেন না। একবার রবীন্দ্রনাথ সজনীকে বলেছিলেন, যে নিজের কৃতিত্বে সকলের কাছে সম্মান শ্রদ্ধা পাবার যোগ্য তোমরা তার ছোটখাটো দোষ বার ক্করে নীচে নামাতে চাও।। এতে ক্ষতি হয় দেশের। রামানন্দবাবুর মতো লোক বাংলায় একজন আছেন,

তিনি যা দিচ্ছেন দেশকে তার ঋণ আগে শোধ কর। তার সম্বন্ধেও তোমাদের বিরূপ ভাব ইত্যাদি। রবীন্দ্রনাথের ঐ মন্তব্য সজনীর মনের পরিবর্তন ঘটাল।'

ওই সংখ্যাতেই জগদীশ ভটাটাচার্য 'রবীন্দ্রনাথ ও সজনীকান্ত' প্রবন্ধে লিখেছেন:

'সজনীকান্তের অপকীর্তির সবচেয়ে অমার্জনীয় দৃষ্টান্ত হল রবীন্দ্রজয়ন্তী উপলক্ষে (১৯৩১) তাঁর দুর্বিনীত রবীন্দ্রবিদুষণ। গুরুহত্যার অপরাধের মতো সজনীকান্তের জীবনের এই কলঙ্ক অনপনেয়। সেউ কুখ্যাত জয়ন্তী সংখ্যা (মাঘ ১৩৩৮) সম্পর্কে রজনীকান্ত নিজেও তার আত্মস্মৃতিতে বলেছেন– আমাদের প্রতিহিসাপরায়ণতা শালীনতার সীমা লঙ্ঘন করিয়া গেল।[৫৭]

আমাদের মূল কাহিনি থেকে হয়তো কিঞ্চিত সরে গিয়েছি। শুধুমাত্র আমাদের কাহিনীর পটভূমিটা বুঝতে সুবিধে হবে, এই ভেবেই এই চেষ্টা করতে হল। আমরা দেখেছি সজনীকান্ত দাসের চিঠির যে জবাব রবীন্দ্রনাথ দিয়েছিলেন সেটি পড়ে অচিন্ত্যকুমার ভেভেছেন যে কবি সজনীবাবুর আর্জি খারিজ করে দিলেন, আর সজনী দাস ভেবেছেন কবি সুসময়ের জন্য অপেক্ষা করছেন এবং বিচিত্রা প্রকাশিত হলে সেই সুসময় এসে গেল। ঘটনাটির মূল কৌতুক এখানেই।

একদিন রবীন্দ্রনাথের নষ্টনীড় আর ঘরে বাইরে নিয়েও এমনি রোষ প্রকাশ হয়েছিল, সে যুগের সজনীকান্ত ছিলৈন সুরেশ সমাজপতি। কিন্তু এ যুগের সজনীকান্ত ঐ চিঠিতেই লিখেছেন। ঠিক যতটুকু যাওয়া প্রয়োজন তার বেশী সজহনীকান্ত ঐ চিঠিতেই লিখেছেন। ঠিক যুতটুকু যাওয়া প্রয়েঅজন তার বেশী আপনি কখনো যাননি। অথচ যেসব জিনিষ নিয়ে আলোচনা করেছেন সেই সব জিনিষই আধুনিক এই লেখকদের হাতে পড়লে কী রূপ ধারণা করতো ভাবলে শিউরে উঠতে হয়। এক রাত্রি, নষ্টনীড়, ঘরে বাইরে, এরা লিখলে কী হতো ভাবতে সাহস হয় না। যুগে যুগে সজনীকান্তদের একই রকম প্রতিক্রিয়া।'

আমরা দেখতে পাচ্ছি যে দুপক্ষই ভাবছেন রবীন্দ্রনাথ তাঁদের দিকেই আছেন। অচিন্ত্যকমার কল্লোল যুগ' -এ বিবৃতি দিয়েছেন সে সম্ভন্ধে সজনীকান্ত লিখছেন:

আমরা কয়েকজন একক মনিবারের চিঠি একা, বিরুদ্ধ পক্ষের বড় বড় মহারথী একুনে সাতাশটি মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্র। চারিদিকে ত্রাহি ত্রাহি রব উঠিয়া ছিল, সেকালের অতি আধুনিক ও আধুনিকত্বের সমর্থক পত্রিকাগুলির পৃষ্ঠা খুলিলেই ইহার পরিচয় মিলিবে। একমাত্র রবীন্দ্রনাথ আমাদের পক্ষে ছিলেন। শ্রীঅচিন্তকামার সেনগুপ্ত তাহার কল্লোল যুগ এ অনবধানতাবশত রবীন্দ্র প্রসঙ্গে কিছু ভুল সংবাদ পরিবেশ করিয়াছেন। আমিই রবীন্দ্রনাথকে তৎকালীন সাহিত্যের অনাচারের বিরুদ্ধে দাড়াইবার জন্য আহ্বান জানাইয়াছিল মা–ইহা স্বীকার করিয়াও তিনি লিখিয়াছেন,

রবীন্দ্রনাথ সরাসরি খারিজ করে দিলেন আর্জি। আমাদের আবেদনের দুই তিন মাসের মধ্যে তিনি যে সাহিত্যধর্ম প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, আমার আবেদনপত্র ও তাহার জবাবে রবীন্দ্রনাথের প্রতিশ্রুতিপত্র কল্লোল যুগে পুনমুদ্রি করিয়া সেই সত্য স্বীকার করা সত্ত্বেও আর্জি খারাজি করার কথা অন্তত তাঁহার লেখা উচিত হয় নাই।'

দেখা যাচ্ছে যে রবীন্দ্রনাথের জবাবকে একজন ভেবেছেন খারিজপত্র, আরেকজন ভেবেছেন প্রতিশ্রুতিপত্র। সজনীকান্ত দাস এরপরে আরো উৎসাহের সঙ্গে লিখে গিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে রবীন্দ্রনাথের 'সাহিত্যধর্ম' আণবিক বোমার মতো নিক্ষিপ্ত হয়েছিল ১ শ্রাবণ। তারপরে কবি মালয় ভ্রমণে যান, ফিরে আসেন কার্তিকের মাঝামাঝি (অর্থাৎ নভেম্বরের শেষে বা ডিসেম্বরের গোড়ায়)। ১৯২৭ সালেল ২৩ আগষ্ট রবীন্দ্রনাথ প্লানসিউস জাহাজে লেখেন 'সাহিত্যে নবত্ব'। সেই প্রবন্ধ ১৩৩৪ সালের অগ্রাহায়ণ (অর্থাৎ ডিসেম্বরের শেষে) প্রাবাসীতে যাত্রীর ডায়ারি শিরোনামায় প্রকাশিত হয়।

রবীন্দ্রনাথের সেই প্রবন্ধের যে অংশ[৫৮] সজনীকান্ত দাস উদ্ধৃত করেছেন, তাতে কবি বলেছিলেন শক্তিহীন তার অপটুতাকেই চালাবার চেষ্টা করে। নিজের অক্ষমতাকে চাপা দেবার জন্য সে কিছু উত্তেজক বস্তু আমদানি করে থাকে। সাহিত্যে সেই উত্তেজক বস্তু হল, দারিদ্র্য এবং লালসা। যেমন খারাপ রান্নাকে চালিয়ে দেওয়ার উপায় হল খানিকটা রগরগে মশলা ঢেলে দেওয়া, যাতে পাচকের দৈন্য টেরই পাওয়অ যায় না, তেমনি এই সব সস্তা মন-ভোলানো উপকরণের সাহায্যে রচনার ত্রুটিকে চাপা দিয়ে দেওয়া হয়। দারিদ্যে এবং লালসার স্থান নেই তা নয়, জীবনেও আছে, সাহিত্যেও আছে, কিন্তু যখন সেটা শুধু ভঙ্গি হয়ে দাঁড়ায়, তখন তা দুর্বলতা মাত্র।

সজনীকান্ত দাস বলেছেন, এটি হয়েছিল আরো মারাত্মক। হিরোশিমার পর নাগাসিাকি। –'সাহিত্যধর্শে আহত আধুনিক সাহিত্যিকেরা সাহিত্যে নবত্বের আঘাতে মর্মাহত হইলেন। শেষ পর্যন্ত তাহাদিগকে সান্তনা দিবার জন্য রবীন্দ্রনাথকেই সভা আহ্বান করিতে হইল তাহার জোড়াসাকোর বিচিত্রাভবনে। সজনীকান্ত দাস রবীন্দ্রাথের প্রবন্ধেকে আণবিক বোমা বলেছেন, হিরোসিমা নাগাসিকার উদাহরণও দিয়েছেন তার গ্রন্থে। ওই সময়ে আনবিক বোমার কল্পনাও কেউ করেনি। সুতরাং এই উল্লেখ সময়োপযোগী হয়নি। তবে সজনীকান্ত স্মৃতিকথা লিখেছেন অনেক পরে– তখন যুদ্ধ শেষ, তাই স্মৃতিকে ওই বোমার তুলনা দিয়ে দুর্ধর্ষ করতে চেয়েছেন।

এরপরে সজনীকান্ত দাস বলছেন যে কিন্তু তার আগেই কবির অপরাধ গুরুতর হয়ে উঠেছিল সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়কে ২৩ পৌষ ১৩৪৪ (১৯২৮ জানুয়ারি) তারিখে লেখা তাঁর একটি চিঠি

শনিবারের চিঠিতে (মাঘ ১৩৩৪) প্রকাশিত হবার ফলে। চিঠির প্রাসঙ্গিক অংশ, যেটুকু সজনীকান্ত উদ্ধৃতি করেছিলেন, তার খানিকটা পরিচয় নেওয়া যাক–

শনিবারের চিঠিতে ব্যঙ্গ করবার ক্ষমতার একটা অসামান্যতা অনুভব করেছি, বোঝা যায় যে, এই ক্ষমতাটা আর্ট-এর পদবীতে গিয়ে পৌছেছে। ... তারুণ্যটা হলো বয়সের ধর্ম, বিধাতার বিধানে ঐ বয়সটাতে মানুষ আপনি আসে। কিন্তু আজকের দিনের তারুণ্যের ডিগ্রীধারীরা .. বলচে আমরা তরুণ বয়স্ক বলেই বাহবা দাও ... আমরা যুদ্ধ করেচি বলে নয়, প্রাণ দিয়েছি বলে নয়, তরুণ বয়সে যা-ইচ্ছে-াতাই লিখেছি বলে। সাহিত্যের তরফে বলার কথা এই যে, যেটা লেখা হয়েছে সাহিত্যের আদর্শ থেকে হয় ভালো বলব নয় মন্দ বলব, কিন্তু তরুণ বয়সে লেখাটার একটা স্বতন্ত্র আদর্শ খাড়া করতে হবে এ তো আর্জ পর্যন্ত শুনিনি।[৫৯]... ব্যঙ্গরসকে চিরসাহিত্যের কোঠার প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আর্টের দাবী আছে। শনিবারের চিঠির অনেক লেখকের কলম সাহিত্যের কলম, অসাধারণ তীক্ষ্ম সাহিত্যের অস্ত্রশালায় তার স্থান–নব নব হাস্যরূপের র্সষ্টিতে তার নৈপুণ্য প্রকাশ পাবে, ব্যক্তি বিশেষের মুখ বন্ধ করা তার কাজ নয়।

রবীন্দ্রনাথের এই চিঠিতে আধুনিক সাহিত্যিকদের তারুণ্যজনিত অহমিকাকে নিন্দা করা হয়েছে দেখা যায়। শনিবারের চিঠির ব্যঙ্গরচনাকে শিল্প বলে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে এও দেখতে পাওয়অ যায়, তবে সেই সঙ্গে এই শক্তি যে বিপথগামী হচ্ছে, এ ইঙ্গিতও স্পষ্ট। এবারে এই একই চিঠি থেকে অচিন্তা সেনগুপ্ত যেটুকু উদ্ধৃতি দিয়েছেন, সেদিকে একবার তাকিয়ে দেখা যায়। এটুকু বোঝা যাবে যে তারুণদের ক্ষমতাকে রবীন্দ্রনাথ কোথাও কোথাও স্বীকার করে নেওয়া কর্তব্য বলে মেনে নিচ্ছেন, সেই সঙ্গে তদানীন্তন সাহিত্যের বিকৃতি শনিবারের চিঠির অভিবাবকসুলভা শাস্তিদানের প্রয়াসেই আরো বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে, এরকম সাংঘাতিক কথাও বলা হয়েছে। অচিন্ত্যকুমার লিখেছেন:

"রবীন্দ্রনাথ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়কে এক চিঠি লেখেন, সে চিঠি তেরোশো: চৌত্রিশের মাঘ মাসে শনিবারের চিঠিতে প্রকাশিত হয়। তার অংশবিশেষ এইরূপ: সাহিত্যের দোহাই ছেড়ে দিয়ে সমাজহিতের দোহাই দেতে পারো। আমার নিজের বিশ্বাস শনিবারের চিঠির শাসনের দ্বারাই অপরক্ষ সাহিত্যের বিকৃতির উপত্তেজনা পাছে৷ সম্ভবত ক্ষণজীবির আয়ু এতে বেড়েই যায়। ... যে সব লেখক বেআব্রু লেখা লিকেছে, তাদের কারো কারো রচনাশক্তি আছে। যেখানে তাদের গুণের পরিচয় পাওয়া যায়, সেখানে সেটা স্বীকার করা ভালো।"

আশ্চর্য! একই চিঠির অংশবিশেষ দু পক্ষ তাঁদের স্বপক্ষের সাক্ষ্য হিসাবে দাখিল করছেন। কেবল যে অংশে নিজেদের সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য আছে, সে অংশটা সযত্নে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। সামগ্রিক

তত্ত্বটা বুঝতে হলে দুজনের দাখিল করা অংশ দুটো জোড়া লাগালেই দেখা যাবে রবীন্দ্রনাথ দুপক্ষকেই তুল্যমুল্য বিশ্লেষণ করতে চেয়েছেন, এ মামলায় কোনো একতরফের পক্ষে ডিগ্রী পাওয়া সম্ভব নয় বলেই মনে করা চলে।

সুনীতিকুমারকে লেখা রবীন্দ্রনাথের এই চিঠি প্রসঙ্গে সজনীকান্ত শেষকালে বলেছেন–বলছেন অচিন্ত্যকুমারকে বিদ্রুপ করেই;

"এত যে সব কাণ্ড ঘটিয়া গেল, কল্লোল যুগের লেখকের তাহা না জানিবার কথা নয়, তাই আশ্চর্য হই, যখন দেখি তিনি লিখিয়াছেন, শনিবারের চিঠির হয়তো ধারণা হয়েছিল, রবীন্দ্রনাথ আধুনিক লেখকদের উপর সম্পূর্ণ ধীতরাগ নন–তাঁরই প্রশংসার আশ্রয়ে তারা পরিস্ফুট হচ্ছে। এই সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের জোড়াসাকোর বাড়ীর বিচিত্রাভবনে যে বিচারসভা বসে তা উল্লেখযোগ্য। অপূর্ব ভাষণ দিলেন রবীন্দ্রনাথ, সেটি সাহিত্য ধর্ম নামে ছাপা হলো প্রবাসীতে। ... শরৎচন্দ্র প্রতিবাদে প্রবন্ধ লেখেন বঙ্গবাণীতে–সাহিত্যের রীতি ও নীতি। নরেশচন্দ্র শরৎচন্দ্রকে সমর্থন করেন। কল্লোল যুগের ইতিহাস অংশের ইহাই স্বরূপ। বিচিত্রাভবনে সভা অনুষ্ঠিত হয় ৪ঠা ও ৭ই চৈত্র ১৩৩৪–শ্রাবণের বিচিত্রায় (প্রবাসীতে নয়) সাহিত্যধর্ম প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবার ঠিক আট মাস পরে, শরৎচন্দ্র-নরেশচন্দ্রের প্রতিবাদও ততদিনে পুরাতন হইয়া বিস্মৃতির পর্যায়ভুক্ত।"

এখানে দেখাই যাচ্ছে, অচিন্ত্যকুমার সাল তারিখ বা পত্রিকার নামাল্লে খে ভ্রান্তি ঘটিয়েছেন, সেটি স্মৃতিভ্রম হতে পারে। তবু তাঁর মূল তথ্যগুলোর বিশেষ তফাত হচ্ছে না।

কিন্তু বিচিত্রাভবনের সভায় রবীন্দ্রনাথ কী বলেছিরেন? সেই ঐতিহাসিক সভার বিবরণ দেবার আগে সজনীকান্ত দাসের আত্মস্মৃতি থেকে আরো একটু উদ্ধৃত করি– আমাদের নিজস্ব কিছু নজির আছে, যার দবারা আমারা জানি, আধুনিকদের সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের সত্য মনোভাব কি ছিল। ২৮ কার্তিক ১৩৩৪-এ লেখা (ইং ১৯২৭) রবীন্দ্রনাথের একটি চিঠি এই–।'

যে চিঠিটি সজনী দাস উদ্ধৃত কয়েছেন, সেটি তাকেই কবি দিয়েছিলেন। এতে কবি শনিবারের চিঠিকে প্রকারান্তরে ভর্ৎসনাই করেছেন। বলেছেন যে শনিবারের চিঠি অনেক বড়ো বড়ো পণ্ডিতকে ধরাশায়ী যখন করে, তখন এক রকম, কিন্তু যখন মহিলাকেও রেহাই দেয় না, তখন মন সঙ্কুচিত হয়ে যায়। এ চিঠি সজনীকান্ত কেন উদ্ধৃত করেছেন বলা যায় না, কারণ এতে তার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হচ্ছে না।[৬০]

এ চিঠির পরে তিনি কবির কাছে মহিলঅ লেখককে লাঞ্ছিত করার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে আবার আধুনিক সাহিত্য প্রসঙ্গে কবির মত জানতে চান। কবি তার উত্তরে লেখেন:

> কল্যাণীয়েষু, দোহাই তোমাদের শনিবারের চিঠিতে আমাকে টেনো না... প্রবাসীতে যেটা লিখেছি (সাহিত্য নবত্ব) সেটাতেও হয়তো অনেকের গায়ে বাজবে, কারণ গায়ের শিরগুলো অনেকেরই টনটনে হয়ে রয়েছে। .. অল্প কটা দিন রয়েছে –শেষ ব্যবহারের জন্য স্বচ্ছ রাখতে ইচ্ছে করে। তোমার হল সার্জিক্যাল ডিপার্টমেন্ট আর আমার আরোগ্যানের মহল। .. ইতি
>
> ৩ অগ্রায়ণ ১৩৩৪

আধুনিক সাহিত্যের আলোচনায় কবি তিক্ততা বৃদ্ধি করতে চান না, এই উক্তিটি সজনীকান্তের পক্ষে অনুকুল। রবীন্দ্রনাথ এই কলহের মধ্যে যেতে চাইছিলেন না, বেশ বুঝতে পারা যায়। কিন্তু সজনী দাসকে নিবৃত্ত করা অতীব কঠিন কর্ম। আত্মস্মৃতিতে সজনী দাস এর পরে লিখছেন: কলিকাতার সাহিত্যাপ্রাঙ্গণে যে কোলাহল আধুনিক সাহিত্যকে কেন্দ্র করিয়া উত্তরোত্তর প্রবল হইয়া উঠিতেছিল যাহা আসলে আমাদের আহ্বান ও তাঁহার উত্তর সাহিত্যধর্মেরই জের, তাহা তাহার অসহ্য ইয়া উঠিয়াছিল। আমরা তাঁহাকে পত্রাঘাত করিতেছিলাম তর্কের কোলাহলে নামিতে নয়, সম্পূর্ণ দলাদলি নিরপেক্ষভাবে চিরন্তন সাহিত্যের আদর্শ সম্বন্ধে তাহার সুনিশ্চিত সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিতে। তিনি লিখিলেন :

> কল্যাণীয়েষু, চেষ্টা করব কিন্তু কী রকম ব্যস্ত হয়ে আছি তা তোমরা ঠিক বুঝতে পারবে না। এর ওপর হির্বাটলেকচার এখনো লিখতে বসতে পারিনি বলে মন অত্যন্ত উদ্বিগ্ন আছে। ... আমায় তো সবাই মিলে বরখাস্ত করে দিয়েছে।[৬১] যদি না জানতুম যে তারুণেরা চতুর্মুখের মুখোশ পরে আমাকে ভয় দেখাচ্ছে, তা হলে তো মুখ শুকিয়ে যেত। কিন্তু এদের এই সমস্ত পিতামহগিরি নিয়ে যে পেট ভরে হাসব তারো সময় আমার নেই–চতুর্মুখ বোধ হয় এই সমস্ত নকল বিধাতাদের উদ্দাম বঙ্গী দেখে স্বয়ং হাসছেন, তার কাছে তো অগোচর নেই এদের আয়ু কতদিনের। ইতি
>
> ২০ ফাল্গুন ১৩৩৪"

আমাকে ভয় দেখাচ্ছে–এই কথায় বোঝা যায় যে কবির ধারণা হয়েছিল এরা তার ধারাকে নিঃশেষ করতে চায়। কবির এই চিঠিতে আধুনিক সাহিত্যিকরা ক্ষণজীবী, এই কথাই বলা হয়েছে এবং চিঠির বিদ্রূপাত্মক ভঙ্গিটি লক্ষ করবার মতো।

কবি চেয়েছিলেন ব্যাপারটা এড়িয়ে যেতে। কিন্তু তা হল না। প্রত্যক্ষভাবেই তাকে এই দ্বন্দ্বের মধ্যে নামতে হল। প্রথমে ইতস্তত করলেও কবি মন্তব্য করার সময়ে বহুলাংশে তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছেন, সেটা

আমরা দেখতে পাবো। আমরা দেখতে পাবো যে মতামত দেবার বেলায় তিনি খুব একটা রেখেঢেকে কথা বলছেন না। তথাপি এও বুঝতে অসুবিধা হয় না যে কবি চেয়েছিলেন দুপক্ষকেই একটা সমঝোতায় নিয়ে আসতে।

কবি কলকাতার বিচিত্রাভবন-এ সভা ডাকলেন। ১৩৩৪ সালের ৪ ও ৭ চৈত্র (১৯২৮) দুদিন এই সভা বসল। প্রথমদিন শনিবারের চিঠির কেউ উপস্থিত ছিলেন না। এটা একটু আশ্চর্যের, কারণ শনিবারের চিঠিরই বারংবার তাগিদ ছিল এই বিচারসভা বসানোর, তবু কেন তারা কেউ হাজির হননি তার ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। ৬ চৈত্রের বাংলার কথা নামক পত্রিকায় প্রথম দিনের সভার এক সম্পূর্ণ কল্পিত মিথ্যা বিবরণী বেরোল। রবীন্দ্রনাথ এতে উত্তেজিত হয়ে ওঠেন।[৬২] চৈত্র তিনি আবার সভা ডাকেন। উভয়পক্ষই এতে উপস্থিত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ রিপোর্টারদের আর বিশ্বাস না করে দুদিনের সভার বিবরণ নিজেই লিখে দেন। ২৩৩৪ সালের বৈশাখ আর জৈষ্ঠ্যের প্রবাসীতে সে দুটি সাহিত্যরূপ আর সাহিত্যসমালোচনা শিরোনামায় প্রকাশিত হয়।

সাহিত্যরূপ[৬৩] প্রবন্ধের শুরুতে কবি সরাসরি দুপক্ষকে আপসের টেবিলে বসাতে চাইলেন। তিনি বললেন যে পরস্পরকে বুঝতে পারি না বলেই আমরা কলহে প্রবৃত্ত হই। তিনি বললেন যে পরস্পরকে বুঝতে পারি না বলেই আমরা বাংলা সাহিত্য। এই বলে সাহিত্যের বৃহত্তর গণ্ডির মধ্যে দুদলকে নিয়ে যেতে চাইলেন রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু এর পরেই নজরে পড়বে যে যারা নবযুগ নিয়ে আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত করে তুলতে চাইছেন, কবি তাদের ছেড়ে কথা বলেননি। এইখানেই একটু প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতি বোধহয় অসমীচীন হবে না।

সম্প্রতি সাহিত্যের যুগযুগান্তর কথাটার উপর অত্যন্ত বেশি ঝোক দিতে আরম্ভ করেছি। যেন কালে কালে যুগ বলে এক একটা মৌচাক তৈরী হয়। সেই সময়ের বিশেষ চিহ্নওয়ালা কতকগুলো মৌমাছি তাতে একই রঙের ও স্বাদের মধু বোঝাই করে...

সাহিত্যের যুগ বলতে কী বোঝায় সেটা বোঝাপড়া করবার সময় হয়েছে। কয়লার খনিক বা পাওয়ালীদের কথা অনেকে মিলে লিখলেই কি নবযুগ আসে। এইরকমের কোনো একটা ভঙ্গিমার দ্বারা যুগান্তরকে সৃষ্টি করা যায়, একথা মানতে পারব না। বিশেষ একটা চারপাশ পরা সাহিত্য দেখলেই গোড়াতেই সেটাকে অবিশ্বাস করা উচিত। তার মধ্যে পানওয়ালী বা খনিক আপনিই এসে পড়ল তো বালোই। কিন্তু, সেই এসে পড়াটা যে যুগধর্মের একটা কায়দার অন্তর্গত না হয়।'

খুব পরিস্কার মত দিয়েছেন কবি, কোনো বিশেষ ভঙ্গিকে গোড়াতেই নাকচ করে দিয়েছেন। বলেছেন, সাহিত্যে যা-ই আসুক, তাকে সহজে আসতে হবে। জোর করে চাপানো যেন না হয়।

তখন শ্রমিক শ্রেণী নিয়ে লেখার একটা প্রচেষ্টা শুরু হয়েছিল, যার অনেকটাই কবির কাছে কৃত্রিম বলে বোধ হয়ে থাকবে। রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যে বা জীবনে কৃত্রমতা সহ্য করতে পারতেন না, এটা বারংবার দেখা গিয়েছে। সমাজের নিম্নস্তরের মানুষকে নিয়ে উনি লিখতে পারছেন না, তার কারণ তাদের তিনি জানেন না–এই ক্ষোভে তিনি ব্যক্ত করেছেন যে কবিতায়, সেই কবিতাতেই অনুরূপ রচনার কৃত্রিমতাকে সতর্ক করে দিয়েছেন। অনিবার্যভাবে সেই পঙক্তি আমাদের মনে পড়ে যায়।

সত্যমূল্য না দিয়েই সাহিত্যের খ্যাতি করা চুরি,

ভালো নয়, ভালো নয়, নকল সে সৌখীন মজদুরি।'

এই সাহিত্যরূপ প্রবন্ধে কবি আরো বলেছেন[৬৪] যে ইউরোপীয় সাহিত্যের কোনো বিশেষ মেজাজ দেখে আমরা অভিভূত হয়ে পড়ি। কিন্তু সেটা ক্ষণকালীন বিচিত্রাভবন-এ আলোচনা হয়, কবি সেখানেও বলেছিরেন যে দারিদ্র্য দুঃখ শুধুমাত্র বর্ণনা করে গেলেই তা মর্মস্পর্শী হয় না। তাকে সঞ্জীবিত করার জন্য কল্পনার উদ্দীপনা প্রয়োজন। ফুল্লরার বারমাস্যর উদাহরণ দিয়ে তিনি বরেন যে এই কবিতায় দারিদ্যের একটি রিপোর্ট করা হয়েছে মাত্র, কোনো রূপসৃষ্টি হয়নি।

৪ চৈত্রের আলোচনা ানেকটাই সাহিত্যতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা। অবশ্য তৎকালীন বর্তমান সাহিত্যকদের সম্পর্কে খানিকটা কটাক্ষ আছেই। কবি আধুনিক সাহিত্যের রোগনির্ণয় করতে গিয়ে বলেছেন যে রূপসৃষ্টির পরিবর্তে সামাজিক অপ্রকৃতিস্থতা বর্ণনার মোহে পড়েছেন লেখকেরা। ৭ চৈত্রের সভায় কবির আলোচনা আরো তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে। কবি অবশ্য গোড়াতে বলেছেন যে তিনি কারো পক্ষে নেই। আধুনিক সাহিত্য একদিকে এবং তিনি আর একদিকে, এমন কথা ভেবে নিলে ভুল করা হবে।

এই কথায় কবি যেন তার দোষ কাটিয়ে রাখছেন। তিনি কি কোনো সঙ্কোচের বশবর্তী হয়ে এই নিরীহ স্বীকারোক্তিটি করে নিলেন? অথবা পরে তাকে কঠোর হতে হবে বলেই কি প্রথমে এই নরু মনোভাব দেখালেন?

আলোচনা শুরু করে কবি সরাসরি সাহিত্যধর্ম প্রসঙ্গে চলে এলেন। সমাজধর্মের কথা তিনি চিন্তা করেননি, ভেবেছেন সেই সৃষ্টির কথা যা সমাজের সমাজধর্মের কতা তিনি চিন্তা করেননি, ভেবেছেন সেই সৃষ্টির কথা যা সমাজের সাময়িকতার দ্বারা খন্ডিত নয়, মানুষের চিরকালের মূল্যে গৌরবান্বিত। সমস্ত বিকৃতির বিরুদ্ধে সাহিত্য যুদ্ধ করে। তা যদি না হয়, যদি অসংযমকে সাহিত্য। বলে চালানো হয়, তাহলে কবি তার বিরুদ্ধে। দুর্বল অব্সথায় দেহে রোগের আক্রমণ প্রবল হয়ে ওঠে। সংস্কৃত বা ইউরোপীয় সাহিত্যে এ জিনিস ঘটেছে। নিজের দেশের সাহিত্যে অনুরূপ ঘটলে কবিকে কখনো

কখনো কঠিন হতে হয়েছে। যে-কোনো বস্তুকে গণতন্ত্রের নামে সাহিত্য বলে মেনে নেওয়া চলে না।[৬৫] কবি তার বক্তব্যের শেষে সবাইকে আহ্বান করেছেন যাতে তারা বিদ্বিষ্ট না হয়ে নিজেদের কথা বলেন।[৬৬]

আলোচনা প্রসঙ্গে প্রশ্ন উঠল যে ব্যক্তিগত নিন্দাবাদ সাহিত্যের পক্ষে হিতকনককিনা। কবি পরিস্কার রায় দিলেন যে এটি সাহিত্যের নীতির বিরোধী। আঘাতের মধ্যে থাকে নিষ্ঠুরতা। শাস্তি কাম্য নয়, কাম্য সুবিচারের সংমোধন। এমনকি কবি এও বলেন যে তার এই মত শনিবারের চিঠি প্রসঙ্গেই করা হল। শনিবারের চিঠিতে তখন নানা পত্রিকা থেকে যেগুলো তার অসাহিত্য মনে করতেন, সেগুলো মণিমুক্তো নাম দিয়ে ছাপা হত। এগুলো আকর্ষক হত মজা হিসেবে। কবি এই বিকৃতির সংগ্রহকে উদ্দেশ্যের বিপরীত কাজ বলেই মনে করেছেন।

পাশাপাশি আধুনিক সাহিত্য সম্বন্ধে বলতে গিয়ে কবি বললেন যে বর্তমান অবস্থাটা ক্ষণস্থায়ী। সাহিত্যকরা মানুষের অনেক স্বাভাবিক ধর্মকেও অস্বীকার করতে চাইছেন। কিন্তু সাহিত্য গড়ে উঠছে না।[৬৭]

লক্ষ করতে হবে যে রবীন্দ্রনাথ একই সঙ্গে দুই পক্ষকে কশাঘাত করে চলেছেন। শনিবারের চিঠিকে যেমন তার প্রবৃত্তির জন্য নিন্দা করেছেন, তেমনি আধুনিক সাহিত্যের বৃত্তিকেও দিকভ্রান্ত বলে চিহ্নি করতে দ্বিধা করেননি। শনিাবরের চিঠির রচনাকৌশলের প্রশংসা করেলও তার অপব্যবহারে কবি ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন।[৬৮] এই ধরনের হিংস্রতায় চিকিৎসা ব্যর্থ হতে বাধ্য। কবি খুবই নিপূণতার সঙ্গে মন্তব্যটি করেছেন। প্রশস্তির ভঙ্গিটুকু আছে প্রথমে, পরে সমস্তটিকে নস্যাৎ করে দেওয়া হয়েছে। কবি লক্ষ করেছেন যে এই ধরনের সমালোচনা আসলে বিদ্বেষমূলক। কবির এই মন্তব্য বুঝতে পারলে সজনীকান্ত লজ্জিত হতেন। কিন্তু সন্দেহ হয় তিনি এর পূর্ণ তাৎপর্য আদৌ অনুধাবন করতে পেরেছিলেন কিনা–কারণ তার আত্মস্মৃতিতে এই মন্তব্যের উদ্ধৃতি দিয়ে এরই জোরে অচিন্ত্যকুমারের মতামতকে তিনি বিদ্রূপ করতে চেয়েছেন:

কল্লোল যুগের ঐতিহাসিকের যদি এই তথ্যগুলির সঙ্গে পরিচয় থাকিত, তবে তিনি রবীন্দ্রনাথ ও শনিাবরের চিঠির বিরোধ প্রসঙ্গ অত ফলাও করিয়া প্রচার করিতে ইতস্তত করিতেন।

আধুনিক সাহিত্যকওে কবি শেষ পর্যন্ত সতর্ক করে দিয়েছেন। দল বেধে কোনো ভঙ্গিকে আশ্রয় করলে সেটা সাহিত্য হবে না, একথা মনে করিয়ে দিয়েছেন তিনি। দারিদ্রের কথা বলব বলে লিখতে বসলে সেটা ভঙ্গিসর্বস্বই হয়ে দাঁড়ায়। এদিকে থেকে কবির গল্পগুচ্ছর কথা মনে করা চলে। গল্পগুচ্ছর অনেক গল্পেরই প্রধান চরিত্র দারিদ্র মানুষ। কিন্তু তাদের দারিদ্র্যে নিয়ে কবি কোনো বৃত্তে

আবদ্ধ হননি।, সেই মানুষের পরিচয়কেই তার পরিবেশে দীপ্ত করে তুলেছেন। সেই জন্যই সেই গল্প আজো আমাদের বিদ্ধ করে।

কিন্তু রবীন্দ্রনাতের বিচারসভার এই প্রবন্ধরূপ নিয়ে আধুনিকেরা খুশি হননি। বুদ্ধদেব বসু সরাসরি লিখেছিলেন:

রবীন্দ্রনাথের গৃহে সাহিত্য সমস্যা নিয়ে যে দুটি সভা আহূত হয়েছিল তার বিবরণ দিতে গিয়ে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ প্রবাসীতে পর পর দুটি প্রবন্ধ প্রকাশিত করেছেন। বাঙলা দেশের পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য যথাযথরূপে প্রকাশিত হয় না বলে রবীন্দ্রনাথ অভিযোগ করেছেন। কিন্তু প্রবাসীতে তার যে দুটি প্রবন্ধ ছাপা হয়েছে .. সেই দুটি সভার যথাযথ বিবরণ নয়.. ঐ সভায় তিনি যে বতৃতা করেছিলেন তাকে নির্ভর করে দুটি স্বতন্ত্র প্রবন্ধকারে সাহিত্যলোচনা মাত্র। সেই সভার আধুনিক সাহিত্যর পক্ষে থেকে যা যা বলা হয়েছিল তা রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধে সযত্নে বর্জন করা হয়েছে.. এরূপ পক্ষপাতিত্ব আমরা করিবগুরুর কাছে প্রত্যাশা করিনি...

অভিযোগটা গুরুতর। এর কোনো জবাব আমাদের চোখে পড়েনি। কিন্তু আধুনিক সাহিত্রের পক্ষের বক্তব্যে যা ছিল, সেগুলো বুদ্ধদেব বসুই বা কেন নিজে প্রকাশ করেননি? তাহলে এই সভার বিষয়ে যুপক্ষকের বক্তব্য পাওয়া যেত।

এই সভাতে তবু সৌজন্য বজচায় রেখেই রবীন্দ্রনাথ কথা বলেছেন, কিন্তু অন্য একটি চিঠিতে তিনি সজনীকান্ত সম্বন্ধে যে কথা বলেঠিছলেন, তাতে তাঁর বিরক্তির ছাপ আছে। চিঠিতে তারিখ নেই, লিখেছিলেন প্রশান্ত মহলানবিশকে। কবি লিখছেন : অক্সফোর্ড বুক অপ ভার্সের সম্পাদন সম্বন্ধে আমার তরফ থেকে বালো করে ভেবে দেখো.. বুঝতে পারচি ব্যাটারটা অনেক দূর এগিয়েছে– তোমরা নিস্কৃতি দেবে না কিন্তু একটা কথা জোর করেই বলব, সজনীর নাম যদি এই বইয়ে থাকে তবে আমার নাম থাকবে না–কোনো নৈর্ব্যক্তিক ঔদার্যের দোহাই দিয়ে আমাকে সম্মত করতে পারবে না। এতে আমার যা ক্ষুদ্রতা প্রকাশ পাবে তা মেনে নেব। যদি মোটের উপর নিস্কৃতি দাও তাহলে সজনীকান্তকে প্রধান এডিটর করলেও আমি আনন্দ প্রকাশ করতে চেষ্টা করব।'

এ চিঠির ব্যাখ্যা নিস্প্রয়োজন। কতটা বিরক্ত হয়েছেন বোঝা যায় তাঁর রূঢ়তা দেখে। রবীন্দ্রনাথের জীবনব্যাপী কর্মকাণ্ডে একাধিক অসহিষ্ণুতা বিশেষ চোখে পড়ে না।

রবীন্দ্রনাথ সেদিনের সভায় উভয় পক্ষকেই বিরূপ কথা বলতে ছাড়েননি। তবু উভয়পক্ষেরই মনে হয়েছে, যা পরবর্তীকালকে তঁঅরা বোঝাতে চেয়েছেন যে কবি তাদের দিকে চিলেন। এ বিষয়ে

রবীন্দ্রনাথ নিজে কী ভেবেছিলেন, সেটি তৃতয়ি পক্ষকে লেখা একটি চিঠিতে পাওয়া যায়। বিচারসভার দুদিন পরে এই চিঠি কবি লিখেছিলেন ধুর্জটি প্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে।

কল্যাণীয়েষু, গেল শনিবার এবং কাল মঙ্গলবারে বিচিত্রায় বাদী প্রতিবাদী দুদলই উপস্থিত ছিলেন। আমার যা বলবার ছিল আমি দুপক্ষকেই স্পষ্ট করে বলেছি। নবীন সাহিত্যকদের মঙ্গলবারের কোঠায় ফেলা যেতে পারে–তারা ঐ মঙ্গল গ্রহটারই মত অত্যন্ত বক্তবর্ণ হয়ে উঠেছে–ভারতীয় আসন যে শ্বেতবর্ণে–যার মধ্যে সকল রং মিশে আছে, সেটার প্রতি ওদের বড়ো অবজ্ঞা–সব বাদ দিয়ে একেবারে টকটকে রঙের পরেই ওদের বিলাশ। তার কারণ ওটা সস্তা, আর সহজেই চোখ ভোলায়। অপরপক্ষ নিজেকে শনিগ্রহের সঙ্গে যুক্ত করেচে–মঙ্গলের বিরুদ্ধে ওরা কেবল অমঙ্গলটাকেই বাছাই করে নিচ্ছে। মাঝের থেকে আমাদের সাহিত্যে শনিমঙ্গলের মাতামাতিটাই অত্যন্ত মুখরিত হয়ে উঠেচে। দুই পক্ষের কোনো গ্রহই শুভ নয়, অথচ দুই পক্ষেই গুণী লোক আছে। শাস্ত্রমতে রবি হলো গ্রহদের রাজা, এই জন্য দুই পক্ষকেই সংযত করার ইচ্ছা করি–কিন্তু সময় খারাপ–রাজাকে বরখাস্ত করে দিয়েচে, কোনো আইকেও মানতে চায় না–বলতে চায় না-মানা সেইটেই যুগধর্ম। আমি বলি যুগ বলে কোনো বালাই নেই কিন্তু ধর্ম আছেই-ধর্মের চেয়ে যুগকে সত্য বলে মানা হচ্ছে কিছুই না মানা। সাহিত্য পদার্থটা যা হয় একটা কিছু, শূন্য নয়, যা হয় একটা কিছুর যা হোক একটা ধর্ম আছে, শুধু বাইরের ভঙ্গী নয়, তার সত্ত্বার তত্ত্ব। বলে কিছু ফল হবে বলে বোধ হয় না, বরং বলচে আমি আমার যুগ খুইয়েচি অতএব আমার বলবার কিছুই নেই। যুগটা কী তুমি তার কোনো খবর জানো ? ইতি

†Zvgv‡'i ie›'bv_ vwKi

৯ চৈত্র ১৩৩৪

আমাদের আলোচনার একটি সারাংশে এই চিঠিতেই ধরা আছে। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত মহৎ একটি সাহিত্য বোধ ধ্বরা পরিচালিত হতেন। সেটা তিনি বৈঠকের ফলাফলের মাধ্যমেই অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সাথে প্রকাশ কেরন।

আধুনিক লেখকেরা বাস্তবতার নানা স্তর, বিশেষ করে যৌনজীবনের নগ্ন নিবারণ উপস্থাপনা করেন। তাদের এ-প্রবণতা রবীন্দ্রনাথকে পীড়িত করেছে। আধুনিক লেখকের গ্রন্থসমালোচনা কালে কিংবা বিভিন্ন লেখকের কাছে লেখা চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ এ-প্রবণতার নিন্দা করেন। সাহিত্যে প্রবৃত্তিগত জীবনাবস্তবতার অনুপুঙ্খ উপস্থানায় রবীন্দ্রনাথ অস্বস্তিবোধ করেন। আধুনিক লেখকদের এ প্রবণতাকে তিনি নির্দেশ করেন ইউরোপীয় বাস্তবতাবাদের নকল ও বিজাতীয় বলে। তিনি মনে

করেন এ-প্রবণতা এ-দেশি নয়, কারণ এ-দেমের মানুষের জীবনে মৈথুনাসক্তি তীব্র নয়, দেহভোগের বুভুক্ষা তাদের মধ্যে নেই। তাই সাহিত্যে দৈহিক সম্পর্কের ব্যাপার আভাসে ব্যক্ত করার পক্ষপাতী রবীন্দ্রনাথ। অচিন্তাকুমার সেনগুপ্তকে লেখা চিঠিতে (১৯২৮) রবীন্দ্রনাথ বলেন, আমাদের ক্ষীণজীবীর দেশে মদ খেতে গেলেই মানুষ একান্ত মাৎলামিতে গিয়ে পৌছায়–এই জন্য নরোয়েতে যেটা দৃষ্টিকটু নয় আমাদের দেশে সেটা কুৎসিত। সাহিত্যকে বাস্তবতাঘনিষ্ঠ করে তোলার প্রয়োজনে যৌনজীবনবাস্তবতার উপস্থাপনার প্রবণতাকে রবীন্দ্রনাথের মনে হয়েছে বিদেশি রচনার উগ্র যৌনতার নকল করে সহজে পাঠককে মাতিয়ে রাখঅর চেষ্টা বলে। তিনি বলেন, এদেশের হিন্দু জনসাধারণ মিথুনাসক্তি সম্বন্ধে ... এত বুভুক্ষ নয় যে ওইসব নকল রচনার যৌন উগ্রতা কোনো আবেদন সৃষ্টিতে সমর্থ হবে। তাই তিনি মনে করেন উগ্র-যৌনতাপূর্ণ সাহিত্য রচনার দরকারই নেই। তার মতে, নরোয়ে প্রভৃতি দেশের লোকের বলিষ্ঠ প্রাণশক্তির মধ্যে প্রকৃতির যে সহজ উত্তাপ আছে এবং উত্তর ইউরোপের দানবতুল্য দেহে মদের পিপাসা যেমন সহজেই সহ্য হয়, ওই পটভূমিকায় উগ্রযৌনতাপূর্ণ সাহিত্যচর্চাও তাদের মানিয়ে যায়, কিন্তু এ-দেশে তা একবারেই বেমানান। তাই তিনি মনে করেন আমাদের সাহিত্যে ওই প্রসঙ্গ যদি আসে তবে তার আভাকে প্রকাশ ঘটুক।

আধুনিক সাহিত্যে উপস্থাপিত যৌনজীবন-বাস্তবতা ও জীবনের কলূষময় দিক রবীন্দ্রনাথকে পীড়িত করে সবচেয়ে বেশি। বাস্তবতার কলুষময় অন্ধকারঅংশকে প্রধান্য দেয়ার কারণে তিনি পরিচয় পত্রিকায় (কার্তিক ১৩৩৮) জগদীশ গুপ্তের লঘুগুরু (১৩৩৮) উপন্যাসের বিদ্রূপাত্মক সমালোচনা করেন। এ-উপন্যাসটিকেও সহজে পাঠক ভোলাবার শস্তা প্রয়াস বলে তাঁর মনে হয়। এ-উপন্যাসেও তিনি দেখেন আধুনিক রিয়ালিজমের সেন্টিমেন্টালিটি। কেননা বেশ্যাবৃত্তিতে যে মেয়ে অভ্যস্ত, সেও একটা যে কোনো ঘরে ঢুকেই সদ্য গৃহিণীর জায়গা নিতে পারে' এ-শৌখিন কথাটিই সেন্টিমেন্টের রসপ্রলেপে এ-উপন্যাসে বলার চেষ্টা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ এ-উপন্যাসে বর্ণিত জীবন ও লোকযাত্রার বাস্তবতা সম্পর্কেও সংশয় প্রকাম করেন। তিনি বরেন, এ উপন্যাওসে যে লোকযাত্রার বর্ণনা আছে, আমি একেবারেই তার কিছু জানিনে। ... এদেশে লোকালয়ের যে চৌহদ্দির মধ্যে কাটালুম এ-উপন্যঅসের অবলম্বিত সমাজ তার পক্ষে সাত সমুদ্র পারের বা অনতিপরিচিতের সন্ধানে রাস্তা ছেড়ে কাঁটাবন পেরিয়ে ও জায়গায় উকি মেরে এসেছেন। তার মতে লঘুঘুরু উপন্যাসে নি:সন্দির সত্যের উপস্থাপনা লক্ষ্য করা যায় না, এ-লেখায় লেখক শুধু রিয়ীলজমের পালা সস্তায় জমিয়েছেন এবং রিয়ালিজমের নাম দিয়ে একালের সৌখিন আধুনিকতাকে খুসি করার চেষ্টাই করেছেন। রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা জগদশি গুপ্তকে ক্ষুব্ধ করে। উদয়লেখা গল্পগ্রনথে মুখবন্ধে তিনি রবীন্দ্রনাথের সংশয় বিদ্রূপাত্মক জিজ্ঞাসা-অভিযোগের জবাব দেন। তিনি বলেন, লোকালয়ের যে চৌহদ্দির মধ্যে

এতকাল আমাকে কাটাইতে হইয়াছে সেখানে স্বাভাবসিদ্ধ ইতর এবং কোমর বাধা শয়তান নিশ্চয়ই আছে; এবং বোলপুরের টাউন প্লানিং-এর দোষে যাতায়াতের সময় উকি মারিতে হয় নাই, ও জায়গা আপনি চোখে পড়িয়াছে।'

লঘুগুরু সমালোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ আধুনিক লেখকদের রিয়ালিজম মনস্কতাকে বিদ্রূপ ও আক্রমণ করেন। তার মতে সেন্টিমেন্টাল লেখদের মধ্যে যেমন সাধুতাপ্রীতি লক্ষ্য করা যায়, তেমনি আধুনিক লেখদের মধ্যে অসাধুতার প্রতি প্রবল আকর্ষন লক্ষ্য করা যায়। তীব্র সাধুতাপ্রীতির মতো তীব্র অসাধুতাপ্রীতিও অবাস্তব ও অবিশ্বাস্য। কিন্তু মোহগ্রস্ত আধুনিকেরা অসাধুতার উজ্জ্বল চিত্রণকেই রিয়ালিজম বলে মনে করে তৃপ্ত হয়ে ওঠেন। তিনি বলেন, সাধুতাকে ভাবরসের বর্ণবাহুল্যে অতিমাত্রায় রাঙিয়ে তোলায় যত বড় অবাস্তবতা, লোকে যেটাকে অসাধু বলে, তাকে সেন্টিমেনেটর রসপ্রলেপে অত্যন্ত নিষ্কস্কলঙ্ক, উজ্জ্বল করে তুললে অবাস্তবতা তার চেয়ে বেশি বই কম হয় না। অথচ শেষোক্তটাকে রিয়ালিজমের নাম দ্রিয় একালের সৌখিন আধুনিকতাকে খুসি করা অত্যন্ত সহজ। আধুনিক লেখদের বাস্তবতামনস্কতাকে তিনি চিহ্নিত করেন পঙ্কের তিলক কাটার প্রবণতারূপে এবং অনায়াসে শস্তা জনপ্রিয়তা পাবার মোহেই আধুনিকেরা পাক ঘটায় নিবিষ্ট বলে মনে করেন রবীন্দ্রনাথ। তিনি বলেন চন্দনের তিলক যখন চলতি ছিল, তখন অধিকাংশ লেখাজচন্দদের তিলকধারী হয়ে সাহিত্যে মান পেতে চাইত। পঙ্কের তিলকই যদি সাহিত্য সমাজে চলতি হয়ে ওঠে, তা হলে পঙ্কের বাজারও দেখতে দেখতে চড়ে যায়।' যৌনজীবন চিত্রণের প্রবণতাকে গ্রন্থ বিক্রির নতুনতার কায়দা বলে মনে হয় তার কাছে। তিনি একে রিয়ালিজমের দোহাই দিয়ে ব্যবসা চালানো বলে নির্দেশ করেন। তার মতে, মানুষের এমনসব প্রবৃত্তি আছে, যার উত্তেজনার জন্য গুণপনার দরকার করে না। অত্যন্ত সহজ বলেই মানুষ সেগুলোকে নানা শিক্ষায়, অভ্যাসে, লজ্জায়, সঙ্কোচে সরিয়ে রেখে দিতে চায়, নইলে বিনা-চাষেই যে-সব আগাছা ক্ষেত চেয়ে ফেলতে পারে, তাদের মতোই এরা মানুষের দুর্মূল্য ফসলকে চেপে দিয়ে জীবনকে জঙ্গল করে তোলে। এই অভিজ্ঞতা মানুষের বহু যুগের।... আমার বলবার কথা এই যে, যে সকল তাড়িখানায় সাহিত্যকে শস্তা করে তোলে, রিয়ালিজমের দোহাই দিয়ে তার ব্যবসা চালানোয় কল্পনার দুর্বলতা ঘটবে।' রবীন্দ্রনাথ আধুনিকদের এই প্রবণতাকে শস্তা মাদকতা বলেও অভিহিত করেন। তিনি বলেন এরকম শস্তা মাদকতা সাহিত্যে মাঝে মাঝে দেখা গেলেও এবং তাৎক্ষণিকভাবে প্রচুর বাহবা পাওয়া গেলেও, তা কখনোই চিরস্থায়ি হবার মর্যাদা লাভ করেনি।

রবীন্দ্রনাথ ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে লেখা চিঠিতেও (১৩৩৪) আধুনিক লেখদের বাস্তবতামনস্কতা তথা প্রভৃত্তিগত জীবনচিত্রণ প্রবণতাকে শস্তা ও সহজে চোখ ভোলাবার কায়দা বলে অভিহিত

করেন। তিনি বলেন, গেল শনিবারে এবং কাল মঙ্গলবারে চিচিত্রায় বাদী প্রতিবাদী দু'দলই উপস্থিত ছিলেন। আমার যা বলবার ছিল আমি দুপক্ষকেই স্পষ্ট করে বলেছি। নবীন সাহিত্যিকদের মঙ্গলবারের কোঠায় ফেলা যেতে পারে–তারা ঐ গ্রহটার মতোই অত্যন্ত রক্তবর্ণ হয়ে উঠেচে-ভারতীয় আসন যে শ্বেতবর্ণের-যার মধ্যে সকল রঙ মিশে আছে, সেটার প্রতি ওদের বড় অবজ্ঞা-সব বাদ দিয়ে একেবারে টকটকে রঙের পরেই ওদের বিলাস। তার কারণ ওটা শস্তা আর সহজেই চোখ ভোলায়। ধুর্জটিপ্রসাদকে লেখা আরকটি চিঠিতে (বৈশাখ '১৩৪১) । তিনি লেখেন আধুনিক লেখদের গরজ হলো মানুষকে দেখিয়ে দেয়অ যে নোংলা তোমার মগজ, তোমার হৃৎপিন্ড, তোমার পাকযন্ত্র, তোমার চেহারাটা উপরের খোলসমাত্র, সেই চেহারার বড়াই কোরোনা। তিনি বলেন আধুনিক লেখকেরা গল্প শোনাতে চাননা, পাঠকের সামনে তুলে ধরেন মনস্তত্ত্বের তথ্যতালিকা; তারা সৃষ্টি করছেন এক ধরনের ছেলেভোলানো সাহিত্য এবং মাচ ফেলে দিয়ে শুধুমাত্র কাটার চচ্চড়ি রাধাকেই তারা ওস্তাদি বলে ঘোষণা কর চলেছেন।' সাহিত্যে শুধামাত্র বাস্তবতার উপস্থাপনা তার কাছে অদ্ভুত ও অসংগত। তিনি বলেন, মানুষ দুর্বৃত্ত হতে পার স্বভাবতই, কিন্তু মানুষ রিয়ালিষ্ট হবার জন্য কোমার বাধলে সেটা অস্বাভাবিক হয়ে পড়েই। অর্থাৎ সেও হয় Unral... তারা নিজেও ভুলতে পারে না তারা রিয়ালিষ্ট, অন্যকেও ভুলতে দিতে চায় না–তারা রিয়ালিজমের পুতুলবাজি করে। রিয়ালিষ্ট নামক গ্রন্থে ধূর্জটিপ্রসাদ আধুনিক সাহিত্যের রিয়ালিজমকে বিদ্রুপ ব্যঙ্গ করেছেন বলে রবীন্দ্রনাথ তার প্রশংসা করেন এবং বলেন যে ধূর্জটিপ্রসাদের গ্রন্থটি পড়তে পড়তে মনে হয়েছে বাঁশরি নামক আমার নূতন লিখিত নাটকের ভিতরেও অবাস্তব রিয়ালিজমের প্রতি এই রকমেরই একটা হাসির আমেজ আছে। আধুনিক সাহিত্যিকদের বাস্তবতাঘনিষ্ঠ হবার প্রবণতার প্রতিই শুধু নয়, রবীন্দ্রনাথ আধুনিক সাহিত্যের প্রতিই প্রবল বিরাগ বোধ করেছেন। আধুনিক সাহিত্য তার কাছে প্রতীয়মান হয়েছে যা কিছু বিকলাঙ্গ বিকৃত, যা কিছু প্রকৃতির আবর্জনা তার সমাবেশ তার মতে এ-সাহিত্যে মানুষের সুন্দরের তৃষ্ণা উপেক্ষিত হয়, বিকৃত ও কুৎসিতকেই সত্য বলে ঘোষণা করে এ-সাহিত্য। আবু সয়ীদ আইয়ুব ও হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত আধুনিক বাংলা কবিতা (১৩৪৬) গ্রন্থ সম্বন্ধে বুদ্ধদেব বসুকে চিঠিতে (২০-৮-৪০ইং) রবীন্দ্রনাথ এমন মন্তব্য করেন। ধূর্জটিপ্রসাদকে লেখা চিঠিতে (২১ ভঅদ্র ১৩৩৮) আধুনিক ইউরোপীয় সাহিত্যকে বলেন 'যৌনবৃত্তির বিকারজনিত অসংযত প্রলাপ'। আধুনিক কাব্য (বৈশাখ ১৩৩৯) প্রবন্ধে আধুনিক ইউরোপীয় সাহিত্যকে পঁচা মাংসের বিলাস বলে অভিহিত করেন। তিনি বলেন, এযুগ বাস্তবকে অপমানিত করে সমস্ত ঘুচিয়ে দেওয়াকেই সাধনার বিষয় বলে মনে করে। অমিয় চক্রবর্তীকে লেখা চিঠিতে (চৈত্র ১৩৪৫) ওই পশ্চিমী সাহিত্যের অস্থিরতা, যৌনতার চিত্রণ এ-দেশের জন্য জরুরি নয় বলে জানান।

রবীন্দ্রনাথ শুধু প্রবন্ধ ও চিঠিত্রেই আধুনিক সাহিত্য ও আধুনিকদের বাস্তবতামনস্কতাকে আক্রমণ করেন নি, তার গল্প-উপন্যাস-নাট ইত্যাদিতেও বিদ্রুপ ব্যাঙ্গ আক্রমণ অব্যাহত ছিলো। সে (বৈশাখ ১৩৩৪) থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথ তার শেষ পনের বছরের গল্প-নাট-উপন্যান-কবিতায় তৈরি করেছেন কোনো না কোনো চরিত্র এবং কোন না কোনো সুযোগ, যার সাহায্যে আঘাত করেছেন আধুনিক বাংলা লেখদের বাস্তবতামুখিতার ব্যাপারটি রবীন্দ্রনাথের এক অবসেশন হয়ে পড়ে। এ-সব রচনায় রবীন্দ্রনাথ আধুনিক লেখকদের প্রতি তীব্রতাচ্ছিল্য ও আধুনিক লেখকদের বাস্তবাবাদিতার প্রতি বিরাগ প্রকাশ করেন এবং একই সঙ্গে ব্যক্তি করেন বাস্তবতা সম্পর্ক ভাববাদী বিশ্বাস। তিনি মনে করেন কলুষ কুশ্রীতাপূর্ণ স্থুলবাস্তব সত্য হলেও তা অবিকল সাহিত্যে বিধৃত হতে পারে না, কবির লক্ষ্য সৌন্দর্য ও আনন্দময় জগৎ সৃষ্টি। সে গ্রনথের সর্বত্র ছড়িয়ে আছে নতুনযুগের স্থুল সাহিত্যের প্রতি বিরূপ মন্তব্যে এবং বিশুদ্ধ সৌন্দর্য ও আনন্দময় পুরোনো কাব্য ধারার জন্য খেদ। সে গ্রন্থল আগে ঘরে বাইরে (১৩২৩) উপন্যাসেও রবীন্দ্রনাথ আধুনিক সাহিত্যের স্থুলতা ও বাস্তবতামুখিতাকে বিদ্রুপ-উপহাস করেন। এ-উপন্যাসের অন্যতম চরিত্র সন্দীপের জবানীতে তিনি আধুনিকতা ও বাস্তবতার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেছেন। এই ব্যাখ্যা বিশ্লেষন থেকে বাস্তবতা ও আধুনিকতাকে সুন্দর ও শ্রদ্ধেয় বলে মনে হয় না, বরং অসুন্দর, স্থুল ও অশ্রদ্ধেয় বলে মনে হয়। সন্দীপের ব্যঅখ্যায় বাস্তবতা হচ্ছে প্রবৃত্তির উচ্চকণ্ঠ নির্লজ্জ জয়গান, স্থুল ও অসুন্দর। আর আধুনিক যুগ হচ্ছে এই প্রবৃত্তির আরাধনার যুগ। সুন্দরকে ধ্বংস করে অসুন্দরকে প্রতিষ্ঠা করাই এ-যুগের প্রবণতা। সন্দীপ নিজেকে বস্তুতন্ত্রী আখ্যা দেয় এবং নিজের চরিত্র বিশ্লেষণ করে বলে:

> আমি বস্তুতন্ত্র! উলঙ্গ বাস্তব আজ ভাবুকতার জেলখানা ভেঙ্গে আলোকের মধ্যে বেরিয়ে আসছে, এর পদে পদেই আমার আনন্দ ঘনিয়ে উঠেছে। যা চাই সে খুব কাছে আসবে, তাকে মোটা করে পাব, তাকে শক্ত করে ধরব, তাকে কিছুতে ছাড়ব না-মাঝখানে যা কিছু আছে তা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে ধুলোয় লুটাবো, হাওয়ায় উড়াবে, এই আনন্দ, এই তো আনন্দ, এই তো বাস্তবের তান্ডব নৃত্য।

সন্দীপের উচ্চকণ্ঠ আস্ফালনে বাস্তবতার যে-চারিত্র্য নির্দেশিত হয় তাতে দেখা যায় প্রবৃত্তির উদ্দাম স্তব ও চর্চাই বাস্তবতা। এ-বাস্তবতার জগতে সুন্দর ও মহৎ স্বপ্নকে আঘাত ও প্রত্যাখ্যা করা হয়, স্থুলতাই একমাত্র সত্যরূপে গৃহীত হয় এখানে। রবীন্দ্রনাথ স্তুল বাস্তবতার আস্ফালন সন্দীপের জবানীতে বিধৃত করেন এ-ভাবে: ...আমি স্থুল, কেন না আমি সত্য, আমি মাংস, আমি প্রবৃত্তি, আমি ক্ষুধা, নির্লজ্জ নির্দয়, যেমন নির্লজ্জ নির্দয় সেই প্রচন্ড পাথর যা বৃষ্টির ধারায় পাহাড়ের উপর থেকে লোকালয়ের মাথার উপর গড়িয়ে এসে পড়ে–তারপরে যে বাচুক আর যে মরুক। সন্দীপের এই

আস্ফালনের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ নির্দেশ করেন আধুনিক সাহিত্য ও বাস্তবতার স্থূলতা, অসুন্দর, নির্লজ্জতা। এ-সবের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায় আধুনিকতার প্রতি রবীন্দ্রনাতের ঘৃণা। তিনি নানাভাবে প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন আধুনিক সাহিত্য অন্ত:সারশূন্য। আধুনিককালরূপে চিহ্নিত সময়ও স্থূল বাস্তবতা নিয়ে মত্ততার সময়, এ-সময়ে সনাতন মহৎ বিশ্বাস ও আদর্শ উপেক্ষিত ও লাঞ্ছিত হয়। রবীন্দ্রনাথ বাস্তবতাবাদী সন্দীপকে দিয়ে আধুনিকতার যে ব্যাখ্যা করিয়েছেন তাতে তার ওই প্রবণতাই পরিস্ফুট। সন্দীপ আধুনিকতার ব্যাখ্যা করে এভাবে: প্রবৃত্তিকে বাস্তব বলে স্বীকার করা ও শ্রদ্ধা করাই হচ্ছে মডারণ। প্রবৃত্তিকে লজ্জা করা, সংযমকে বড়ো জানাটা মডারণ নয়। শেষের কবিতা (১৩৩৬) উপন্যাসেও আধুনিক প্রবণতাকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করা হয়। অমিত রায় নতুন কালের নতুন সাহিত্যের যে-বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করেছে, তাতে ওই সাহিত্যের স্থূলতা ও আন্ত:সারশূন্যতাই প্রকট হয়ে উঠেছে। অমিত রায় নতুন কালের জন্য চাষ কড়া লাইনের, খাড়া লাইনের রচনাম, তীরের মতো, বর্শার ফলার মতো, কাটার মতো, ফুটের মতো নয়, বিদ্যুতের রেখার মতো, ন্যূরালজিয়অর ব্যথার মতো-খোঁচাওয়ালা, কোনওয়ালা, গথিক গির্জের ছাদে, মন্দিরের মন্ডপের ছাদে নয়; এমনকি যদি চটকল, পাটকল অথবা সেক্রেটারিয়েট-বিল্ডিয়ের আদলে হয় ক্ষতি নেই। .. এখন থেকে ফেলে দাও মন ভোলাবার ছলাকলা ছন্দোবদ্ধ, মন কেড়ে নিতে হবে যেমন করে রাবণ সীতাকে কেড়ে নিয়ে গিয়েছিল।

আধুনিক লেখকদের বাস্তবতামনস্কতা সম্পর্কে বিরূপতা ও অবজ্ঞা প্রবলভাবে প্রকাশ পেয়েছে বাঁশরি (১৩৪০) নাটকে। এ-নাটকে আধুনিক লেখকদের প্রতিনিধিত্ব করে ক্ষিতীশ। বাঁশরি প্রতিনিধিত্ব করে রক্ষণশীল ভাববাদী রবীন্দ্রনাথের। ক্ষিতীশকে এ-নাটকে আনাই হয়েছে উপহাস কুড়োবার জন্য। তাকে তুচ্ছ, নির্বোধ ও উপহাসাস্পদ রূপে দেখানেই ছিলো রবীন্দ্রনাথেল উদ্দেশ্য। নাটকের প্রধান চরিত্র বাশরি তাকে সারাক্ষণ বিদ্রূপ উপহাস করেছে, নাটকের গৌণ চরিত্র্যেরাও তাকে অবাধে উপহাস-ব্যঙ্গ করে চলে। ইতিপূর্বে বিভিন্ন প্রবন্ধে, চিঠিপত্রে, গ্রন্থসমালোচনায় আধুনিকলেখকদের বাস্তবতামনস্কতা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ যেসব মন্তব্য করেন, বাস্তবতাকে যেভাবে বিদ্রূপ উপহাস করেন, এ-নাটকের পাত্রপাত্রীরা তারই পুনরাবৃত্তি করে। বাশরি আধুনিক লেখক ক্ষিতীশকে বলে, লেখবার শক্তি আছে তোমর কিছু নেই সত্যের পরিচয়। বাঁশরি ও অন্যান্যের কাছে আধুনিক লেখকদের রচনা হচ্ছে সেন্টিমেন্টালিটি তরলরস, সস্তায় পঅটক ভোলাবার লোভ, গজিয়ে ওঠা রসের ফেনা, রঙের আমদানি সমুদ্রের ওপার থেকে খেলো আধুনিকতা, যাত্রাদলের কাঠের ছুটি রাংতা মাখানো, পিটুলিগোলাজল। আধুনিক লেখদের নতুন চেতনা ও প্রবণতাকে তাদের কখনো মনে হয় ভূতের পায়ের মতো উল্টো দিকে চোখ, কখনো মনে হয় স্তায় পাঠক ভোলাবার লোভ

বলে। আধুনিক লেখকদের লক্ষ্য করে উপহাস-বিদ্রূপাত্মক এ-সব মন্তব্য জগদীশ গুপ্তেত লঘুগুরু উপন্যাসের সমালোচনা প্রসঙ্গে আধুনিক সাহিত্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য-পরিহাস-বিদ্রূপের প্রতিধ্বনি। এ-নাটে আছে বাস্তবতা ও আধুনিক লেখকের বাস্তবতামনস্কতাকে বিদ্রূপ করে লেখা এমন সংলাপ :

[ক] ঐ কালির দাগেই তোমার অসাধারণতা, তুমি রিয়ালিষ্ট, নির্মলতা তোমাকে মানায় না। তুমি মসীধ্বজ।

[খ] রক্তের যোগ না থাকলে অমন অদ্ভুত সৃষ্টি বাাননো যায় না। ঐ-যে, সে জায়গাটাতে মিষ্টার কিষেণ গান্টা বি, এ ক্যান্পার, মিস লোটিকার পিঠের দিকের জামার ফাক দিয়ে আংটি ফেলে দিয়ে খানাতল্লাসির দাবি করে হো হো বাধিয়ে দিলে। আমার বন্ধুরা সবাই পড়ে বললে, মাচলেস-বঙ্গসাহিত্যে এ-জায়গাটর দেশলাই মেলে না, একটু পোড়াকাঠিও না। আপনার লেখা ভয়ানক রিয়ালিষ্টিং ক্ষিতীশ বাবু। ভয় হয় আপনার সামনে দাঁড়াতে।

[গ] ... মোস্ট ইন্টারেস্টিং আপনার বইখানা। এমনসব মানুষ কোথাও দেখা যায় না। ঐ যে মেয়েটা কী তার নাম-কথায় কথায় হাপিয়ে উঠে বলে, মাই আইজ, ও গড। লাজুক ছেলে স্যান্ডেলের সংকোচ ভাঙবার জন্যে নিজ মোটর হাকিয়ে ইচ্ছে করে গাড়িটা ফেলল খাদে, মতলব ছিল স্যান্ডেলকে দুইহাতে তুলে পতিতোদ্ধার করবে। হবি তো হ স্যান্ডেলের হাতে হল কম্পোউন্ড ফ্যাকচার। কী ডামাটিক, রিয়ালিজমের চূড়ান্ত। ভালোবাাসর এতোবড় আধুনিক পদ্ধতি বেদব্যাসের জানা ছিলনা।

আধুনিক রিয়ালিষ্ট লেখক সম্পর্কে পাওয়া যায় এমন বিদ্রূপাত্মক সংলাপ:

[ক] যা চোখে দেখা যায় তা উনি দেখেন না। ভূতের পায়ের মতো ওর চোখ উলটো দিকে।

[খ] বাংলা উপন্যাসে নিয়ুমার্কেটের রাস্তা খুলেছে নিজের জোরে আলকাতরা ঢেলে।

[গ] ক্ষিতীশবাবু ন্যাচারল হিষ্ঠী লেখেন গল্পের ছাচে। যেখানটা জানা নেই, দগদগে রঙ লেপে দেন মোটা তুলি দিয়ে। রঙের আমদানি সমুদ্রের ওপার থেকে।

[ঘ] ওর লেখবার শক্তি আছে। ও আমাদের ময়মনসিংহের বাগানের আম, জাত ভালো, কিন্তু যতই চেষ্টা করা গেল ভিতরে পোকা হতেই আছে। ঐ পোকা বাদ দিয়ে কাজে লাগনো হয়তো চলবে।

Dhaka University Institutional Repository

আধুনিক লেখদের বাস্তবতার সকল স্তর উপস্থাপনার প্রবলণতা যেমন রবীন্দ্রনাথকে পীড়িত করেছে, ক্ষিতীশের লেখায় উপস্থাপিত রিয়ালিজম ও বাশরিকে তেমনি পীড়িত করেছে। সস্তায় পাঠক ভোলাবার লোভেই ক্ষিতিশ চিটেগুড় মাখিয়ৈ কথাগুলোকে চটচটে করে তুলেছে বলে মনে করে বাশরি। তার মতে ক্ষিতীশ খেলো আধুনিকতার ধারক এবং ক্ষিতীশের লেখা বানিয়ে তোলা লেখা .. বই পড়ে লেখা। ধারক এবং ক্ষিতীশের লেখা বানিয়ে তোলা করে না; গণ্য করে অম্পূর্ণ, স্থুল, নোঙরামি বলে। ক্ষিতীশের বাস্তবতামনস্কতা বাশরির কাছে উপহাসের সামগ্রী। সে মনে করে ওই সব খেলো নোংরামিপূর্ণ সাহিত্যসৃষ্টির ঝোঁক ্যাগ করে প্রতিভাবন তরুণদের সৃষ্টি করতে হবে সৌন্দর্য ও আনন্দগাথা। বাশরির মতে শুধু বেদনা, বিফলতা ও মহৎভাবাদর্শপূর্ণ রচনাতেই প্রকৃত রিয়ালিজম পাওয়া যায়। বাশরির রিয়ালিজিমের রূপ এমন: প্রকৃতির সেই বিদ্রূটাকেই বর্ণনা করতে হবে তোমাকে। ভবিতব্যের চেহারাটা জোর কলমে দেখিয়ে দাও। বড়ো নিষ্ঠুর। সীতা ভাবলেন, দেবচরিত্র রামচন্দ্র উদ্ধার করবেন রাবনের হাত থেকে; শেষকালে মানবপ্রকৃতি রামচন্দ্র চাইলেন তাকে আগুনে পোড়াতে। একেই বলে রিয়ালিজম, নোংরামিকে নয়। এভঅবে বাশরি নাটকের পত্রপাত্রীদের সংলাপে রবীন্দ্রনাথ ঢুকিয়ে দেন আধুনিক লেখদের বাস্তবতামনস্কতা ও তাদের সম্পর্কে তার ব্যঙ্গবিদ্রূপ। এ-নাটরেক পাত্রপাত্রীদের আধুনিক লেখক ও আধুনিক সাহিত্যের রিয়ালিজম নিয়ে প্রবল ও অশোভন ব্যঙ্গ পরিহাসকেই রবীন্দ্রনাথ ধূর্জটিপ্রসাদকে লেখা চিঠিতে অভিহিত করেন অবাস্তব রিয়ালিজমের প্রতি হাসির আমেজ বলে।

শ্রবণাগাথা (১৩৪১) নামক কাব্যনাটোও রবীন্দ্রনাথ আধুনিক লেখক ও তাদের প্রবণতা নিয়ে বিদ্রূপ উপহাস করেন। ক্ষিতীশের মতো এ-কাব্যেনাটোও আধুনিক সভাকবিকে আনা হয় বিদ্রূপ উপহাস কুড়োবার জন্য। শ্রাবণগাথার রাজা সভাকবিকে উপহাস করে বলে: আমাদের সভাকবি দু:সহ আধুনিক। হাড়িভাঙ্গা পায়েসের রস পাকে গড়ালে উনি সেটাকে নিয়ে চৌরপঙ্কশতক রচনা করতে পারেন, কিন্তু তৃপ্তি পান না সেইরসে যার সঙ্গে না আছে জঠরের যোগ, না আছে ভান্ডারের।কখনো রাজা সভাকবিকে তোমাদের নিমন্ত্রণে আছে আমিষের প্রাচুর্য বলে কটাক্ষও করেন। নিজের গোত্রকে স্থুলতা ও অসুন্দরের উপাসক বলে স্বীকার করে নিয়েছে সভাপকিও। তার স্বীকারোক্তি এমন: আমরা আধুনিক আমরা আমিষ লোলুপ। কবিতাতেও রবীন্দ্রনাথ আধুনিক লেখকদের বাস্তবতাবাদি প্রবণতাকে ব্যাঙ্গবিদ্রুপ করেন। পরিশেষ (১৩৩৯) কাব্যগ্রনথের নূতন শ্রোতা-২ কবিতায় আধুনিকদের তীব্র বিদ্রূপ করেছেন রবীন্দ্রনাথ:

গোপনে তার মুখের পানে চাহি
বৃদ্ধি সেথায় পাহারা দেয় একটু ক্ষমা নাহি

নতুন কালেল শাণ দেওয়ার তার ললাটখানি খরখড়মসম,

শীর্ণ যাহা, জীর্ণ যাহা তার প্রতি নির্মম।

তীক্ষ্ণ সজাগ আখি

কটাক্ষে তার ধরা পড়ে কোথা যে কার ফাকি

সংসারেতে গর্তগুহা যেখানে যা সবখানে দেয় উকি

অমিশ্র বাস্তবের সাথে নিত্য মুখোমুখি।

তীব্র তাহার হাস্য

বিশ্বকাজের মোহমুক্ত ভাষা।

বস্তুত ব্যাঙ্গক্তি ও পাল্লা দিয়ে লেখা শেষের কবিতা বা বাশরিতে নয়- তার আধুনিকতার ঔপন্যাসিক সাক্ষ্য 'গোরা' 'চোখের বালি' কিংবা 'মালঞ্চ', 'নাটকীয় সাক্ষ্য', 'ডাকঘর', অপব্যবহৃত সচেষ্ট গদ্যছন্দে রচিত তার কবিতাগুচ্ছে আধুনিকতা নেই। আধুনিকতা রয়েছে তার 'বলাকা', 'ক্ষণিকা', 'খেয়া', 'কল্পনা' প্রভৃতি স্বতঃফূর্ত কাব্যগ্রন্থগুলোতে; 'তিন সঙ্গী'র চোখ ধাঁধানো বাক্যের ছটায় নেই তার আধুনিক গল্পের দৃষ্টান্ত, তা আছে তার ক্ষুধিত পাষাণ বা একরাত্রি'র সান্দ্র ও অভিজ্ঞানে। কিন্তু আধুনিক সাহিত্যের অবিরল স্বীকৃতি ও প্রত্যাখানে, তার নিরন্তর প্রচ্ছন্ন ও প্রবল আধুনিকতাবাদের বিরুদ্ধতায় আরও একবার প্রমানিত হয় তাঁর অসম্ভব সততা, অসম্ভব পরিগ্রহণশীলতা ও পরিগ্রহণ উন্মুখিতা। রবীন্দ্রনাথের সমগ্র আলোচনায় আধুনিকতাবাদীদের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর দৃষ্টিতে আধুনিকতাবাদী সাহিত্যের গুণ বৈশিষ্ট্যের যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাকে এইভাবে ক্রমানুসারে উপস্থাপন করা যায়:

c_gZ: আধুনিকতাবাদী সাহিত্য একান্ত বস্তুনিষ্ট। জগৎ ও জীবনকে ব্যক্তিগত আসক্তি দিয়ে না দেখে আধুনিবতাবাদী সাহিত্যিক নির্বিকার তদগতভাবে দেখেন।

wØZxqZ: আধুনিকতাবাদী সাহিত্যে সার্বভৌমিকতার অভাব।

ZZxqZ: আধুনিকতাবাদী সাহিত্যে দারিদ্র্যের আস্ফালন ও লালসার অসংযম প্রকাশিত।

PZ_Z: আধুনিক সাহিত্য কাঠের অনুদার বিদ্রূপরায়ণ, প্রেম, সৌন্দর্য, মহত্ত্ব-মানুষের এই উন্নত বৃত্তিগুলির প্রতি অবিশ্বাস।

cÂgZ: আধুনিকতাবাদী সাহিত্য উদ্ধতভাবে নতুন, পুরনোদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহীভাবে নতুন। এই বিদ্রোহী নব্যতাই এর ক্ষণিকতার লক্ষণ।

Z_¨mÎ:

১. সুধীন্দ্র নাথ দত্ত, সূর্যাবত, সুধীন্দ্র নাথ দত্তের প্রবন্ধাবলী, কলকাতা।

২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সাহিত্যধর্ম, সাহিত্যের পথে, (বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ আশ্বিন ১৩৪৩, পুনর্মুদ্রন : পৌষ ১৩৮৮), পৃ ৭৫

৩. প্রিয়নাথ সেনকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠি, চিঠিপত্র (অষ্টম খণ্ড), (বিশ্বভারতী : ১৩৭০), পৃ ১৩৬

৪. প্রিয়নাথ সেনকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠি, ওই পৃ ১৩৮–১৩৯

৫. বিপিনচন্দ্র পাল, চরিত-চিত্র : রবীন্দ্রনাথ, বঙ্গদর্শন (১১: ১২, ঈুশ্ ১৩১৮), ৎধ ৬৮৯

৬. বিপিনচন্দ্র পাল, চরিত-চিত্র: রবীন্দ্রনাথ, ওই পৃ ৬৯১

৭. বিপিনচন্দ্র পাল, চরিত্র-চিত্র: রবীন্দ্রনাথ, ওই পৃ ৬৯০

৮. বিপিনচন্দ্র পাল, চরিত-চিত্র: রবীন্দ্রনাথ, ওই পৃ ৬৯১

৯. বিপিনচন্দ্র পাল, চরিত-চিত্র: রবীন্দ্রনাথ ওই. পৃ ৬৯২

১০. অজিতকুমার চক্রবর্তী, রবীন্দ্রনাতের সাহিত্য ও দেশচর্য্যা কি বস্তুতন্ত্রহীন ? , প্রবাসী আষাঢ় ১৩১৯, পৃ ৩০৩

১১. অজিতকুমার চক্রবর্তী, রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য ও দেশচর্য্য কি বস্ত্রহীন ? ওই, পৃ ৩১০

১২. রাধাকমল মুখোপাধ্যায়, লোকশিক্ষক বা জননায়ক, বর্ত্তমান বাঙ্গালা সাহিত্য (গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স : কলিকাতা, প্রকাশকাল অজ্ঞাত), পৃ ৩৯-৪০

১৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বাস্তব, সাহিত্যের পথে, পৃ ২৪

১৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, লোকহিত, কালান্তর, (রবীন্দ্র রচনাবলী (২৪শ খণ্ড) বিশ্বভারতী: কলিকাতা ১৩৫৪), পৃ ২৬৬

১৫. রাধাকমল মুখোপাধ্যায়, সাহিত্যে বাস্তবতা, বর্ত্তমান বাঙ্গালা সাহিত্য, পৃ ১৭৬

১৬. রাধাকমল মুখোপাধ্যায়, সাহিত্যে বাস্তবতা, বর্ত্তমান বাঙ্গালা সাহিত্য, পৃ ১৭৭

১৭. রাধাকমল মুখোপাধ্যায়, সাহিত্যে বাস্তবতা, বর্ত্তমান বাঙ্গালা সাহিত্য, পৃ ১৭৭-১৭৮

১৮. প্রমথ চৌধুরী, বস্তুতন্ত্রতা বস্তু কি, প্রবন্ধ সংগ্রহ (বিশ্বভারতী, প্রপ্র ১৯৫২, পূনর্মুদ্রণ ১৯৬১), পৃ ৪১

১৯. প্রমথ চৌধুরী, বস্তুতন্ত্রতা বস্তু কি, প্রবন্ধ সংগ্রহ (বিশ্বভারতী, প্রপ্র ১৯৫২, পূনর্মুদ্রণ ১৯৬১), পৃ ৪২

২০. প্রমথ চৌধুরী, বস্তুতন্ত্রতা বস্তু কি, প্রবন্ধ সংগ্রহ (বিশ্বভারতী, প্রপ্র ১৯৫২, পূনর্মুদ্রণ ১৯৬১), পৃ ৪২

২১. প্রমথ চৌধুরী, বস্তুতন্ত্রতা বস্তু কি, প্রবন্ধ সংগ্রহ (বিশ্বভারতী, প্রপ্র ১৯৫২, পূনর্মুদ্রণ ১৯৬১), পৃ ৪৩

২২. রাধাকমল মুখোপাধ্যায়, সাহিত্য ও স্বদেশ, বর্ত্তমান বাঙ্গালা সাহিত্য, পৃ ১৮৭

২৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কবির কৈফিয়ত, সাহিত্যের পথে, পৃ ৩২

২৪. বিপিনচন্দ্র পাল, চরিত-চিত্র : রবীন্দ্রনাথ, পৃ ৬৮৯

২৫. সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, সূর্যাবর্ত, সুধীন্দ্রনাথ দত্তের প্রবন্ধ সংগ্রহ (হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ফাউন্ডেশন, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, কার্তিক ১৩৯০), পৃ ২৬৫

২৬. প্রথম চৌধুরী, বস্তুতন্ত্রতা বস্তু কি, ওই. পৃ ৪২

২৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কবির কৈফিয়ত, ওই পৃ ৩২

২৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মানব প্রকাশ, সাহিত্য, (বিশ্ববারতী, প্রপ্র ১৩১৪, পুর্নমুদ্রন, আষাঢ় ১৩৮১), পৃ ২২৪

২৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মানব প্রকাশ, সাহিত্য, (বিশ্ববারতী, প্রপ্র ১৩১৪, পুর্নমুদ্রন, আষাঢ় ১৩৮১), পৃ ২২৪

৩০. ছিন্নপত্রাবলী, (বিশ্বভারতী ১৯৬০), পৃ ৯৪

৩১. ছিন্নপত্রাবলী, (বিম্বভারতী ১৯৬০), পৃ ৯৪

৩২. উদ্ধৃত, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, কল্লোলযুগ, (ডি,এম, লাইব্রেরী, কলকাতা, প্রপ্র ১৩৫৭; চতুর্থ সংস্করণ ১৩৬৬), পৃ ১২৬-১২৭

৩৩. উদ্ধৃত, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, কল্লোলযুগ, (ডি,এম, লাইব্রেরী, কলকাতা, প্রপ্র ১৩৫৭; চতুর্থ সংস্করণ ১৩৬৬), পৃ ১২৬-১২৭

৩৪. অমলা হোম, অতিআধুনিক বাংলা সাহিত্য (ভারতবর্ষ, ১৪:২:২, মাঘ ১৩৩৩) পৃ ২৯২

৩৫. শব্দ ঘোষ, নির্মান ও সৃষ্টি (বিশ্বভারতী) শান্তি নিকেতন, ১৩৮৯, পৃ- ১০৪-১০৫

৩৬. সৃজনীকান্ত দাস অপস্মৃতি, (প্রথম খণ্ড) ডি.এম, লাইব্রেরি, কালিকাতা, অগ্রাহায়ন ১৩৬১) পৃ-২৩৬

৩৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সাহিত্য ধর্ম, সাহিত্যের পথে, পৃ-৭৫

৩৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সাহিত্য ধর্ম, সাহিত্যের পথে, পৃ-৭৬-৭৭

৩৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সাহিত্য ধর্ম, সাহিত্যের পথে, পৃ-৮১

৪০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সাহিত্য ধর্ম, সাহিত্যের পথে, পৃ-৭৮১-৮২

৪১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সাহিত্য ধর্ম, সাহিত্যের পথে, পৃ-৮২

৪২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সাহিত্যধর্ম, সাহিত্যের পথে, পৃ ৮১

৪৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সাহিত্যধর্ম, সাহিত্যের পথে, পৃ ৮২-৮৩

৪৪. নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, সাহিত্যধর্মের সীমানা, যুগপরিক্রমা (সেনগুপ্ত ট্রাস্ট, কলিকাতা, প্রপ্র ১৯৬১), পৃ ১৫০

৪৫. নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, সাহিত্যধর্মের সীমানা, যুগপরিক্রমা (সেনগুপ্ত ট্রাস্ট, কলিকাতা, প্রপ্র ১৯৬১), পৃ ১৬৪

৪৬. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সাহিত্যের রীতি ও নীতি, শরৎ সাহিত্য সংগ্রহ (অষ্টম সম্ভার), (এম,সি, সরকার এন্ড সন্স প্রা: লি:, প্রকাশকাল অনুল্লেখিত), পৃ ২৭৪

৪৭. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সাহিত্রের রীতি নীতি, শরৎ সাহিত্য সংগ্রহ (অষ্টম সম্ভঅর) (এম,সি, সরকার এন্ড সন্স প্রা: লি:, প্রকাশকাল অনুল্লেখিত), পৃ ৩৭৭

৪৮. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সাহিত্রের রীতি নীতি, শরৎ সাহিত্য সংগ্রহ (অষ্টম সম্ভঅর) (এম,সি, সরকার এন্ড সন্স প্রা: লি:, প্রকাশকাল অনুল্লেখিত), পৃ ৩৮০

৪৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সাহিত্যে নবত্ব, সাহিত্যের পথে, পৃ ৮৬

৫০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সাহিত্যে নবত্ব, সাহিত্যের পথে, পৃ ৮৬

৫১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সাহিত্যে নবত্ব, সাহিত্যের পথে, পৃ ৮৮

৫২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সাহিত্যে নবত্ব, সাহিত্যের পথে, পৃ ৮৮-৮৯

৫৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সাহিত্যে নবত্ব, সাহিত্যের পথে, পৃ ৯০

৫৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সাহিত্যে নবত্ব, সাহিত্যের পথে, পৃ ৮৯

৫৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সাহিত্যে নবত্ব, সাহিত্যের পথে, পৃ ২০

৫৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সাহিত্যে নবত্ব, সাহিত্যের পথে, পৃ ৯৭

৫৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সাহিত্যে নবত্ব, সাহিত্যের পথে, পৃ ৭৫

৫৮. সজনীকান্ত দাস, আত্মস্মৃতি (প্রথম খণ্ড), পৃ ২৫৭

৫৯. উদ্ধৃত, সজনীকান্ত দাস, আত্মস্মৃতি (প্রথম খণ্ড), পৃ ২৫৭

৬০. উদ্ধৃত, সজনীকান্ত দাস, আত্মস্মৃতি (প্রথম খণ্ড), পৃ ২৬২

৬১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সাহিত্যরূপ, সাহিত্যের পথে, পৃ ২০১

৬২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সাহিত্যরূপ, সাহিত্যের পথে, পৃ ২০৩

৬৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সাহিত্যরূপ, সাহিত্যের পথে, পৃ ২০৭

৬৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সাহিত্যরূপ, সাহিত্যের পথে, পৃ ২০৮

৬৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সাহিত্যরূপ, সাহিত্যের পথে, পৃ ২২২

wØZxq Aa¨vq

AvawbKZvev‘x mvwnZ¨ Av‡›‘vj‡bi weKvk KweZv cwÎKv I e×‡‘e emi fwgKv

AvaywbKZvev‘x mvwnZ¨ Av‡›‘vj‡bi weKvk KweZv cwÎKv I e×‡‘e emi fwgKv

বাঙলা সাহিত্যের প্রধান কবি সাহিত্যিকদের প্রায় সবাই সাময়িক পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন। এবং প্রত্যেকের পত্রিকাই বিশেষ বিশেষ সময় অসামান্য ভূমিকা পালন করেছে। সম্পদনার সাথে যুক্ত না থেকে সাংবাদিকতার জন্য সাময়িক পত্রিকার সাথে জীবিকার জন্য মাইকেল মধুসূদন দত্ত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। মাদ্রাজের দৈনিক Spectator -এর সহকারী সম্পাদক এবং Hindoo Chronicle -এর তিনি সম্পাদক ছিলেন। তার মতো কালজয়ী প্রতিভা যদি সাহিত্য সাময়িকী সম্পদনা করতেন তাহলে তা হতো বঙ্গদর্শন এর মতো অবিস্বরণীয় কীর্তি। বাংলা সাময়িকপত্রের ইতিহাস বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বঙ্গদর্শন (১৮৭২) মীর মশারর হোসেনের হিতকরী (১৮৯০), রবীন্দ্রনাথের সাধনা, ভারতী নবপর্থার্যের বঙ্গদর্শন, প্রভূতি, জলধর সেনের ভারতবর্ষ, কাজী নজরুল ইসলামের নবযুগ (১৯২০) ধূমকেতু (১৯২২) এবং লাঙ্গল (১৯২৫) বুদ্ধদেব বসুর প্রগতি ও কবিতা, হুমায়ুন কবিরের চতুরঙ্গ, সুধীরন্দ্রনাথ দত্তের পরিচয়, সরেশচন্দ্র সামাজপতির সাহিত্য এবং রমনন্দ চট্টোপাধ্যায়ের প্রবাসী প্রভূতি পত্রিকার বাংলা সাহিত্যে ভূমি বিশাল।

বুদ্ধদেব বসুর মধ্যে লেখক সত্তা ও সম্পদক সত্তার এক চমৎকার সমন্বয় ঘটেছিল। হাতে লেখা বা দেয়াল পত্রিকা বের করেছেন ছোটবেলা থেকেই। ঢাকায় এসে নবম শ্রেণিতে বর্তি হওয়ার আগেই নোয়াখালী থাকতে তিনি হাতে লেখা পত্রিকা বের করেন,তার নিজের ভাষায় বিকাশ অথবা পতাকা নামে একটি হাতেলেখা মাসিক পত্রের আমি সম্পাদক, প্রধান লেখক ও লিপিকর সম্পাক হিসেবে তার প্রথম উল্লেখযোগ্য কাজ বালিজি স্কুল ম্যাগাজিনের সম্পাদকের দায়িত্ব পালনকরী।

বুদ্ধদেব বসু নিঃসন্দেহে ভালো শুধু নন, ছিলেন নিষ্ঠাবান সাহিত্য পত্রিকা সম্পাদক কিন্তু তিনি যখন তাঁর অতি-প্রশংসিত কবিতা পত্রিকা বের করেন তখন একজন উচ্চ মানসম্পন্ন সাহিত্যপত্রিকার সম্পাদকের ভূমিকা পালনের চেয়ে একটি লিটল ম্যাগাজিনের সম্পাদকের

চরিত্রই ধারণ করেন। একটু প্রতির্থান বিরোধী আগ্রহই তাতে বেশি প্রকাশ পায়। কবিতা প্রকাশের প্রাক্কালে বুদ্ধদেব ও প্রেমেন্দ্র মিত্র বৌদ্ধ স্বাক্ষর মাসিক বিচিত্রায় একটি ঘোষণা দেন। সেই বিজ্ঞাপনের ভাষায় উচ্চ মানের সাহিত্য সম্পাদকের চেয়ে বরং তারুণ্যের আবেগই প্রধান্য পায়। বুদ্ধদেব বসুর লেখা সেই বিজ্ঞাপনে বলা হয়েছিল আজকালকার অনেক কবিই অনিচ্ছুক এবং এ অনিচ্ছা। অন্যায়ও নয়। কেননা অম্নিবাস মাসিকপত্রের পশ্চিমশেলি ভিড়ের মধ্যে সত্যিকারে ভালো কবিতারও কেমন একটা বাজে ও তুচ্ছ চেহারা যেন হয়ে যায়। কবিতাকে যথোচিত গৌরবে বিশেষভাবে ছেপে থাকে এমন সাময়িকপত্রে। বর্তমানে দশে বেশি নেই। অথচ আধুনিক কবির অনেকেই নতুন কবিতা লিখছেন বাইরের পাঠক মণ্ডলী দূরে থাক, সব সময় নিজেদের মধ্যেও সেগুলো দেখাশোনার সুবিধা হয় না।

এই কারণে আমরা একটি ত্রৈমাসিক কবিতাপত্র বার করতে বাধ্য হচ্ছি, পত্রিকার নাম হবে কবিতা এবং তাতে শুধু থাকবে কবিতা। আঞ্চলিক শ্রেষ্ঠ কবিরা সকলেই এতে তাদের রচনা প্রকাশ করবেন। নবীন কবির ভালো কবিতাও ছাপট। পাওয়া যায় প্রকাশিত হবে। প্রথম সংখ্যা বেরুবে ১লা আশ্বিন।" (বিচিত্রা, কার্তিক ১৩৪২)

ঘোষণাটি প্রকাশিত হয় বিচিত্রার কার্তিক সংখ্যা, অথচ বলা হলো কবিতা বেরোবে আগামী ১লা আশ্বিন-এই আশ্বিন কি ১৩৪৩ এর ১লা আশ্বিন কবিতা যখন প্রকাশিত হয় তখন বাংলা সাহিত্য পত্রিকার স্বর্ণযুগ। সেসব কাগজে প্রধান অপ্রধান কবিদের কবিতা। যথোচিত গৌরবে বিশেষভাবে কেই ছাপা হতো। হয়তো নতুন কবিদের ঠাঁই হওয়ার কিছু নাই। এই ঘোষণা একটি ত্রৈমাসিক কবিতাপত্র বার করতে বাধ্য হওয়ার কিছু নাই। এই ঘোষণাটির ভাষা বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, এতে সম্পাদকের লিটল ম্যাগাজিনটির মনোভাবই প্রকাশিত হয়েছে খবর সম্পন্ন সাহিত্যে সম্পাদকের সীথার্য গভীরতা ও পরিমিতবোধ অনুপস্থিত, বুদ্ধদেবের সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের অন্য প্রধান কবি লেখকদের পার্থক্য এখানে যে, তিনি আমন্তুতিতে অপ্রতিদ্বারা বুদ্ধদেব বসু '১৯৩৫ সালে যখন কবিতা পত্রিকা প্রকাশের এদ্যাগ তোড়জোর করছেন বাংলাদেশের সাময়িকপত্র বা সাহিত্যপত্রের আদৌ কোনো অভাব নেই। অনেক নামী পত্রিকা তখন বেশ সাফল্যর সঙ্গে পাঠকদর মন জয় করেছে, তাদের প্রচারসংখ্যাও বেশ ভাল।

ঢাকা ছেড়ে আসবার আগেই ভেঙে গিয়েছিল বুদ্ধদেবের প্রগতি-রদল, কল্লোল উঠে যাওয়ার পর ভেঙ্গে গেল কল্লোলের গোষ্ঠী-আড্ডাও। কলকাতার নতুন কোনো সাহিত্যিক আড্ডার টান আর আকর্ষণ করতে পারেনি বুদ্ধদেবকে ১৯৩১ সালেই শেষের দিকে প্রকাশিত পরিচয় পত্রিকার যে-নতুন আড্ডা গড়ে উঠেছিল সম্পাদক সুধীন্দ্রনাথ দত্তের বাড়িতে, সাহিত্যিক সহমর্মিতা সত্ত্বেও বুদ্ধদেব সে-আড্ডায় স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করেননি আড্ডাকে বড়ো বেশি পরিশীলিত মনে হতে বলে। আরও একটা আড্ডা গড়ে উঠেছিল সঞ্জয় ভট্টাচার্যের পূর্ব্বাশাকে কেন্দ্র করে, যার আয়োজনহীন আভরণহীন বৈঠকে পরিচয়-এর একেবারে উল্টো চবি ছিল। পরিচয় পত্রিকার আড্ডাতে অন্নাদাংশকের হাতে বুদ্ধদেব দেখেন ইংরেজি ভাষার পোয়েট্রি পত্রিকার একটি কপি যা তাকে মুগ্ধ করে শুধু নয়, তার পুরনো স্বপ্নটাকে উসকে দেয়। ১৯৩২ সালে এর মাঝামাঝি বুদ্ধদেব বসুর সঙ্গে পরিচয় গোষ্ঠীর মতান্বর ঘটায় সেখান থেকে সরে আসেন। সালের অক্টোবরে প্রকাশিত কবিতা পত্রিকা শুধুই একটি পত্রিকা নয়, স্বপ্ন আর তা আজকে ইতিহাসের অন্তর্গত।

বাংলা কবিতায় রবীন্দ্রনাথ পরবর্তী আধুনিকতার সূত্রপাতের পেছনে যেমন সক্রিয় ছিল ইউরোপীয় সাহিত্যের প্রভাব, তেমনই বাংলা কবিতার অন্যরকম কবিতাপত্রের প্রকাশনার পেছনেও ইউরোপীয় একটি ইংরেজি কবিতাপত্রের প্রভাব।

কবিতা পত্রিকার প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১৩৪২-এর আশ্বিনে, সম্পাদক ছিলেন বুদ্ধদেব বসু ও প্রোমেন্দ্র মিত্র, সহকারী সমর সেন। আর, কবিতা পত্রিকার প্রকাশ বন্ধ হয় ১৯৬১ সালে-১৩৬৭-র চৈত্র সংখ্যাই কবিতা-র শেষ সংখ্যা; সেটি ছিল পঞ্চাবিংশ বর্ষের তৃতীয় সংখ্যা। তখন সম্পাদক এককভাবে বুদ্ধদেব বসু। তৃতীয় বর্ষের সূচনা থেকেই প্রেমেন্দ্র মিত্র আর সম্পাদক হিসেবে যুক্ত ছিলেন না কবিতার সঙ্গে, সমর সেনও সম্পাদকরূপে যুক্ত ছিলেন ১৩৪৭-এর পৌষ সংখ্যা পর্যন্ত। তারপর থেকে ১৩৬১-র আশ্বিন সংখ্যা পর্যন্ত দীর্ঘ সময় বুদ্ধদেব একাই কবিতা পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন। তারপর, বছর চারেক (পৌষ ১৩৬১ থেকে পৌষ, ১৩৬৫ সংখ্যা পর্যন্ত) সহকারী সম্পাদক হিসাবে নরেশ গুহ এবং ১৩৬৬-র পৌষ সংখ্যায় সহযোগী সম্পাদক হিসেবে জ্যোতির্ময় দত্ত যুক্ত থাকলেও প্রধানত সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করেছেন বুদ্ধদেবই। তবে, যৌথ বা একক-ভাবেই সম্পাদনার দায়িত্বে থাকুন, সুভাষ মখোপাধ্যায়ের ভাসায়– কবিতা ছিল একজনেরই হাত ধরা-বুদ্ধদেব বসুর। সুভাষ

মুখোপাধ্যায়ের এই মন্তব্যের সমর্থন মেলে এই তথ্য থেকেও-বহু বছর পরে, বুদ্ধদেব যখন অধ্যাপনার দায়িত্ব নিয়ে আমেরিকায়, তখনও নরেশ গুহ কবিতায় প্রকাশের জন্য প্রাপ্ত প্রতিটি কবিতা পরিচ্ছন্ত হস্তাক্ষরে নকল করে আমেরিকায় পাঠিয়েছেন বুদ্ধদেবের অনুমোদনের জন্য। প্রতিটি কবিতার পাশে নরেশ গুহ নিজের মন্তব্য যোজনা করলেও, অনুমোদনের চূড়ান্ত নির্দেশ আসত প্রবাসী বুদ্ধদেবের কাছ থেকেই।

কবিতা পত্রিকার সম্পাদনা, বুদ্ধদেবের দীর্ঘদিনের স্বপ্নের পূর্ণতা। জীবনের নানা পর্বেই পত্রিকার সম্পাদনা করেছেন বুদ্ধদেব–প্রথম যুগের হাতে-লেখা পত্রিকাগুলি বা বিখ্যাত প্রগতি ছাড়াও কবিতা প্রকাশের কিছুদিন পরে কবিতার পাশাপাশি বৈশাখী নামে একটি বার্ষিকী প্রকাশ করেছিলেন বুদ্ধদেব; ১৩৪৮ (১৯৪১) বঙ্গাব্দে প্রকাশিত বার্ষিকীটির সম্পাদক ছিলেন বুদ্ধদেব বসু, অজিত দত্ত ও দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। পরে বৈশাখী-র বেশ কিছু সংখ্যার সম্পাদনা করেছেন বুদ্ধদেব বসু, নীহাররঞ্জন রায় ও জ্যোতির্ময় রায়। এ ছাড়া, ১৯৩৮ সালে প্রকাশিত হয়েছিল চতুরঙ্গ-ত্রৈমাসিক সাহিত্যপত্র, প্রথম বছরটিতে হুমায়ুন কবিরের সঙ্গে এই পত্রিকার যুগ্ম-সম্পাদক ছিলেন বুদ্ধদেব বসু।

কিন্তু কবিতা পত্রিকার প্রাণশক্তি ছিলেন বুদ্ধদেব। পত্রিকার নামকরণ থেকেই স্পষ্ট, এর বিষয় ছিল কবিতা। বহুদিন ধরেই বাংলা মাসকিপত্রগুলিতে কবিতা ব্যবহৃত হয়েছে গদ্যের ফাঁকে পাদপূরণের জন্য। সেই অসম্মানের ভূমিকা থেকে কবিতাকে মুক্ত করতে, স্বাতন্ত্র্যের প্রাপ্য মর্যাদা দিতে এই ভূমিকা পত্রিকার পরিকল্পনা করেছিলৈন বুদ্ধদেব। তার নিজের কথায়, কবিাত প্রকাশিত হবার পর, বাংলা ভাষায় কবিতা-লেখা কাজটি আর কারও ব্যক্তিগত উচ্চাশাপূরণের উপায় হয়ে নেই, হয়ে উঠেছে একটি আন্দোলন, কবিতা সেই আন্দোলনের মুখপাত্র। শুধু কবিতার জন্য পত্রিকা-সম্পাদনার একটা প্রেরণা হয়তো বুদ্ধদেব পেয়েছিলেন কবিতাসর্বস্ব ক্ষীণকায় মার্কিনি পত্রিকা পোয়েট্রি থেকে।

তেত্রিশ পাতা জোড়া শুধু কবিতা এবং সাত পাতার সম্পাদকীয় নিবদ্ধ কবিতার দুর্বোধাতা-এই নিয়ে মোট চল্লিশ পাতার ক্ষীণকায় এবং বিজ্ঞাপনহীন কবিতার প্রথম সংখ্যাটি প্রকাশিত হয়েছিল। কিউবিস্ট ছাঁদে বিশাল অক্ষরে এর প্রচ্ছদ একেছিলেন শিল্পী অনিল ভট্টাচার্য। প্রথম সংখ্যার কবি-তালিকায় ছিলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব বসু, বিষু দে, সমর সেন, সঞ্চয়

ভট্টাচার্য, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, জীবনান্দ দাশ, অজিতকুমার দত্ত, প্রণব রায়, স্মৃতিশেখর উপাধ্যায়, হেমচন্দ্র বাগচী।

হয়েছিল বুদ্ধদেব বসুর কঙ্কাবর্তী বিষয়ে আলোচনা-সমালোচক ছিলেন জীবনানন্দ দাশ।

আর, রবীন্দ্রনাথের বীথিকা, পত্রপুট, শ্যামলী, খাপছাড়া, নবজাতক, সে, রোগশয্যায়, আরোগ্য, জন্মদিনে, শেষ লেখা প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থের সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছিল কবিতা পত্রিকায়–অধিকাংশই নতুন কবিতা বিভাগেই।

কবিতার পাতায় এই আলোচনাগুলি থেকে বুদ্ধদেবের কাব্যদর্শ এবং কাব্য-সমালোচনার প্রবণতাটি চিনে নেওয়া যায়। বোঝা যায়, কবিতার বিচারে বুদ্ধদেব সবসময়েই মনোযোগ দিয়েছেন কবিতার আঙ্গিড়কের আলোচনায়–মিলের, ছন্দের ফর্মের বিশ্লেষণে, কিন্তু কবিতার ভাব-ব্যাখ্যায় কখনোই আকৃষ্ট হননি। কবিতায় তিনি প্রধানাত খুজেছেন শব্দের সম্মোহন, ছন্দের ইন্দ্রজাল; তাই কবিতার পাতায় পাতায় তার কাব্য-সমালোচনাগুলি মূলত কাব্যকৌশলেই আলোচনা হয়ে উঠেছে। আর এ থেকেই এক নতুন সমালোচনার ধরনও গড়ে উঠেছে।

যেমন, রবীন্দ্রনাথের ছড়া গ্রন্থের অভিনব সমালোচনা করেছিলেন বুদ্ধদেব ছড়া লিখেই–দীর্ঘ ছড়াটির শেষাংশে ছিল–

....'একেবারেই অসংলগ্ন, নিতান্ত অসঙ্গত,

ছন্দ যত নৃত্য তোলে চিত্র হানে রং ততত।

মিলের চুনিপান্না জ্বলে, অনুপ্রাসে চমক দেয়,

অথচ তার একটিও নেই অভিধানের নিমক খায়।

.. কেউ বলবে সমাজ-চেতন দৃষ্টিভঙ্গি পাচ্ছি ঠিক,

কেউ বলবে এ তো নিছক surrealistic ।

আমি দেখছি মেঘ করেছে সূয্যি ডোবে-ডোবে,

পূর্ণিমায় আগুন জ্বলে সর্বনামের লোভে।

তবু বৃষ্টি আজো পড়ে ছন্দে নামে বান,

লাবণ্যের বন্যা আনে ছেলেবেলার গান।

চিন্তা নেই, চেষ্টা নেই, একটুও নেই দায়িত্ব,

এ কথাটা জানে না যে একেই বলে সাহিত্য।

ভরলো হৃদয় মধুরতায় শ্যামল হলো শুষ্কতা,

এই তো জানি কাব্যকলার প্রথম এবং শেষ কথা।

–সৌন্দর্যবাদী বুদ্ধদেবের পরিচয় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে এই সমালোচনায়, বোঝা যায় ইংরেজি ইসতেটিক আন্দোলনের প্রতিনিধি সুইনবার্ণ বা অস্কার ওয়াইল্ডের সঙ্গে তার কতখানি প্রাণের যোগ ছিল। বুদ্ধদেবের পরবর্তীকালের বোদলেয়ারমগ্নতার সূত্রও খুঁজে পাওয়া য়ায় এই প্রভণতা থেকে।

নানা কারণেই বাংলা সাময়িকপত্রের ইতিহাসে অভিনবত্বের দাবি রাখে 'কবিতা' পত্রিকা। আধুনিক কবিতার সশ্রদ্ধ পরিবেশন ছিল কবিতা-র প্রাথমিক প্রতিশ্রুতি; দলমতনির্বিশেষে ভালো কবিতার প্রচার ও প্রসারই একমাত্র লক্ষ্য ছিল বলে এই পত্রিকার সম্পাদকীয় নীতিটিও বিশেষভাবে তাৎপর্যময়। কবিতার পাতায় পাতায় ছড়িয়ে আছে সম্পাদকের এই উক্তির প্রতিফলন–'...কী এসে যায় তুচ্ছ মতভেদে, যখন তিনি এত বালো কবিতা লিখছেন? –অমিয় চক্রবর্তী প্রসঙ্গে এই মন্তব্য করলেও নবীন-প্রবীণ চেনা-অচেনা সব ভালো কবির জন্যই বুদ্ধদেবের এই মনোভাই ছিল। কবিতা-র নিয়মিত লেখকেরাও অনেকেই একে অন্যের কবিতা পছন্দ করতেন না, –কখনও কবিতার পাতাতেই প্রকাশিত ব্যঙ্গাকবিতায়, কখনও পারস্পারিক উদাসীনতায় এই অপছন্দ প্রকাশ পেত। কিন্দু বুদ্ধদেব প্রগাঢ় ভালোলাগায় এদের সকলেরই অনুরাগী ছিলেন, ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দের বহু উর্ধ্বে স্থান দিয়েছিলেন ভালো কবিতা-বিষয়ে তার ভালোবাসার বোধকে। দুর্মর কবিতাপ্রেমিক যুদ্ধদেব নিজের সেই বালোবাসার বোধকে বৃহত্তর পাঠকসমাজের কাছে পৌঁছে দেবার দায় অনুভব করেছিলেন, অপরিমেয় নিষ্ঠায় পচিশ বছর ধরে সেই দায় বহন করে চলেছিলেন কবিতা পত্রিকার মাধ্যমে।

'কবিতার পাঠক' নামক সম্পাদকীয়টিতে (আষাঢ় ১৩৪৩, কবিতা) বুদ্ধদেব আক্ষেপ করেছিলেন যে, অনেকে যেমন বর্ণান্ধ হয়ে জন্মায়, তেমনি অনেকেই কবিতাবধির হয়েও জন্মায়, তবু উপসংহারে আশা করেছিলেন– কবি তৈরী করা যায় না, কিন্তু অনুকুল অনুষঙ্গে কবিতার পাঠক তৈরী হতে পারে। ভালো পাঠকের সংখ্যা অল্প, কিন্তু বাড়ানো যেতে পারে এবং ভালো পাঠক তৈরী হতে পারে। ভালো পাঠকের সংখ্যা ভালো পাঠক যত বেশি হয় কবির ও কবিতার পক্ষে ততই ভালো। বুদ্ধদেবের নেতৃত্বে কবিতা পত্রিকা এই ভালো পাঠক তৈরীর উদ্যোগ নিয়েছে, ভালো কবিতাকে জনপ্রিয় করার প্রয়াস করেছে পঁচিশ বছর ধরে।

আধুনিক বাংলা কবিতা বিচারের এক নতুন সমালোচনা-পদ্ধতিও নির্মাণ করেছিল কবিতা পত্রিকা। নবীন কবিদের প্রকাশিত প্রতিটি সমকালনি কাব্যগ্রন্থের সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছে কবিতায় এই নতুন কবিতা বিভাগের অধিকাংশ সমালোচনার অক্লান্ত লেখক ছিলেন বুদ্ধদেব স্বয়ং। যেমন, কবিতার প্রথম যুগে এই বিভাগে আলোচিত বইগুলির কয়েকটি ছিল–সমর সেনের কয়েকটি কবিতা (আঢ়াল ১৩৪৪), সুধীন্দ্রনাথ দত্তের ক্রন্দসী (আশ্বিন, ১৩৪৪) কিন্তু দের চোরাবালি (চৈত্র ১৩৪৪), অমিয় চক্রবর্তীর খসড়া সব কটি সমালোচনাই লেখক বুদ্ধদেব বসু; আর, পৌষ ১৩৪৪ সংখ্যায় প্রকাশিত।

আবার, বিষু দের চোরাবালি কাব্যগ্রন্থের সমালোচনায় কবির পাণ্ডিত্যসৃষ্ট দুর্বোধ্যতায় বিচলিত বুদ্ধদেব ওফেলিয়া আর ক্রেসিডা কবিতার সমালোচনায় লিখেছিলেন (চৈত্র ১৩৪৪) ও দুটি কবিতায় কেন যে এক স্ট্যাঞ্জার পর আর এক স্ট্যাঞ্জা আসছে, সেটাই আমার কাছে রহস্য। কিংবা, খুব সংগতভাবেই বুদ্ধদেব আপত্তি করেছেন বিষু দের-অপ্রচলিত, কঠিন শব্দ ব্যবহারের প্রবণতা নিয়ে উদহরণ দিয়েছেন কবিতায় ব্যবহৃত ক্রতুকৃতম, অপাপবিদ্ধাবির, সোৎপ্রাশপাশ প্রভৃতি শব্দের যা পাঠকের স্বচ্ছন্দ উপভোগকে নির্যাতিত ও নষ্ট করবে বলেই তার ধারণা। বুদ্ধদেব প্রশ্ন তুলেছেন, আধুনিক কবিতার সাধনা যেখানে কাব্যের ভাষাকে মুখের বাষার কাছাকাছি আনবার, আপনার কি মনে হয় ন্যায়ের পরিভাষা কি মামির মতো মৃত ও প্রাচীন সংস্কৃত শব্দের স্থান আছে সেখানে?

রবীন্দ্রনাথের পত্রপুট কাব্যের সমালোচনাতেও (আশ্বিন ১৩৪৩) বুদ্ধদেব আপত্তি করেছেন রবীন্দ্রনাথের সমাসে, সন্ধিতে, অনুপ্রাসে, অমৌখিক সংস্কৃত শব্দের ব্যবহার নিয়ে; তবে,

আলোচনায় এ কথাও বলেছেন যে, পত্রপুট-এর কবিতায় তিনি গীতিকবিতার ইঙ্গিতের ঐশ্বর্য্য আশা করেননি, তার বদলে কবিতায় খুঁজে পেয়েছেন বিশাল চিন্তার প্রসারিত ডালগালার মর্মর, পেয়েছেন যত দ্বন্দ্ব যত সমস্যার মেঘ পশ্চিমের সূর্য্যের চারদিকে ঘন হয়ে এসেছে, তারই অপূর্ব বিচ্ছুরিত বর্ণচ্ছটা।

কবিতার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগই ছিল রবীন্দ্রনাগ্রন্থ সমালোচনা। নতুন কবিতা বিভাগে যেমন আলোচিত হত রবীন্দ্রাথের শেষ পর্যায়ের কাব্যগ্রন্থগুলি তেমনই, রবীন্দ্ররচনাবলির সমালোচনার সূত্রে বুদ্ধদেব আলোচনা করেছিলেন রবীন্দ্রনাতের প্রথম পর্বের কবিতার বইগুলির। এই আলোচনাগুলি থেকেও বুদ্ধদেবের রবীন্দ্র-ভাবনা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে কবিতার পাতায়।

দ্বিতীয় সংখ্যা থেকেই কবিতায় রবীন্দ্রনাথের রচনা প্রকাশিত হয়েছে। আর এ থেকে বোঝা যায়, প্রগতি-র যুগ থেকে কবিতার যুগে কীভাবে বদল ঘটে গেছে সম্পাদকের মানসিকতায়। প্রগতি যুগে রবীন্দ্রনাথকে সহনীয় ও ব্যবহার্য করার জন্য বোঝা-পড়ার প্রস্তুতির প্রয়োজন হয়েছিল বুদ্ধ দেবের অঙ্গীকার করার জন্য প্রয়োজন হয়েছিল তাকে পরিহার করার। আর কবিতার যুগে এসে প্রয়োজনের রূপটাই বদের গেছে। এখন আর বুদ্ধদেবের রবীন্দ্রনাথকে পরিহার করার প্রয়োজন নেই, নিজের আত্মবিশ্বাসী পদক্ষেপকে এখন মিলিয়ে নেওয়া যায় রবীন্দ্রনাথের অসামান্য উপস্থিতির পদক্ষেপকে এখন মিলিয়ে নেওয়া য়ায় রবীন্দ্রনাথের অসামান্য উপস্থিতির সঙ্গেও। তাই, প্রগতির সচেতন রবীন্দ্র-অপুপস্থিতির প্রতিতুলনায় কবিতায় দেখা যায় রবীন্দ্রনাথের অনায়াস অবিরল উপস্থিতি।

বুদ্ধদেবের নিজস্ব কাব্যভাবনার প্রকাশ ঘটেছে কবিতার সম্পাদীয়কীয়গুলিতেও। যেমন, কবিতার প্রথম সম্পাদকীয় কবিতার দুর্বোধ্যতায় বুদ্ধদেব লিখেছিলন কবিতা সম্বন্ধে বোঝা কথাটাই অপ্রাসঙ্গিক। কবিতা আমরা বুঝি নে, কবিতা আমরা অনুভব করি। কবিতা আমাদের কিছু বোঝায় না সম্পর্শ করে, স্থাপন করে একটা সংযোগ। গদ্যকবিতার প্রয়োগরীতি নিয়েও নানা আলোচনা চড়িয়ে আছে যেমন সম্পাদকীয় রচনায়, তেমনই নানা প্রবন্ধেও রবীন্দ্রনাথ থেকে আন্নদা শঙ্কর (লীলাময় রায় নামেও) পর্যন্ত নানা জনের আলোচনায়।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য কবিতার বিশেষ সমালোচনা-সংখ্যাটি। তৃতয়ি বর্ষে (বৈশাখ ১৩৪৫) প্রকাশিত এই সংখ্যাটিকে আধুনিক বাংলা কবিতার ইস্তাহার বলা চলে। রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ, সুধীন্দ্রনাথ, বিষু দেব, বদ্ধুদেব, অজিত দত্ত, সমর সেন প্রভৃতি বাংলা কবিতার সমকালীন প্রাণপুরুষেরা নানা দিক থেকে আধুনিক বাংলা কবিতার আলোচনা করেছিলেন এই বিশেষ সংখ্যাটিতে। এই সংখ্যার বিশিষ্ট প্রবন্ধগুলির মধ্যে কয়েকটি ছিল– সাহিত্যর স্বরূপ (রবীন্দ্রনাথ), কবিতার কথা (জীবনানন্দ), বাংলা মিলের দুরুহ তত্ত্ব (অজিত দত্ত), স্বগত (সুধীন্দ্রনাথ দত্ত), বাংলা কবিতা (সমর সেন), কাব্যের বিপ্লব ও বিপ্লবের কাব্য (আবু সয়ীদ আইয়ুব), কবি ও তার সমাজ (বুদ্ধদেব) ইত্যাদি।

রাজনৈতিক মতবাদের স্পর্শহীনতা কবিতার অন্যতম বিশিষ্ট চরিত্রলক্ষণ ছিল। প্রগতি লেখক সঙ্গ সঙ্গে প্রথম পর্বে যুক্ত ছিলেন বুদ্ধদেব, ক্রমশ প্রগতিশিবিরের সঙ্গে যোগ বিচ্ছিন্ন হলেও সাম্যবাদী কবিরা কবিতায় অভ্যার্থিতই হয়েছেন। সুভাষ মুখোপাধ্যায়, গোলাম কুদ্দুস, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, সুকান্ত ভট্টাচার্য প্রমকের কবিতা প্রকাশিত হয়েছে কবিতা পত্রিকায়।

সুকান্ত ভট্টাচার্যের অকাল প্রয়াণের পর বুদ্ধদের আশ্চর্য মমতায় অসাদারণ শোকবার্তা লিখেছিলেন কবিতর পাতায়; যদিও ব্যক্তিগতভাবে সুকান্ত বুদ্ধদেবের ঘনিষ্ঠ পরিচিত ছিলেন না, তার রাজনৈতিক বিশ্বাস থেকেও বহু দূরে ছিরেন বুদ্ধদেব। এই শোকবার্তাগুলিকে কবিতার সম্পদ বলা চলে। দেশি-বিদেশি কবি-সাহিত্যক-অভিনেতা-নাট্যকার-জীবনের নানা ক্ষেত্রের সুপরিচিত ব্যক্তিত্বদের বুদ্ধদেব। এই বিভাগে স্মরণ করেছেন আর এই বার্তাগুলির অধিকাংশেরই রচয়িতা ছিলেন বুদ্ধদেবই।

বাংলা সাময়িকপত্রের ইতিহাসে কবিতার আত্মপ্রকাশ এক ঐতিহাসিক ঘটনা। কবিতার সম্রদ্ধ উপস্থাপনা, দল-মত-গোষ্ঠী-নিরপেক্ষ সম্পাদকীয় ঐদার্য, কাব্যবিচারের নতুন সমালোচনা-পদ্ধতি নির্মাণে কবিতা এই গৌরব অর্জন করেছিল।

কবিতা পত্রিকা প্রকাশের পরের বছরই লিটল থিয়েটার নামে একটা নাটকের দল গড়ে উঠেছিল, যার প্রধান উদ্যোক্ত ছিলেন প্রতিভা বসু। অভিনয় করার জন্য লেখা হল বুদ্ধবের কাব্যনাট্য-অনুরাধা-অবশ্যম সমকালের কিছু সাহিত্যিক আলোচনার প্রতিক্রিয়াও এই নাকটি

রচনার মূলে ক্রিয়াশীল ছিল। রবীন্দ্রনাথের পরিশেষ ও পুনশ্চর ছন্দোবদ্ধ ভাষায় কথ্য-রীতি আর গদ্যের কাব্যকে ব্যবহার নিয়ে সমকালীন নানা আলোচনা, এজরা পাউন্ড আর এলিয়েটের প্রভাব, সুধীন্দ্রনাথের ভাষায় গদ্য-পদ্যের বিরোধ ভঞ্জন নিয়ে বিতর্ক, –এইসব আলাপ-আলোচনা থেকেই জন্ম হয়েছিল কাব্যনাট্যটির। অনুরাধার সংলাপ ছিল এইরকম।

এরপর কাল আর এর পর কাল

আসিলো কলকাতার আরো এক কাল

আসিলো কলকাতার আরো এক দিন

চেয়ে দেকো কলকাতার আরো এক সকাল।

রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে এতখানি আন্দোলিত, বিক্ষুব্ধ অথবা প্রাণিত হননি একালের কোনো কবি, যতখানি হয়েছেন বুদ্ধবে। রবীন্দ্র-বিরোধিতায় অভিযুক্ত হয়েছেন তিনি বারবার, এমনকি রবীন্দ্র-শর্তবর্ষের সমেয় তারই লেখা জন্ম দিয়েছিল এক ব্যাপক বিক্ষোভ-তবুও তার মতো সৃষ্টিশীল রবীন্দ্রভক্ত হয়তো বিরল। তাই বারবার তাঁকে আসতে হয় রবীন্দ্র-রচনার সান্নিধ্যে। চিন্তায়, বিচারে, ধ্যানে অনুধ্যানে প্রতিবারই নবজন্ম ঘটে যায় তাঁর কাছে রবীন্দ্র-রচনার। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে এতখানি সচেতন অথচ অনুভূতিস্পৃষ্ট, বিশ্লেষণী বিচারক অথচ মুগ্ধ বিস্ময়ী আর কোনো কবিতে আমরা পাইনি কখনো।

কবিতার পত্রিকায় একদিকে যেমন আধুনিক কবিতার চর্চা হয়েছে, তেমনি রবীন্দ্রনাথও তার স্থায়ী বিষয়। এই ব্যাপক রবীন্দ্রন্দ্রচর্চার মধ্য দিয়ে হয়তো আধুনিকতারই পথ খুজে নিতে চাইছলেন বুদ্ধদেব। তার মতো আধুনিক বাঙালি কবিদের মধ্য আর কেউ এভাবে রবীন্দ্র-সান্নিধ্যের জন্য উন্মুখ এবং রবীন্দ্রনাথকে অস্বীকার করার ব্রত একই সঙ্গে যাপন করেননি। রবীন্দ্রনাথকে দূরে সরিয়ে রেখে নয়, তাকে সামনে রেখেই যে আধুনিকতাকে প্রতিষ্ঠা করতে হবে, এ মূল সত্যটি বুদ্ধদেবই প্রথম বুঝেছিলেন।

"আমরা একটি ত্রৈমাসিক কবিতাপত্র বার করেছি–তার প্রথম সংখ্যা আজ আপনাকে পাঠালাম। একটা জিনিস আপনার চোখে পড়বেই– এ সংখ্যায় অধিকাংশ কবিতাই গদ্য। পুনশ্বতে আপনি যে গদ্য ছন্দের প্রবর্তন করেছেন, তা বিভিন্ন কবির হাতে বিভিন্ন রকম রূপ নিয়ে বাংলা কবিতায় স্থায়ী হতে চলেছে বলে মনে হয়। আমার নিজের বিশ্বাস, ভবিষ্যৎ

বাঙলা কবিতা পদ্যে যতখানি লেখা হবে গদ্যে তার কম নয়। এর অবাধ মুক্তি এবং সেই মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে অতি সূক্ষ্ম তাল ও মাত্রা অনেকেকেই আকর্ষণ করবে। মোটের উপর আমাদের এ পত্রিকা আপনার কেমন লাগলো জানালে খুশি হবো। আগামী সংখ্যার জন্য আপনার দু' একটি কবিতা প্রার্থনা করি। গদ্যের নতুন কোনো ভঙ্গির রচনা পেলে খুশি হই।"

কবিতার প্রথম সংখ্যা বেরিয়েছে আশ্বিন ১৩৪২; বুদ্ধদেব রবীন্দ্রনাথকে ঐ চিঠি লেখেন ৩০-৯-১৯৩৫ তারিখে। কবিতার প্রথম সংখ্যা পড়ে রবীন্দ্রনাথ তার ভালোলাগা জানিয়েছেন বুদ্ধদেব। কিন্তু নতুনদের গদ্যছন্দ নিয়ে সম্পূর্ণ স্বস্থ বোধ করেননি যে তিনি তা স্পষ্ট বোঝা যায় গদ্য ছন্দ নিয়ে তার আলোচনায়। বুদ্ধদেব লিখেছেন তাঁরই (রবীন্দ্রনাথ) হাতের তৈরী গদ্যছন্দ উত্তরসূরীদের হাতে কী ধরনের রূপমিতি গ্রহণ করেছে, কবিতায় প্রকাশিত কবিতাবলী তারই পরিচয় দেবে।

কবিতার প্রথম সংখ্যা পড়ে বুদ্ধদেবকে রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছিলেন, "তোমাদের কবিতা পত্রিকাটি পড়ে বিশেষ আনন্দ পেয়েছি। এর প্রায় প্রত্যেক রচনার মধ্যে বৈশিষ্ট্য আছে। অল্প দিন আগে পর্যন্ত দেখেছি বাংলায় গদ্যছন্দের কবিতা আপন স্বাভাকি চালটি আয়ত্ব করতে পারেনি। কতকটা ছিল যেন বহুকাল খাঁচায় বন্দী পাখীর ওড়ার আড়ষ্ট চেষ্টা! গদ্যছন্দের রাজত্বে আপাতদৃষিএত যে স্বাধীনতা আছে যতার্থভাবে তার মর্যাদা রক্ষা কঠিন। বস্তুত সকল ক্ষেত্রেই স্বাধীনতার দায়িত্ব পালন দূরূহ। বাণীর নিপুণ নিয়ন্ত্রত ঝঙ্কারে যে মোহ সৃষ্টি করে তার সহায়তা অস্বীকার করেও পাঠকের মনে কাব্যরস সঞ্চার করতে বিশেষ কলাবৈভবের প্রয়োজন লাগে। বস্তুত গদ্যে পদ্যছন্দের কারুকৌশলের বেড়া নেই দেখে কলমকে অনায়াসে দৌড় করাবার সাহস অবারিত হবার আশঙ্কা আছে। কাব্যভারতীয় অধিকারে সেই স্পর্দ্ধা কখনোই পুরস্কৃত হতে পারে না। অনায়াসে আগাছায় ভরা জঙ্গলকে কাব্যকুঞ্জ বলে চালিয়ে দেওয়া অসম্ভব।"

আগেই বলার চেষ্টা করেছি সম্পাদক হিসেবে বুদ্ধদেব বসুর নিজস্ব ভাবনা ও স্বপ্ন ডানা মেলবে এই পত্রিকার মধ্যবর্তিতায়। তিনি একান্তভাবেই চেয়েছিলেন এমন কোনো পত্রিকা যার মধ্যে দিয়ে কবিতা হতে পারে বিশেষভাবে প্রকাশিত ও প্রচারিত ও রসজ্ঞজনের দৃষ্টিগোচর– কবিতা পত্রিকার প্রথম সংখ্যাটিই এই ভাবনার আলোয় আলোকিত হয়ে উঠল।

কিছু সুনির্বাচিত কবিতার আয়োজনে একটি পত্রিকা এর আগে এমনভাবে কেউ দেখেন নি। সত্যিই যে দেখেন নি তার প্রমাণ পাওয়া গেল যখন পত্রিকা স্টলে দেওয়ার পরেই চাহিদা হল আরো পত্রিকার। অনেকে সাগ্রহে গ্রাহক হতে চাইলেন। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধদেব বসুকে লিখে পাঠালেন ব্যক্তিগত স্বতন্ত্র্য নিয়ে পাঠকদের সঙ্গে এরা নুতন পরিচয় স্থাপন করেছে –যে রবীন্দ্রনাথ এর আগে প্রগতি বা কল্লোল গোষ্ঠীর কবিদের কিছুটা অপছন্দের চোখেই দেখতেন। তাঁর কাছ থেকে এই মূল্যায়ন আলাদা করে মনে রাখতে হবে এবং এ-ও মনে করে নিতে হবে যে শুধু এক দীর্ঘ পত্রে কবিতা পত্রিকা বিষয়ে তাঁর বিস্তারিত মতামত জানিয়ে তিনি ক্ষ্যান্ত হননি, পরে পাঠিয়েছিলেন তার কবিতাও। এপর যতদিন তিনি জীবিত ছিলেন কবিতা পত্রিকায় তার রচনা প্রকাশিত হয়েছে। বুদ্ধদেব বসুকে তিনি ব্যক্তিগতভাবে পছন্দ করতেন ঠিকই, কিন্তু সম্পাদক বুদ্ধদবেকে অস্বীকার করে নিছকই ব্যক্তিগত সখ্যের সূত্রে তিনি কবিতায় লেখা দিয়েছেন– এটা বেবে নেওয়া সঠিক নয়।

কবিতাকে বিশেষ গুরুত্বে রসজ্ঞজনের দৃষ্টিগোচর করার যে অভিপ্রায় ছিল বুদ্ধদেবের, তার একটা অন্য প্রান্ত ছিল ভালো কবিকে এই পত্রিকার মাধ্যমে প্রকাশিত ও প্রচারিত করা। একজন সৎ কবিতাপত্রের সম্পাদকের যে এইটাই প্রধান কাজ সেটা কবিতা পত্রিকার ছাব্বিশ বছরের ইতিহাসে (১৯৩৫-১৯৬১) সম্পাদক হিসেবে বুদ্ধদেবের যে ভূমিকা তার মূল্যায়ন করতে গেলে আরও কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ প্রবণতা আমাদের স্মরণ করে নিতে হবে। এর প্রতিটির অনুষঙ্গেই আমাদের সামনে প্রত্যক্ষ হয়ে উঠবেন এমন এক মনীষা যাঁকে অনুসরণ করতে আমাদের কোনও জড়তা থাকা উচিত নয় বলেই মনে করি।

মূলগতভাবে বাংলা কবিতার একটা রুচিশীল পরিচ্ছন্ন স্বভূমি তৈরীর অভিপ্রায় থেকেই কবিতা পত্রিকার সূচনা হয়েছিল। বছর দশেকের মধ্যেই কিন্তু সম্পাদক বুঝতে পেরেছিলেন ভালো কবিতার একটা অনুভব করা যাচ্ছে। আমরা দেখতে পাচ্ছি, ১৯৪৬-এ সংশয়ী বুদ্ধদেব সম্পাদকীয় প্রতিবেদনে জানাচ্ছেন। "...প্রথম পাঁচ-ছ বছর আমরা যে পরিমাণে ভালো কবিতা পরিবেশন করতে পেরেছি, এখনও কি তা-ই পারছি?" যে কোনো পত্রিকার পক্ষে এটা একটা বড় সমস্যার কথা, আর, পত্রিকা নিয়ে পথ চলতে চলতেই এই সংকটটা টের ডপাওয়া যায়। আর, ঠিক তখনই প্রয়োজন হয়ে পড়ে সময়োচিত বাঁর বদলের। স্বাভাবিকভাবে সঠিক সময়ে বিচক্ষণ সিদ্ধান্তটুকু নেওয়ার ভঅর থাকে সম্পাদকের ওপরই। বুদ্ধদেব বসুও মনে মনে

ভাবছিলেন কবিতা পত্রিকার চরিত্রবদলের। কবিতা প্রকাশের পাশাপাশি কবিতাবিষয়ক নিবন্ধ, আলোচনা প্রকাশ করে পাঠককে একটু বৈচিত্যের স্বাদ দেওয়ার প্রকল্পটি তারই দূরদর্শিতার অভিজ্ঞান। এর অল্প আগে অবশ্য কবিতা পত্রিকার উদ্যোগে দুটি অন্য রকমের কাজ করা হয় সম্ভবত যেগুলির মধ্য দিয়ে কবিতা তার ভাবনা ও চলাচলের পরিসর প্রশস্ততার করতে চেয়েছে। একটা হল, নজরুলের রেকর্ড করা ১৮০০ গানের তালিকা প্রণয়ন– ১৯৪৪- এ প্রকাশিত কবিতার পর-পর দুটি সংখ্যায় এই তালিকা ছাপা হয়, যা নজরুলের গানকে নথিবদ্ধ করার প্রথম প্রচেষ্টা বলেই মনে করা হয়। এর পরের বছর প্রকাশ হয় কবিতার বিশেষ নজরুল সংখ্যা।

কবিতার চরিত্র বদলের লক্ষ্যে অবশ্য তেমন যোগ্য সমর্থন পেলেন না বুদ্ধদেব বসু, এত কবিতা-বিষয়ক প্রবন্ধ আলোচনা লিখবেন কারা? এক্ষেত্রে সম্পাদক বুদধদেবের একমাত্র সহায় হলেন গদ্যশিল্পী বুদ্ধদেব। একের পর এক অনবদ্য রচনায় সমৃদ্ধ হল কবিতা– একজন সার্থক গদ্যকারের প্রতিভা মিশে গিয়ে পূর্ণ করে তুলল একযোগ্য সম্পাদককে।

এরপরে কবিতার আরেক রকমন পরিবর্তন ঘটতে আরম্ভ করল বিদেশী সাহিত্যকে পত্রিকার বিষয়ের মধ্যে অঙ্গীভূত করে নেওয়ার মধ্য দিয়ে। কবিতা পত্রিকার প্রথম সংখ্যাটির একটি সুন্দর সমালোচনা-নিবন্ধ প্রকাশ হয়েছিল টাইমস লিটারেরি সাপ্লিমেন্ট-এ যেটি লিখেছিলেন সমালোচক এডওয়ার্ড টমসন। বিদেশী সাহিত্যের সঙ্গে বুদ্ধদেবের নিবিড় পরিচয় ও যোগাযোগ থাকলেও প্রথম দশ বছর কবিতা পত্রিকার এ নিয়ে কোনো পৃথক বিভাগ ছিল না। একাদশ বর্ষ থেকে নতুন বিভাগ বিদেশি সাহিত্য চালূ হলেও একবছরের মধ্যে তা বদ্ধ করে দেওয়া হয়। নতুনভাবে এই বিষয়ক লেখালেখি প্রকাশ পেতে আরম্ভ করল ১৯৪৮-৪৯ থেকে। শুরু হল কবিতা পত্রিকার লেখালেখি একটা নতুন পর্ব। এরপরে পত্রিকার পাতায় আলোচিত হবেন এলিয়ট, পাউন্ড প্রমুখরা, বৃদ্ধদেব-সহ অনেকের হাতে অনুদিত হবেন বিদেশী কবিরা, প্রকাশ হবে মার্কিন কবিদের নিয়ে বিশেষ সংখ্যা, দ্বিভাষিক সংখ্যা। পাশাপাশি কথাসাহিত্যকদের নিয়েও কবিতা জানাবে তার মুগ্ধতার ভাষ্য–বিভূতিভূষণ বা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বিষয়ক লেখায় সম্পাদক জানান দেবেন কবিতা সত্যিই বদলে নিচ্ছে নিজেকে। সময়ের দাবি মেনে এই পরিবর্তন, যার মধ্যে কোনও আপোষ নেই, যা আছে তা

হল, একটা চেনা ছক ভেঙে ভেঙে বৈচিত্র্যের সন্ধান। এই বিবর্তন ছাড়া কোনও সাহিত্যপত্র বাঁচে কি?

একশ বছরের দূরত্বে দাঁড়িযে যখন আমরা বুদ্ধদেব বসুর মতো একজন সব্যসাচী প্রতিভাবে পূনর্বিচার করতে বসি, আমার ধারণা, তার মধ্যে কিছু কিছু সীমাবদ্ধতা থাকবেই। কারণ কবি বুদ্ধদেব বসু যেমন ভাবে লিখেছেন তার গৌরব যতটাই হোক আজকের কবিরা হাজার চেষ্টা করলেও সেভাবে লিখতে পারবেন না, তেমনভাবে লেখার প্রয়োজনও নেই। কথাটা বুদ্ধদেব বসুর উপন্যাস-গল্প ইত্যাদির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। কিন্তু সম্পদনার ক্ষেত্রে সেটা প্রাসঙ্গিক হয়ে থাকতে পারে এখনও। কবি বুদ্ধদেবকে আজ আর অনুসরণ করা যায় না কিন্তু সম্পাদক বুদ্ধবকে অনুসরণ করা চলে, অনুকরণ করলেও হেমন একটা কিছু আসে যায় না।

বস্তু বুদ্ধদেব বসু সম্পর্কে কবিতা প্রেমী কবি ব্যক্তিত্ব হিসেবে কবিতা পত্রিকা প্রকাশ করেন। কিন্তু পরবর্তীতে এতে অন্যান্য সমালোচনামূলক লেখা অন্তর্ভুক্ত করেন। এতে কবিদের প্রতিষ্ঠায় তার ভূমিকা অবিস্মরণীয়। জীবনানন্দ দাশের প্রকাশের জন্য তিনিই সবত্রে উদ্যোগ নেন। আরো অনেক সাহিত্যিকের ভবিষ্যৎ ভূমি প্রতিক্ষার উদ্যেগ নেন। সফলও হন। বাংলা সাহিত্যের আধুনিকতাবাদী আন্দোলনের অন্যতম মুখমাত্র হিসেবে পরিগণিত করা যায় কবিতা পত্রিকাকে।

ZZxq Aa¨vq

XvKvq m¨vW †Rbv‡ikb, mvÿi I KÉ¯i cfwZ cwÎKvi fwgKv

K) cPvi Av‡›`vjb

L) AvaywbKZvev`x †jLK‡`i gvbmceYZv

XvKvq m¨vW †Rbv‡ikb, mvÿi I KÉ¯i cfwZ cwÎKvi fwgKv

ইউরোপ-আমেরিকার শিল্প-সাহিত্যকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন সময়ে এবং বিশেষত উনিশ-বিশ শতকে নানা মতবাদের উদ্ভব ঘটে বিশ্ব সাহিত্যে নানামুখী দিক-নির্দেশনা দিয়েছে। যেমন- ক্লাসিজেম, রোমান্টিসিজস, ডাডাইজম, ইম্প্রেশননিজম, সুররিয়ালিজম, ফবিজম, কিউবিজম, ফিউচারিজম, এক্সিস্টেশিয়ালিজম, এক্সপ্রেশানিজম, আর্টসফর আর্টস সেক, সিম্বলিজম ইত্যাদি। শিল্পের এক এক ধারাকে অবলম্বন করে এভাবে বিভিন্ন সময়ে এক একটা গোষ্ঠীর উদ্ভব ঘটে সাহিত্য ও শিল্পক্ষেত্রে নানা রূপ, রীতি তথা মতবাদের প্রকাশ ঘটিয়ে ঐশ্চর্যমন্ডিত করে তুলেছে। এসব বিদেশি আন্দোলনের ঢেউ উনবিংশে শতক থেকে দিয়েছে নতুনত্বের স্বাদ, বিশ্বসাহিত্যের পাশাপামি প্রসারিত হবার উজ্জ্বল দিকনির্দেশনা। তেমনি বাংলাদেশ কিছু সাহিত্য পত্রিকা কেন্দ্র করে কিছু মতবাদ ছড়ানো হয়।

mwnZ¨ Av‡›`vjb : evsjv‡`wk

স্যাড জেনারেশন

স্যাড জেনারেশন বাঙলাদেশি একটা সাহিত্যিক-আন্দোলন। ১৯৬৪ সালে জানুয়ারি/ ফেব্রুয়ারিতে ঢাকায় এই আন্দোলন শুরু করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও স্থানীয় কলেজের কয়েকজন ছাত্র-সাহিত্যিক। এর উদ্যোক্ত ও প্রধান ব্যক্তিত্ব ছিলেন কবি রফিক আজাদ এবং friend, philosopher and guide ছিলেন অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবুদ সায়ীদ। আন্দোলনটা মূলত 'হাংরি জেনারেশন গোষ্ঠী-প্রভাবিত তদানিন্তন পূর্ব পাকিস্তানি সংস্করণ। স্যাডগোষ্ঠী ১৯৬৩ সালে তরুণ অধ্যাপক আব্দুল্লাহ আবু পাকিস্তানি সংস্করণ।

স্যাড গোষ্ঠী ১৯৬৩ সালে তরুণ অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদের নেতৃত্বে ও সম্পাদনায় ঢাকাতে প্রাথাবিরোধী সাহিত্য আন্দোলনের লক্ষ্যে বক্তব্য নামে একটা সাময়িক পত্রিকায় তাদের নিজস্ব ভাবনার প্রতিফলন ঘটাতে প্রধানত কবিতাসহ নানা ধরনের লেখা প্রকাশ করতে থাকেন। ইতিমধ্যে কলকাতার হাংরি জেনারেশন এর ঢেউ ঢাকাতে এসে পড়াতে তারই প্রভাবে স্যাড জেনারেশন এর উদ্ভাব। এ বিষয়ে আব্দুল্লাহ আবু সায়ীদ তার আত্মস্মৃতিমূলক গ্রন্থ ভালোবাসার সাম্পান এ উল্লেখ করেছেন, বক্তব্য বেরোবার পর বছর খানেকও ডেপরোলনা, হাংরি জেনারেশনের ঢেউ এসে লাগল আমাদের চত্বরে। সময়মত

বৃষ্টিতে মাঠ আগে থেকেই উর্বর হয়েছিল। বীজ পড়তেই ছোপট্ট চারা হাত-পা ঝাড়া দিয়ে মাথা উচিয়ে দাঁড়াল। বাংলাদেশে ষাটের দশকে তুলকালাম কাণ্ড যা ঘটিয়েছে তা এই স্যাড জেনারেশনের কাবরাই। মাত্র একটি বলেটিন প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৬৪ সনে। এই একটি বুলেটিনেই স্যাড জেনারেশনের কবিরা কবিতাকে নির্দিষ্ট করে দেন তাদের বক্তব্যের মধ্যে। স্যাড জেনারেশনের ম্যানিফান্টো বাংলা কবিতাকে কতটুকু বর্ধিত ও পরিপুষ্ট করেছে সে বক্তব্য না গিয়ে বলা যায় পঞ্চাশ কর্তৃক কবিতার যে আংগিক, ছন্দ, কিংবা কবিতার নান্দনিকতা তখন প্রচলিত ছিল তার থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যই ষাটের কবিরা, নতুন পথ খুজছিলেন। সে সময় অশ্লীলতার অভিযোগে স্যাড জেনারেশনের কবিরা অভিযুক্ত হলো এ্যাংরি হ্যাংরির মতো তা আদালত পর্যন্ত গড়ায়নি।

হাংরি জেনারেশনের বুলেটিনের আদলে বের হল, আমাদের স্যাড জেনারেশন। কে সম্পাদক, কে প্রকাশক, কোনো কিছুরই কোনো হদিস নেই, বেরিয়ে গেল এক ফর্মার মলাটহীন বুলেটিন। চেহারায় গো-বেচারা, কিন্তু ভেতরে শহর-কাপানো এক বিস্ফোরণ। শান্ত ছিমছাম ঢাকা শহর ঘা খেয়ে শুরু করল কটুকাটব্য আর গালিগালাজ। বিশ্ববিদ্যালয়কেন্দ্রিক ছোট্ট ঢাকা শহরটা আলোচনা-সমালোচনা যেন মারমুখো হয়ে উঠল। (পদপাতের শব্দ : ভালোবাসার সাম্পান, পৃষ্ঠা-৮৫)।

প্রথম সংখ্যায় সম্পাদকের নাম উল্লেখ না থাকলেও এই লেখকরা ছিলেন আব্দুল্লাহ আবু সায়ীদ, ইউসুফ পাশা, আসাদ চৌধুরী, শহীদুর রহমান, বুলবুল খান মাহবুব, ফারুক আলমগীর, প্রশান্ত ঘোশষাল ও রফিক আজাদ। এর মধ্যে কবিতা ছিলো দুটো– আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ ও শহীদুল রহমান রচিত। রফিক আজাদ ও প্রশান্ত ঘোষাল ইংরেজিতে লেখেন। রফিক আজাদ রচিত বুলেটিন এর সংক্ষিপ্ত বক্তব্য ছিলো:

THE SAD GENERATION

We don’t know what we are doing. We are really undone, really helpless. We are poisoning us conciously. Yet we are helpless and help[less. We are guilty. We are bearing dynamics in our blood. We

know it But we are helpless, simply undone. We have no other alternative except SELF-DESTRUCTION.

Death is our darling but not those bloodly ladies who are loitering before our eyes.

We have no friends. We are not friendly with others. We have a faithful friend-CIGARETTE.

We hate conventional life. We cannot tolerate the conventional notions of private and public Morality.

Life is meaningless, we are living meaninglessly. We are are constantly living in anxieties. We know the intensity of our anxieties to feel and know that we EXIST, and that this is the root of all our anxieties.

We are, every MOMENT, swimming in the ocean of MENTAL and PHYSICAL agitations for which happiness is foreign to us.

I should warn the headless conventional gentlemen and the bloody crities in this connection that we are not sexdriven youths. We are faithful to ourselves, and to our SADNESS. There should be no dout in it.

We are not Beatniks or Angiruies, remember. We are Bipanna. And that is why we are Sad.

We are, for no time intested in politics and newspapers. Then, what do we want? NOTHING, NOTHING,-We want nothing from our bloody society.

We are exhausted, annoyed, tired and Sad.

স্যাড জেনারেশন সম্পর্কে সেই বুলেটিনে প্রশান্ত ঘোষালের যে বক্তব্য প্রকাশিত হয় তা হলো–

Champabati : A Catharis of Pent-up Passions Champabati, a lady excommunicated by the crul stroke of society for no fault of hers is a boon companion. In her, I recognise a perfect juxtaposition of peace and destruction. Bafique, a sincere friend of mine, remains always depressed in this are of reason, what with insecurity and what with hell-fire of the earth. And I, a middleman between the two, with my decieteful existence, am in a mysterious process of decay. The question of DEATH, MIND, SEX, FATE, DECADENCE, DISEASE, HEART, LOVELINESS, MONEY is common to us and haunts, in every step. We know our destiny (Champabati, do you know?) but our destination is unknown and unknowable. Oh God! Will you behead us! Ah! Debauchery, how helpless we are! Love: the so called begus prejudice. Women (except) Champa-bati), Foxy and SEXY, do not know the meaning of life. Rafique, don't pay attentions to a lady. We (Rafique and I Swear, Champabati, the only truth, beauty is to us.

[Sad Generation : Vol. 1. 1964.]

স্যাড জেনারেশনের কবিরা সব কিছুর মধ্যেই দেখতেন অন্ধকার। তাদের কাছে জীবন অর্থহীন। প্রথাবদ্ধ জীবনে তাঁদের অনীহা, বি তাদের অনাস্থা এবং এরা রাজনীতিবিমুখ। এই করে তারা কিছুই চান না, সিগারেট তাদের নিত্য সংগী। কিছুতেই তাদের উন্নসিকতা, যৌনতা প্রধান সংগী, কিন্তু প্রকৃতির সংগে তা সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। স্যাড জেনারেশনের কোনো এক কবি বলে ওঠেন:

থোড়াই কেয়ার থু : অভ্যস্ত জীবনে

বিপন্ন বৃশ্চিক আমি আত্মার গরলে।

ড. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী আবদুল্লাহ আবু সায়ীদকে স্যাড জেনারেশন গোষ্ঠীর পালের গোদা বলে অভিহিত করেন, আর আব্দুল্লাহ আবু সায়ীদের মতে, রফিক আজাদই এর প্রাণ-পুরুষ।

স্যাড এর তরুণ কবিরা সেই ষাটের দশকের গোড়াতেই কতোটা বেপরোয়া ছিলেন-তার কিঞ্চিত নমুনা:

শহীদুল রহমান : একজন মেয়ের স্তন আর পাছা থেকে ঝরে চুইং গামের মতো মিষ্টি গন্ধ।

ইউসুফ পাশা : কুকুরের উত্তেজনা তিনশত অশ্বশক্তি এক সাথে কাজ করে রক্ত কণিকায়।

বুলবুল খান মাহবুবু : অভিজাত রমণীর সুচ্যগ্র স্তন আমাদে বিদ্ধ করে।

ষাট দশকের গোড়ার দিকে হাংরি জেনারেশন ছোট কাগজ এর মাধ্যমে এক নতুন বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনার চেষ্টা করে। প্রতিষ্ঠানবিরোধী এই আন্দোরন তৎকালীন সময়ে সাহিত্যের প্রথাগত থমকে দাড়িয়ে থাকা জড়তকে ভাঙার চেষ্টা করে। ১৯৬৪ সালে প্রকাশিত স্যাড জেনারেশন বুলেটিনে বলা হয়, æWe don't know what are doning. We are really undone, really helpless. We are poisoning us consciously. Yet we are helpless and helpless. We are guilty. We bearing dynamites in our blood. We know it. But we are helpless, simplyundone. We have no other alternative except self destruction আপাত: এই কথাগুলোর মধ্যে প্রচন্ড ক্ষোভ এবং হতাশার সুর বেজে উঠলেও এই স্যাড জেনারেশন ছোট কাগজের মাধ্যমে এক সামাজিক আন্দোলনের গড়ে তুলতে সমর্থ হয়। কিন্তু বলেন সাহিত্যে তাঁদের এই প্রথাবিরোধী আন্দোলন বেশি দিন টেকেনি বেপরোয়া কর্মকাণ্ড ও রুচিবিগর্হিত রচনার জন্যে। হাংরিদের মতো তাঁরা পাঠক সমাজকে আলোড়িত করতে পারেননি। তবে তৎকালীন ঢাকার বুদ্ধিজীবী সমাজে তাঁর বেশ উপহাসের পাত্র হয়েছিলেন। হাংরিদের দ্বারা প্রভাবতি হলেও স্যাড গোষ্ঠী হ্যাংরিদের মতো পরিচয়ের দিগন্ত প্রসারিত করতে পারেননি।

সাহিত্য পত্রিকা আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ সম্পাদিত কণ্ঠস্বর আমরা যেন সেই উত্তাপটিই গভীলভাবে অনুভব করি। কণ্ঠস্বর এর ঘোষণা ছিল, "যারা সাহিত্যের ঘনিষ্ঠ প্রেমিক, যারা শিল্পে উন্মোচিত, সৎ, অকপট, রক্তাক্ত, শব্দতাড়িত, যন্ত্রনাকাতর, যারা উন্মাদ, অপচয়ী, বিকারগ্রস্থ, যারা পঙ্গু, অহংকারী, যৌনতাস্পর্শ্ঠ কণ্ঠসবর তাদের পত্রিকা। প্রবীনে মোড়ল, নবীন অধ্যঅপক, পেশাদার লেখক, মুর্খ সাংবাদিক, পবিত্র সাহিত্যিক এবং গৃহপালিত সমালোচক এই পত্রিকায় আনাহূত। ৬০ এর প্রথম উল্লেখযোগ্য লিটল ম্যাগাজিন সপ্তক ১৯৬২-তে বেরোয়। এই পত্রিকায় এমন এক-গুচ্ছ লেখক জড়ো হয়েছিলেন, যারা গল্পে ও কবিতায়, বিশেষত গল্পে, নতুন এক সুরের সন্ধান করেছিলেন–এমন সুর যা ৬০ এর সুর স্বর-স্বনন থেকে আলাদা গ্রামে বাজে। কিন্তু যে-তীব্রতা, প্রতিবাদী চেতনা, পবিত্র রাগ ছিলোনা সপ্তক-এর-তা ফুটে বেরোলো পরের বছর। ১৯৬৩ সালে, পর-পর প্রকাশিত একটি পত্রালিতে : বক্তব্য, স্যাড জেনারেশন, যুগপৎ, স্বাক্ষর, প্রভৃতিতে। বক্তব্যের জ্বলজ্বলে ঘোষণা থেকে একটি অংশ উদ্ধৃত করছি, এক-হিশেবে যা পরবর্তী সমস্ত তারুণ্যের একটি জন্তুনিভ শিখার মতো উজ্জ্বলন্ত:

দলটা তাদের-সেইসব অগতানুগতিক অসন্তুষ্ট রাগী তরুণদের, অন্তঃসত্ত্বা রক্তে যাদের নতুন সৃষ্টির আগ্রহ উদগ্রীব। এখানকার সাহিত্যের, সমাজের ভানসর্বস্ব অযোগ্য মোড়লদের প্রতি তাদের ঘৃনা, ক্ষোভ, আক্রাশ; যার ফলশ্রুতি হিসেবে এ সাহিত্যের ঘেয়ো, অথর্ব নিজীবদের বয়স্ক প্রভাব থেকে মুক্তিতে তারা কৃতশপথ–তারা একত্রিত সমবেত, আয়োজিত। উদ্দেশ্য তাদের নতুন কিছু, বিস্ময়কর কিছু, অন্তত উপেক্ষিত হাস্যকর কিছু, অসামাজিক, অশ্লীল, গর্হিত কিছু, কিন্তু কিছু নতুন, কিছু অভাবনীয়। কালের বুকের ওপর নুতন স্বাক্ষরের বেগবান চিন্তায় তারা আস্বস্ত-যে-স্বাক্ষর স্পষ্ট, গভীর, স্থায়ী,–এমনকি সাময়িক ও স্বল্পায়ু হলেও সজীব ও স্বাস্থ্যবান।

স্পষ্ট ও দীপ্রভাবেই রচিত হলো নতুন সাহিত্যের প্রবেশক। হাট করে খুলে গেলো দরোজা : পুরোনার প্রতি অসন্তোষ এবং ঘুণা, ক্ষোভ, আক্রোশ পরিব্যক্ত হলো, ঠিক এবারে ফাল।গুনে যেমন পুরোনো পাতা ঝরে পড়েছে তরুণদের পায়ের নিচে তেমনি মড়িয়ে গেলো জীর্ণ ও নিজীব প্রাক্তন, প্রথম শিশুর কাছে বর্ণমালা যেমন তেমনি পৃথিবীকে নুতন চোখে দেবার

বাসনা নিয়ে একদল তরুণ প্রবেশ করলো সাহিত্যে, একগুচ্ছ তরুণ তুরকি, সপ্তদশ অশ্বারোহী। স্পষ্টতর ভাস্কর্য নির্মিত হলো 'স্বাক্ষর'-এর প্রথম সংখ্যার বিঘোষণায়:

এ কথা বিনা দ্বিধায় বলা যায় যে, পূর্ব বাংলার সাহিত্যের এই ক্রান্তিকালে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার মতো দুঃসাহসিক পত্র-পত্রিকা একটিও নেই। যা-ও দু-চারটি সাহিত্য-পত্রিকা আছে, তাদে তথাকথিত প্রতিষ্ঠিত মোঢ়লদেরই আধিপত্য। সেখানে তরুণতম অথচ নিরীক্ষণশীলদের প্রবেশাধিকার নেই। এই সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতেই তরুণতম নিরীক্ষণ শীলদের মুখপত্র স্বাক্ষর-এর আত্মপ্রকাশ।

স্বাক্ষর-ই এদেশের প্রথম প্রকৃত লিটল ম্যাগাজিন, যা শিবের মতো এক-হাতে ধ্বংস আর-এক-হাতে সৃষ্টি করেছিলো। বক্তব্যে, যুগপৎ এ স্যাড জেনারেশন ছিলো কেবল ধ্বংস ঘোষণা, পুরোনোয় ফাটল ধরানো, সেই ধ্বংসিত জমির উপর নতুন শহর বসালো স্বাক্ষর। এদিক-ওদিক বিক্ষিপ্ত ও এলোমেলো হয়ে ছিলো যে-তরুণ কবিরা, স্বাক্ষর তাদের একটি শিবির পূঞ্জীভূত করলো। দেখা গেলো : নতুনের আকুতি এদের কণ্ঠে দেখা গেলো : এদের কবিতা এদেশের পুরোনো কবিতার সঙ্গে খাপে-খাপে মিলে যাচ্ছে না। যথারীতি এদের জুটলো তিরস্কার ও প্রত্যাখ্যান, বিদ্রুপ ও বাঁকা-হাসি, বদমাশ-হাসি, প্রকাশ্যেই গোপন-হাসি: বিশ্ববিদ্যালয়ের আপাত-প্রগতিবাদী-পরিণাম-রক্ষণশীল অধ্যাপক ছদ্মনামে এদের আক্রমণ করে সম্মানিত করলেন ; অগ্রজ কবি এদের নিয়ে লিখলেন ট্যারা ব্যঙ্গকবিতা; সমসাময়িক কোনো-কোনো পত্রিকা কোমর বেধে পিছু লাগলো। আর, চিরকাল যা হয়, তরুণতম পাঠকরাই চিনে নিলো তরুণতম এই বাঁশিবাদকদের। বিস্ময়কর এই, যে এরাই বরং পূর্বসূরীদের দাবি যেখানে প্রকৃত, সেখানে তাদের শ্রদ্ধা জানিয়েছে নিষ্কুণ্ঠভাবে, এবং তখনই ঘটেছে প্রকৃত শনাক্তিকরণ, মৌলিক হাসের সঙ্গে দেখা।

সাম্প্রতিক-এ স্বাক্ষর-এরই কেউ-কেউ জড়ো হয়েছিলো, কিন্তু এই পত্রিকার ভূমিকা ছিলো সম্পূর্ণ আলাদা। স্বাক্ষর ছিলো কবিতাকেন্দ্রী, সাম্প্রতিক পূর্ণাঙ্গ সাহিত্যপত্র। তাহলেও তার সওগাত ছিলো মুখ্যত গদ্যের, তার রক্তে ছিলো সেই তেজ জোশ, দীপ্তি যা তার পিছন মলাটে লিখিয়ে নিয়েছিলো: শিল্পসাহিত্যকলা মাধ্যমে মাধ্যমে কম্পমান অগ্রসরমান। তরঙ্গভঙ্গে উপস্থিত হয়েছেন এ বাংলার বিধমী লেখকরা। বিধমী লেখকেরা–এই শব্দবন্ধের নিচে আমি

দাগ টেনে দিতে চাই। সাম্প্রতিকের প্রথম প্রবন্ধ, বস্তুতপক্ষে, নতুন কথাসাহিত্য বিষয়ক একটি প্রগাঢ় প্রস্তাব: তার চারটি অবিনয় প্রস্তাব এরকম:

১. শিল্পের পণ্ডিতের মুখে চাঁটি মারো,

২. যাও পশ্চিমে যাও

৩. কলকাতার দিকে তাকিয়ো না–আত্মার দিকে এবং চলো চাই পরোক্ষে। বলা হলো:

নব্য কথাকেরা পাঠকের মুখে তো চাঁটি মারবেই, বিশেসত পণ্ডিতের মুখমণ্ডল তাদের লক্ষ্যস্থল। যে-কোনো চেতনশীল লেখককে সময় এই কথাটি ভাবিয়েছে, যে, শিল্পকলার অন্যান্য বিভাগ, যেমন চিত্রকলা, কি ভাস্কর্য, কি সংগীত, ইত্যাদি, যখন বাঁকা প্রকাশকে অবলম্বন করেছে, সাহিত্য কেন পুরোনো চালে যাতায়াত করবে? চাই নুতন প্রকাশরীতি, অগোচর মনোবিন্যাসের উন্মোচন, চাই প্রথম জানোয়ারশোভন চীৎকার। কতকগুলি অক্ষরের ক্রীতদাস হয়ে এবং কতগুলি অতিব্যবহৃত প্রকারণের সেবায় নিযুক্ত করবো কেন নিজেকে? গল্প লিখতে গিয়ে আমরা এখন কবিতা বা সেবায় নিযুক্ত করবো কেন নিজেকে? গল্প লিখতে গিয়ে আমরা এখন কবিতা বা প্রবন্ধ লিখবো স্বেচ্ছাকৃত ভুলে। উপন্যাস লিখতে গিয়ে আদি প্রাচীন রচনাসম বিশ্বব্যাপার স্বেচ্ছাকৃত বুলে। জীবনকে আমরা বিভক্তি করবোনা, জীবনে আমরা জীবনের মতো উপস্থাপিত করবো, নিজেকে উৎসারণ করবো জীবনের পাত্রে দুঃখের মতো সংলগ্ন হয়ে।

সাম্প্রতিক অবশ্য স্থায়ী হলো না, একটি সংখ্যাতেই অবসিত হলো। উত্তরকালে নতুন সম্পাদনায় যখন সে বেরুলো আবার, তখন তার তেজ ঝরে গেছে, দার্ঢ্য হালিয়েছে।

প্রতিধ্বনি-র দুটি সংখ্যা, কালবেলার তিনটি সংখ্যা, আসন্নর একটি সংখ্যা এই নতুন সাহিত্যকে কোল দিলো সর্বান্ত:করণে।

ছোটোগল্পে এককভাবে মনোনিবেশ করেছিলো তিনটি পত্রিকা: মধ্য-ষাটে প্রকাশিত ছোটগল্প ও শ্রাবন্তী এবং উপান্ত-ষাটে প্রকাশিত সূচীপত্র। উল্কা, স্বরগ্রাম ও সুন্দরম পত্রিকাগুলি ছোটোগল্পের বিশেষ সংখ্যা বের করেছিলো। এর মধ্যে ছোটগল্প পত্রিকাটিই ব্যাপকতম কাজ করেছে তার প্রকাশিত ষোলোটি সংখ্যায়। এই পত্রিকা প্রকাশের কিছুকাল আগের এর উদ্যোক্তাদের হাতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ছোটগল্প সমিতি। এই সমিতিরই প্রথম সংকলন

হিশেবে ছোটগল্প পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়। শুধু ছোটো গল্পের জন্য নির্দিষ্ট পত্রিকা এদেছে এই প্রথম। সেই প্রথম সংকলনে একটি ঘোষণাপত্র মুদ্রিত হয়েছিলো। ঘোষণাটি এই :

কাব্যভারাক্রান্ত বা কষ্টার্জিত শব্দমণ্ডলীর আপাতমধুর বিভ্রান্তিতে যারা আচ্ছন্ন নয়–নিরীক্ষামূলক আধুনিক গল্প বলতে যারা ঋজু, তীক্ষ্ণ অথচ সৎ এবং জীবননিষ্ঠ গল্প বোঝেন–ছোটগল্প মূলত তাঁদের পত্রিকা।

দেশের সাম্প্রতিক শিল্পচিন্তার বিশ্বস্ততম প্রতিনিধি সেইসব তরুণ গল্পকারদের অন্ত:সত্ত্বা প্রচেষ্টাকে আমরা আনন্দে, গৌরবে ও মধুর উৎকণ্ঠায় তুলে ধরতে সর্বদা আগ্রহী।

সুতরাং গল্প লিখুন। যে-গল্প অনাবশ্যক বাগ্মিতা বা অপ্রয়োজনীয় শব্দসম্ভারে ভারাক্রান্ত নয়। যে-গল্প চিন্তার প্রতিটি স্তরে সমান আবেদনময়। গল্পকে কবিতার আক্রমণ থেকে রক্ষা করুন এবং জীবনের কাছাকাছি ফিরে আসতে দিন।

দ্বিতীয় সংকলনে প্রকাশকের আলেখনে ছোটগল্প প্রসঙ্গে শিরোনামে বলা হয়েছিলো :

প্রায় দুবছর আগে আমরা ছোটগল্প সমিতির প্রতিষ্ঠা করেছিলাম এ উদ্দেশ্য নিয়ে যে, ছোটগল্প চর্চার মধ্য দিয়েই আমরা জীবনের গভীর মর্মবাণীকে ফুটিয়ে তুলবো। এরই জন্য আমরা এদেমের সাম্প্রতিক শিল্পচিন্তার বিশ্বস্ততম প্রতিনিধি আমাদের তরুণতম গল্পকারদের সমবায়ে একটি গল্প-আন্দোলনের সূত্রপাত করার বাসনা পোষণ করছি। এ বাপার পুরো সাফল্য অর্জিত হবে–এমন দৃষ্ট উক্তি আমরা এ মহূর্তে করতে হয়তো পারি না। কিন্তু আমাদের হৃদয়, মনন, দৃষ্টিভঙ্গি যে কি বিপুল সম্ভাবনায় আন্ত:সত্ত্বা-আমাদের বিনীত প্রচেষ্টার সর্বাঙ্গে তার পরিচিতি অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বিরাজমান।

ছোটগল্প পত্রিকা আর কথিত আদর্শে সব-সময় সংবদ্ধ থাকতে পারেনি বটে, তার কারণ হয়তো আমাদের পরিপার্শ্ব, আর কোনো গল্পপত্রিকা ছিলো না বলেই হয়তো তাকে বহু বিভিন্ন দিক ও দৃষ্টিকে আশ্রয় দিতে হয়েছিলো। (এই পরিপার্শ্ব শেষে কণ্ঠস্বরকেও গিয়েছিলো অবশ্য, কণ্ঠস্বরকেও লিটল ম্যঅগাজিনের প্রকৃত চারিত্রে হারিয়ে শেষাবধি মুখপত্র হতে হয়েছিলো তারও তারুণ্যের–কেননা আর কোনো পত্রপল্লব বিকশিত হয়নি, কাজেই তার উপর মহাভার এসে পড়েছিলো)। –গল্প-পত্রিকা শ্রাবন্তীর ঘোষণাপত্রটি ছিলো তীব্রতর:

পৃথিবীর সর্বদেশ সর্বকালের সাহিত্যের উদ্দেশ্যই গণজীবনের বাস্তবালেখ্য।

সাহিত্য আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থা নয়–সাহিত্য জীবনের প্রতি হতাশার কালো অন্ধকার নয়–জীবনের প্রতি বিশ্বাস আশা আর ভালোবাসার গভীর বাস্তবতাই সাহিত্য। সাহিত্য জীবনের প্রতিচ্ছবি।

সাহিত্যকর্মের দৃষ্টান্তস্বরূপ লিটল ম্যাগাজিনের পশ্চাতে কিংবা অগ্রভাগে তরুণ সাহিত্যকদের আহ্বানই একমাত্র জীবনস্পর্শী পথ-তরুণ সাহিত্যের প্রতিই আমাদের চিরন্তন অভিলায়। আর শুধু আমাদেরই নয়–পৃথিবীর সর্বদেশের লিটল ম্যাগাজিনেরই তা হওয়া উচিত এবং তাই আছে।..

তাই তরুণ সাহিত্যিকদের লেখা প্রকাশ করার পক্ষেই আমাদের শেষ সিদ্ধান্ত।...

সাহিত্যের যে-শাখা সবচেয়ে গণমানুষের জীবনালেখ্য হয়ে ধরে পড়ে লোকায়তভাবে-তা হলো গল্পসাহিত্য। গল্পসাহিত্য লোকায়ত মানুষের চিত্রায়ন। আর আমরাও সেই গল্পসাহিত্যের চিত্রঅয়ন চাচ্ছি। ... সবার উপরে যে কথা সত্য, তা হলো শিল্পের খাতিরে জীবন নয়-জীবনের খাতিরেই শিল্প–এবং সেই শিল্পসাহিত্য চিরায়ত; আর সেই জীবনবোধের শিল্পসাহিত্যেই আমাদের এ কর্মের লক্ষ্য–জীবনবিমুখ শিল্পসাহিত্য আমাদের কাম্য নয়।

সূচীপত্র তার প্রকাশিত তিনটি সংখ্যায় ৬০-এর কিছু নতুন-পুরোনো গল্পকথাকে উপস্থিত করেছিলো। এর প্রথম সংখ্যার প্রথম রচনাটি (১৯/চৈতন্যহীন জাগরণ/ইশতেহার/৭০) ঘোষণাধর্মী, গল্পসাংক্রান্ত না-হলেও তেজি ও নতুন চিন্তার বীজ-লেখা হিসেবে এর প্রথম ও শেষ অংশ থেকে খানিকটা উদ্ধৃত করছি:

যদ্দিন আমাদের ভবিষ্যত ছিল বাঁধাধরা ফ্রেমের মধ্যে, যদ্দিন আমাদের কাম্য কিছু প্রতিপাদ্য ছিল, সুখ ছিল, ধর্ম ছিল, যৌন-নিয়ম ছিল; তদ্দিন আমাদের সাহিত্যে একটি ব্যাকরণের নিয়মের দরকার ছিল। এখন আর নেই তা।

ভবিষ্যত/জীবন/প্রতিবাদ্য/উদ্দেশ্য–এ সবের মানে হচ্ছে একটি ফ্রেমের মধ্যে ফ্রেমবহির্ভূত জাগরণকে চৈতন্যায়িত করা।

কিন্তু যে ফ্রেম/যে কার্যকারণ/যে প্যাটার্ণের মধ্যে আমরা চৈতন্যাতীত জাগরণকে চৈতন্যায়িত করতে চেয়েছি সম্প্রতি সে সবের অসারতা/অব্যবহার্যতা/তূরীয় অর্থহীনতা প্রমাণিত হয়েছে।....

উনিশশো সত্তর থেকে আমাদের এদেশে এক অপ্রকাশ্য পালাবদল শুরু হয়েছে। কালচার / রাজনীতি / ভাষা-প্যাটার্ণের অন্তর্গত ভুলচুক শোধরানো হবে দ্রুত। সবার আগে নির্মাণ করতে হবে সেই ভাষা-প্যাটার্ণ যার মধ্যে চৈতন্য নেই কিন্তু চৈতন্যহীন জাগরণ আছে। লী হফল আর এডওয়ার্ড স্যাপীরের সেই সত্যকথনগুলো মনে পড়ছে যার ভেতর থেকে এ তীব্রশ্লোগান বেরিয়ে আসে–তেমনি তোমার। ভাষার প্যাটার্ণ ও অভ্যাসগুলো বদলে ফেলো তোমার রাষ্ট্র/কালচার/চৈতন্যও বদলে যাবে। অতএব আপাতত দায়িত্ব বর্তালো ভাষাব্যবসায়ীদের ওপর।

'কণ্ঠস্বর' ঠিক ১৯৬৫ সালে-যথাযথ মধ্য-ষাটে-প্রকাশিত, নিঃসন্দেহে ষাটের দশকের লিটল ম্যাগাজিন-নিচয়ের মধ্যমণি ও প্রধান কণ্ঠস্বর। কণ্ঠস্বর-এর বীজ রোপিত হয়েছিলো স্বাক্ষর-এর কালেই। স্মপ্রতিক এর প্রথম সংখ্যায় একটি বিজ্ঞাপন ছিলো এরকম : স্বাক্ষর পরবর্তী সময়ে / যে সব বিচিত্র সমন্বয়ে প্রকাশ পাবে / তৈমাসিক কবিতা পত্রিকা / কণ্ঠস্বর / ত্রৈমাসিক গল্পপত্রিকা / শব্দরূপ / তৈমাসিক প্রবন্ধপত্রিকা / সূচীপত্র / মাসিক সমালোচনা পত্রিকা। বক্তব্য/স্বাক্ষর প্রকাশনা। কণ্ঠস্বর-এর কারণেই ৬০-এর ছিন্নবিচ্ছিন্ন লিটল ম্যঅগাজিনগুলি একটি সুরেখ ও গুরুত্ব-ভরা তাৎপর্য খুজে পায়–তা না হলে হয়তো কোনো মূল সূত্রের অভাববে এদেমের সাহিত্যেরই প্রধাণ ধারাপ্রবাহের সঙ্গে মিলিমিশে গিয়ে লুপ্ত হয়ে যেতো মেষমেষ কি শুধুমাত্র ব্যক্তিগত সাফল্য-বৈফল্যের ম্যাগাজিনসমূহের তথা ৬০ এর নবোদ্ভুত সাহিত্যের সূত্রধাল। কণ্ঠস্বর পূর্ণাঙ্গ সাহিত্যেরপত্র হিসেবে মোহানার মতো তার নিজের পৃষ্ঠায় আহ্বান করে নিয়েছিলো তার পূর্বাজ লিটল প্রতি শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেলেছিলো সে-ও ভালোবাসা জানিয়েছিলো নতুন ও আসন্ন সাহিত্যের সকাশে, সেই প্রেম ও ঘৃনার রূপায়ণ দেখি তার প্রথম সংখ্যার ঘোষণায়:

যারা সাহিত্যের সনিষ্ঠ প্রেমিক, যারা শিল্পে উন্মোচিত, সৎ, অকপট, রক্তাক্ত, শব্দতাড়িত, যন্ত্রণাকাতর; যারা অসন্তুষ্ট, বিবরবাসী: যারা তরুণ, প্রতিবাবান, তাদের পত্রিকা। প্রবীণ মোড়ল নবীন অধ্যাপক, পেশাদার লেখক, মূর্খ সাংবাদিক, পবিত্র সাহিত্যিক এবং গৃহপালিত সমালোচক এই পত্রিকায় অনাহুত।

পূর্বজ নতুন ধারাগুলিকে কণ্ঠস্বর শুধু সংহত ও সমৃদ্ধ করেনি, নিজেও আবিষ্কার করেছে, বহু কণ্ঠ ও স্বর। দ্বিতীয় সংখ্যায় ছিলো এরকম আহ্বান করা হচ্ছে।

কণ্ঠস্বর কেবল নতুন দৃষ্টিভঙ্গিকে আহ্বান করে। যে উক্তি উচ্চারিত হয়ে গেছে বা ব্যবহৃত হয়েছে যে স্বর, তার ঘেয়ো পুনরাবৃত্তি এ পত্রিকায় অচল।

নতুন সাহিত্যের গভীরতর এলাকা সফল করবার বৃত্তান্ত পাওয়া যাবে তৃতীয় সংখ্যার ঘোষণায়, বোঝা যাবে এখান থেকে জল গভীর হতে শুরু করেছে:

সাহিত্যিকে যারা অনুভব করতে চান শততলে, শতপথে, বিঘ্নিত রাস্তায় : আঙ্গিকের জটিলাক্ষরে, চিন্তার বিচিত্র সরণীতে; কটু স্বাদে ও লোনা আঘ্রাণে; সততায়, শ্রদ্ধায়, বিস্ময়ে, অভিভূতিতে ও পাপে; মহত্বে ও রিরংসায়, উৎকণ্ঠায় ও আলিঙ্গনে, কণ্ঠস্বর সেইসব পদপাতবিরল তরুণদের পত্রিকা।

পূর্ণাঙ্গ সাহিত্যপত্র, অথচ কেবল তরুণদের, প্রতিশ্রুতিশীল তরুণদের; এর ফলে তৎকালীন তরুণেরা একটি নিজস্ব জায়গা পেয়ে গিয়েছিলো, পেয়েছিলো নতুনের উল্লাস–মৌলিক উচ্চারনের সাহস-স্বেচ্ছাচারিতার অবাধ ক্ষেত্র। প্রতিষ্ঠিত ও প্রাতিষ্ঠানিক পত্রিকায় যে-বাধা রাস্তা তাতে নুতুন কিছু করা অসম্ভব, কণ্ঠস্বর যথেচ্ছাচারের দুয়ার নতুনদের জন্যে অবাধ কুলে দিয়েছিলো বলেই ৬০-এর কবিতায় ও কথকতায় ও গদ্যরচনায় পেলাম কোনো-কোনো মৌলিক কণ্ঠ এবং সমগ্রভাবে ৬০-এর এক নবীয়ান সাহিত্য। চলতে-চলতে ১৯৭৫২-এ কণ্ঠস্বর-এর সম্পাদকীয় যখন ঘোষণা করে:

জাতীয় চৈতন্যের এই সার্বিক উজ্জীবনের মাঝখানে কণ্ঠস্বর-এর এযাবৎ কালের চরিত্রের যে কিছু পরিবর্তন ঘটবে, এমন আশা অসঙ্গত নয়। গত এক দশকের তরুণ সাহিত্য অর্থহীন আপাতরম্যের যে বর্ণিল অন্ত:সারহীন আরাধনায় মুখর ছিল কণ্ঠস্বর-এর পৃষ্ঠা তার একটি প্রধান অংশকে উপস্থাপিত করেছে। যে তারুণ্য নতুনত্ব, প্রতিভা ও আপোষহীন সত্যপ্রীতি গত দশকের তরুণ সাহিত্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হিসেবে দেখা দিয়েছিল, আজ তার সঙ্গে সংহত চারিত্রশক্তি এবং দুরুহের পিপাসা এসে যোগ দিচ্ছে মনে হয়। এর ফলশ্রুতি কণ্ঠস্বরের পৃষ্ঠায় দুর্লক্ষ্য হবার কথা নয়।

তখন বোঝা যায় কণ্ঠস্বর দেশের একটি কোন থেকে যে-কাজ করে যাচ্ছিলো, এখন আর তা নেই : কণ্ঠস্বর ইতিমধ্যেই প্রধান পত্রিকা হয়ে উঠেছে এদের, কিংবা তার আকাঙ্ক্ষী এই স্ববিরোধই কণ্ঠস্বরকে যেমন লিটল ম্যাগাজিন থেকে শেষাবাধি ভ্রষ্ট করেছে–তেমনি তার পতনকেও করেছে দ্রুতগামী। যখন কেবল তারুণ্যের বিশিষ্টতার দ্যেতক না হয়ে তাবৎ তারুণ্যের মুখপাত্র হয়ে উঠতে চাইলো কণ্ঠস্বর এমনকি নামতে চাইলো তার এককালের আরোধ্যের সম্পূর্ণ বিরোধী ভূমিকায় তখন পরিস্কার হয়ে গেলো কণ্ঠস্বর লিটল ম্যাগাজিন নেই আর, উদারতার ছদ্মবেশে এক অন্তর্গত স্ববিরোধ ভারসাম্যচ্যুত করে দিলো তাকে। পত্রিকা সচল রাখতে হয়তো এর প্রয়োজন ছিলো, কিন্তু কণ্ঠস্বর-এর সূচনামূহূর্ত থেকে এর দূরত্ব হয়তো বড়ো বেশি। তবু, তার সব স্থলন-পতন-ত্রুটি নিয়েও, কণ্ঠস্বর-ই ৬০-এর শ্রেষ্ঠ লিটর ম্যাগাজিন, এবং তার প্রভাবে অন্যান্য বহু লিটল ম্যাগাজিন উদ্বোধিত, বিলোড়িত ও চরিতার্থ হয়। ভগীরথের মতো সে একদিন ডাক দিয়েছিলো এদেশের তরুণ সাহিত্যের প্রাণধারাকে– এই তথ্য কোনোদিন বিস্মৃত হবার মতো নয়।

মোটকথা, বিশ শতকের ষাট- দশক থেকে আশি– দশক পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যে বিশেষত বাংরা কবিতার ক্ষেত্রে প্রথাবিরোধী আন্দোলন চলতে থাকে। আর এসব আন্দোলনের ক্লেদ্র বিন্দু ছিলো মূলত কলকাতা শহর।

হাংরি জেনারেশন ও থার্ড লিটারেচর দীর্ঘদিন ধরে চালু চিলো। একমাত্র হাংরি জেনারেশন ছাড়া অন্যান্যরা তেমন প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। হাংবিদের নিয়ে দেশে বিদেশে বেশ আলোচনা ও সমালোচনা হয়, বিদেশি ও অন্যান্য ভারতীয় ভাষায়ও তাঁদের ওপর আলোচনা হয়। হিন্দি সাহিত্যে হাংরিদের কিছুটা প্রভাবের তাদের বিরুদ্ধে মামলা-এই আন্দোলকে পাঠক-বিমুখ করে তোলে। তাছাড়া শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের মতো শক্তিমান নেতা-কবির পৃষ্ঠ-প্রদর্শন এবং প্রকৃত প্রতিভাবনের অভাবে এই আন্দোলনের সমাপ্তি ঘটে।

m¨vW

৬০ এর দশকে পাশ্চাত্যের বিটনিক আন্দোলনের স্বাভানুকারী কলকাতায় ১৯৬১ থেকে ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত হাংরি আন্দোলন করা হয়। এতে নাম উঠে আসে মলয় রায় চৌধুরী, শক্তি চট্টোপাধায় প্রমুখ শিল্প সাহিত্যেকদের নাম, হাংরিদের মধ্যে ঔপনিবেশকতা আশ্রিত কলাকৈবল্যবাদ ও দ্বিমুখী

বৈপরীতাবোধ হাংরি আন্দোলনে যুক্তকারী লেখকগণ এই মানদণ্ডগুলো আদৌ মেনে নেয়নি। তাদের প্রয়োগ দেখিয়েছিলেন নিজেদের কাব্য কবিতায়। এ আন্দোলনের আরেকটি দিক হল সাহিত্যের ম্যাগাজিনের অত্যাধিক বিস্ফোরণ। হাংরির ইশতেহার প্রকাশিত হলে দেখা যায়, তারা কবিতার ক্ষেত্রে ভিন্ন পথের পথিক এবং অসহিষ্ণু আচরণে প্রকাশে উচ্চকিত। এদের প্রভাবেই 'স্বাক্ষর' ও 'কণ্ঠস্থ' ও অন্যান্য সাহিত্য পত্রিকার মাধ্যমে হাংরিদের আদর্শ ও মতবাদ প্রচারিত হতে থাকে।

ঢাকায় তো এই আন্দোলনের একই নাম দেয়া যায় না। তাই ঢাকায় হাংরি আন্দোলনের অনুসারীরা নাম দিয়েছিলেন 'স্যাড জেনারেশন'। এরকম হুজুগের বশে ঢাকা স্যাড জেনারেশনের অনুসারীগণ পশ্চিমবঙ্গে হাংরি আন্দোলনের অনুসরণ করেছিল। এক্ষেত্রে মলয় রায় চৌধুরী বলেন, "স্যাড জোনরেশন জানতেন না যে কেন প্রথমদিকের বুলেটিনগুলো ইংরেজিতে প্রকাশ করেছিলাম। ফলে তারাও আন্দোলন আরম্ভ করেছিলেন ইংরেজিতে ইশতেহার প্রকাশ করার মাধ্যমে "ইন্টারনেট শিল্পের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা কবিতা রচনার প্রথম শর্ত প্রবন্ধ থেকে।

মাহমুদ কামাল তাঁর এক প্রবন্ধে বলেন, বাংলাদেশের স্যাড জেনারেশনের কবিরা সবকিছুর মধ্যে দেখতেন অন্ধকার। তাদের কাছে জীবন অর্থহীন প্রথাবদ্ধ জীবনে তাদের অনীহা, বিবর্ণ মরালিটিতে তাদের এবং এরা রাজনীতি বিমুখ। (লিছল ম্যাগজিন, তারুণ্যের সূত্র।)

পাশ্চোত্যের বিট জেনারেশনের আদলে পশ্চিমবঙ্গে একদল ক্ষুৎকাদের কবি হাতরিজেনারেশনের তত্ত্বের ছায়ায় সংগঠিত হবে ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে এরকম দীর্ঘস্থায়ী লাভ করে না। হারি বা স্যাড জেনারেশনের কবিদের বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের বিস্তার ও কর্মের অবস্থা কী এটা অন্বেষণ করলে দেখব তারা ঘর সংখ্যা চাকরি, প্রাথমিক আন্দোলনের কর্তা বা ব্যক্তিরূপে তারা কিন্তু ফিরে যান তারা কবিতা চর্চায়। তবে তাদের কর্মকাণ্ড প্রশ্ন কি।

সাহিত্যিক চিন্তাবিদ যদি আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা মনে করেন তাহলে অবশ্যই তা সংগঠিত করবেন। এ কারণে কেউ জোর দিয়েছেন প্রতিবাদ, প্রতিরোধে, প্রথা বিরোধিতায়, কেউ জোর দিয়েছেন নতুনত্বে কেউ জোর দিয়েছেন সৃজনশীলতার। কেউ কেবল ভাঙ্গতে চেয়েছেন, কেউ গুরুত্ব দিয়েছেন নবসৃষ্টিতে। এ আন্দোলনমুখর পত্রিকাগুলোর বড় বৈশিষ্ট্য সৃষ্টিশীলতায় এবং নবসৃষ্টির আন্দোলনে নবচেতনা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে এবং লেখক ও পাঠকদের মধ্যে সেই নবচেতনাকে সঞ্চারিত করে দেয়ার জন্য আন্দোলনে যায়। তবে সুনীল শক্তিরা তারুণ্যেল জোয়ারে এসসময় বলেছিলেন, রবীন্দ্র রচনাবলি দুলায় লুইয়ে ধুলায় পাশোষে পরবর্তীতে রবীন্দ্রনাথকে তারা যথারীতি শ্রদ্ধার আসন দিয়েছে। এক্ষেত্রে নিজেদের জায়গা করে নেয়ার জন্য পূর্ভসুরিদের অস্বীকার করার

প্রবণতা এক ধানের যুক্তিহীন স্বার্থপরতা এর মাধ্যমে স্বীয় প্রতিভার ক্ষুদ্রত্বই বহি:প্রকাশ ঘটে। আশ্চায়গুলোতে আলোচনার প্রেক্ষাপটে বলা যায়, আধুনিকতাবাদ কোনো অল্প বলেন নয়, বর ও এক ঝাক আন্দোলন ও নতুন প্রবণতার যৌথ ফসল। তাই বৈশ্বিক ও দিকে দুনিকতারবাদের নানা লক্ষণ সনাক্ত করা এবং যত সহই, তেমনি এক করায় তার স্বলুপ সনাক্ত করা চিন্তা দুরুহ। এই দুবোধ্যতাও আধুনিকতাবাদের এক মূখ্য লক্ষণ। আধুনিকতার ধারণা নিয়ে সংশয় সব প্রবক্তার মনে কম বেশি বিরাজমান এই আধুনিকতাবাদী আন্দোলনের নুসারী লেখদের মানব প্রবণতাও সঙ্গতভাবেই বহুমাত্রিক হবে এটাই সিদ্ধ।

K) cPvi Av‡›‘vjb:

কল্লোলগোষ্ঠীর সাহিত্যের প্রচার প্রচারণা বিভিন্নভাবে হতো। তবে এর প্রধান প্রচারক হিসেবে সংশ্লিষ্ট সাহিত্যকর্মীগণই স্বীয় সাহিত্যকর্মের গুণকীর্তন করত। কল্লোল প্রগতি, কালি কলম এর এর আড্ডাগুলোর আলাপের অন্যতম বিষয় থাকত প্রচার ধর্মীষ্টার ব্যাপারটি। সিংহ রায়ের কল্লোলের কাল গ্রন্থে এর বিস্তারিত বর্ণনা আছে।

এরা তুলনামূলকভাবে সাড়ম্ভরতা পছন্দও করত। দেখা যেতো প্রথিতযশা ব্যক্তিবর্গের সাহিত্য কর্ম নিয়ে আলোচনা করে আলোচিত হতে পছন্দ করত। রবীন্দ্র জন্মবার্ষিকীতে কোন এক বিশ্ব বিদ্যালয়ের অতিথি ভাষণে বুদ্ধদেব বাসু বক্তৃতা শুরু করেন রবীন্দ্রনাথের সাথে দ্বিধাবিভক্ত সম্পর্ক নিয়ে যা কিনা

Peculiar and Personal:

I should compare it (this complex and vital relati onship), if I may to a long drawn love affair, Continuedd over several decades or rather a whole life time, with avowals and reversals, Periods of truncy or weariness, moods of recoils and revolt followed by inevitable reconciliation. I have the awful feeling that if Tagore had not exixted, I am today would not have existed either"[১]

বুদ্ধদেব বসু সেই বক্তৃতাতে শ্রোতাদের চিত্ত জয় করে নেন। অন্যরা বুদ্ধদেব বসু একজন প্রচারক কর্মী বটে। তিনি বলেন 'সাহিত্য আমাকে যা আনন্দ দেয় তাতে অন্যেরাও আনন্দিত হোক এই ইচ্ছার বেগ আমি সামলাতে পারিনা' বলে তিনি মত দেন। একত্রে অশ্রুকথার শিকদার বলেন,

প্রগতি প্রত্রিকার সংখ্যার পর সংখ্যায় জীবনানন্দের কবিতার বিরুদ্ধে নিন্দা সমালোচনার প্রতিবাদে প্রবন্ধের পর প্রবন্ধ লিখে যান। নিজের সমসাময়িক সুবীন্দ্রনাথ, অমিয় চক্রবর্তী, বিষ্ণু দেব কবিতা বিষয়ে, পরবর্তী কারে সময় সেন, সুভাষ, মুখোপাধ্যায়ের, নরেশ গুহ, অরুনুকমার সরকারের কবিতা বিষয়ে থাকে নিষ্কুণ্ঠ। নবীন কবি লেখকদের তিনি অবাধ সুবেক্ষা ও উৎসাহ দিতেন।[২]

তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, কল্লোল গোঙ্গীর সাহিত্যবাদের মধ্যে একটু আড়ম্বর প্রিয়তা ছিল যেমন আমরা এ যুগের কিছু স্ট্যন্ডবাজি করে কেউ কেউ করে যেন সমাজের মানুষের দৃষ্টির কেন্দ্রবিন্দু বা আলোচিত হবার সুযোগ থাকে। এই প্রচার আন্দোলন আমলে আপন গুণ আপনকে বৈ কিছু নয়।

Z_¨mÎ:

১. স্বাগত সংলাপ, বুদ্ধদেব স্মরণ সংখ্যা, কলকাতা, ২০০৮, পৃ. ১৫-১৬

২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬

L) AvaywbKZvev‘x †jLK‡‘i gvbmceYZv

আধুনিকতাবাদী সাহিত্যিক বাংলা সাহিত্যে কল্লোল (১৯২৩) কালি কলম (১৯২৬) প্রগতি (১৯২৭) পরিচয় (১৯৩১) পত্রিকাগুলো কে আশ্রয় করে। মোহিতলাল- ঘবন্দ্রিনাথ- নজরুল ওরা তিনজনে এই যুগভূমির অধিবাসী। মোহিতলাল প্রধানত শনিবারের চিঠি, (প্রথম প্রকাশ ১০ শ্রাবণ/ ১৩৩১) তেই লিখতেন অথচ তাঁর বিখ্যাত কবিতা পান্থ প্রকাশিত হয়েছিল তরুণদের মুখপত্র ‘কল্লোল (ভাদ্র/১৩৩২)। মোহিতলাল ছাড়াও সতীন্দ্রনাথ সম্পর্কেও তারা যথেষ্ট আগ্রহী ছিল। তার কবিতায় সে যে দুঃখবাদের পরিচয় ছিল, তাকে গ্রহণ সকৃজ্ঞ মনেই।

“দুঃখের মধ্যে কাব্যের যে বিলাস আছে সেই বিলাসে আমরা মশগুল ছিলাম। তাই নৈরাশ্যের দিনে ক্ষনে ক্ষতে আবৃত্তি করতাম ‘মরীচিকা’ (কল্লোল যুগ, অচিন্তকুশল (সেনগুপ্ত, পৃ: (১২৪) পূর্বোক্ত তিন কবির কাব্যচর্চা চতুর্থ দশকে অব্যাহত থাকলেও এদের কবিতায় আধুনিকতার পরিপূর্ণরূপ অনেকাংশে অল্পই থেকে গেছে। ইতিমধ্যে বাংলা কবিতার জগতে দেখা দিয়েছে আরো কয়েকজন তরুনতর কবি। চতুর্থ দশকের মধ্যেই এরা একে একে আবির্ভূত হলেন বাংলা কবিতার রাজ্যে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন– জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯-১৯৫৪), সুধীন্দ্রনাথ দত্ত (১৯০১-১৯৬০), অমিয়চন্ত্রবর্তী (১৯০১-১৯৮৬), প্রেমেন্দ্র মিত্র (১৯০৪-১৯৮৮–), অীজত দত্ত (১৯০৭-১৯৭৯) বুঘাদেব বসু (১৯০৮-১৯৭৪) বিষ্ণুত দে (১৯০৯-১৯৮৯)। এদের সাথে আরো অনেক নবীন কবিগণের সমাবেশ দেখা যায়। কবিধর্মে এরা একে অন্যের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক, কবিতার ভাবাদর্শের ক্ষেত্রে এবং রুপ-নির্মান প্রসঙ্গে প্রত্যেকেই নিজ নিজ বিশ্বাস অনুযায়ী স্বতন্ত্র কিন্তু এরাই বাতলা কবিতায় যথার্থ আধুনিকতার সূত্রপাত করেন (২ বিশ শতকের চতুর্থ দশক প্রকৃতপক্ষে বাংলা আধুনিক কবিতার প্রথম দশক, এই দশকের যাদের আমরা আধুনিক কবিতার প্রতিষ্ঠাতা পিতৃপুরুষ বলে জানি-তাদের প্রথম কণ্ঠস্বর শোনা গিয়েছিল– অশ্রু কুমার সিদার। আধুনিক বাংলা কবিতার দিগবলয়, পৃ: ৯৫)।

এই আধুনিকতাবাদী লেখকদের মানস প্রবণা আবার উক্তধারার কবিদের ঘোষণাকৃত আধুনিক কবিতার বৈশিষ্ট্যের যে নীতিমালা ঘোষণা করেন তার মাধ্যমে কিছু পাওয়া যায়।

বুদ্ধদেব বসু ১৯৫২-৫৭-৫৮ সালের মধ্যে আধুনিক কবিতার লক্ষণ নির্ণয় করেছিলেন" (আধুনিকতা ও মানবতাবাদ আনন্দ গোষ হাজরা, মাসিক বালি ও কলিম, ২০০৯, জানুয়ারি পৃ: তার উল্লেখিত আধুনিক কবিতার বৈশিষ্টবলি নিম্নরূপ:

GK: ভাষার নির্ভার মৌখিকতা থাকবে।

'B: কবিতায় ইন্দ্রিয় বিলাস ও দেহবাদকে স্বাগত জানানো

wZb: কবিতা দীর্ঘ হবে না

Pvi: কবিতা থেকে 'প্রকৃতির বিসর্জন' নাগরিকতা আনয়ন

cvP: কাজের জগত থেকে কবির নির্বাসন

Qq: রোমাষ্টিকতা বর্জন বা থাকলেও তার উচ্ছাস বর্জন

mvZ: কবিতায় শুভ ও অশুভ মঙ্গল ও অমঙ্গল দুই-ই থাকবে মঙ্গলের দিকে রাবীন্দ্রক ছুঁৎমার্গ একবারেই থাকবে না

AvU: কবিতায় দুঃখ বিষাধ বিতৃষ্ণ এবং বোদলেযাবীয় নের্বেদ থাকবে, (রোমান্টিক দুঃখ বিষাধ কার্যকারণহীন, কিন্তু বোদলেয়ারীয় দুঃখ নির্বেদ কারণযুক্ত)

bq: কবিতাতে কোনরকম দর্শনই থাকবে না।

'k: কবিতাতে ইমেজিস্টদের ধরনে ইন্দ্রিয়ান ভূতি সম্পন্ন চিত্রের ব্যবহার।

GMv‡iv: প্রতীকের ব্যবহার

কবি বুদ্ধদেব বসকৃত উপরিউক্ত আধুনিক কবিতার ভিত্তিক লো আলোচনা করতে গেলে দেখা যাবে যে, প্রায়ই সবকটি লক্ষণই একেবারে কবিতার বহিরাঙ্গ সম্পর্কিত ৭,৮, এবং ৯ নং বৈশিষ্ট্যগুলো অন্তরঙ্গের বলে বিবেচিত হয়। ১০ এবং ১১১ নং লক্ষণ আধুনিকতাবাদী কবিদের মধ্যে বিষ্ণু দে জীবনানন্দ দাশ ব্যবহার করেছিলেন।

১৯৪০ সালে প্রকাশিত হয় আবু সয়ীদ আইয়ুবের 'আধুনিক কবিতা' সংকলন। এই সংকলনের ভুমিকায় আইয়ুব একটি সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞা দিয়েছেন; 'কালের দিক থেকে মহাযুদ্ধ পরবর্তী, এবং ভাবের দিকে থেকে রবীন্দ্র-প্রভাবমুক্ত, অন্তত মুক্তিপ্রয়াসী কাব্যকেই আমরা

আধুনিক কাব্য বলে গণ্য করেছি। এই সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করে আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয়, এর লেখক দীপ্তি ত্রিপাঠী তাঁর গ্রন্থে (আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয় ১৯৭৪, পৃ. ৩) এদেশীয় আধুনিকতার নিমোক্ত তিনটি আইযুবীয় লক্ষণ সনাক্ত করেছেন;

১. কালের দিক থেকে আধুনিক কবিতা প্রথম মহাযুদ্ধ পরবর্তী।

২। ভাবের দিক থেকে তা রবীন্দ্র প্রভাব থেকে মুক্তিলাভের প্রয়াসী।

৩। সৃষ্টির দিকে থেকে তা নবতম সুরের সাধক।

এতে সঙ্গতভাবেই সন্তষ্ট থাকতে পারেননি গবেষক ত্রেপাঠি। তাই তাঁর ভাষায়, কিন্তু বাংলা কাব্যের আধুনিকতা এই তিনটি সামান্য লক্ষণেই সীমাবদ্ধ নয়। সমসাময়িক সমালোচনার পরিপ্রেক্ষিতে যদি কিছু এটিও থেকে যায় তবু বলা চলে ভাবের দিক থেকে আধুনিক কবিতার সাধাণ লক্ষণ এই।

১. নগরকেন্দ্রিক বাহ্যিক সত্যতায় অভিমত।

২. বর্তমান জীবনে ক্লান্তি ও সৈরাশানের

৩. আত্মবিরোধ ও অনিকেত

৪. বিশ্বের বিভিন্ন সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য হতে সচেতন গ্রহণ;

৫. ফ্রয়েন্সীয় মনোবিজ্ঞানের প্রভাব। অবচেতনা মনের উপর প্রশ্রয় দেয়ার ফলে

৬. ফ্রেজার প্রমুখ নৃতাত্ত্বিক ও প্লাঙ্ক, বোর, আইনস্টাইন প্রভৃতি আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানীর প্রভাব;

৭. মাকৃসীয় দর্শনের, বিশেষত সাম্যবাদী চিন্তাধারার প্রভাবে নতুন সমাজ সৃষ্টির আশা;

৮. মননধর্মিতা- অনেক সময় জ্ঞানের বিপুল ভাবে দুরুহতায় সৃষ্টি;

৯. বিবিধ প্রতিষ্ঠিত মূল্যবোধে (যেমন প্রেম, সুন্দর, কল্যাণ, ধর্ম) সংশয় এবং তৎসঞ্জাত অনিশ্চয়তার উদ্বেগ;

১০. দেহজ কামনা, বাসনা ও তৎপ্রসূত অনুভূতিকে স্বীকার করা এবং প্রেমের শরীরী রূপকে প্রত্যক্ষ করা;

১১. ভগবান এবং প্রথাগত নীতিধর্মে অবিশ্বাস।

১২. রবীন্দ্র ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে সচেতন বিদ্রোহ এবং নতুন সৃষ্টির পথসন্ধান।

অতঃপর আঙ্গিকগত লক্ষণ বিচার করে ত্রিপাঠী আরো বারোটি লক্ষণ সনাক্ত করেছেন। এরমধ্যে বাকরীতি ও কাব্যরীতির মিশ্রণ, সব ধরনের শব্দের যথেষ্ট ব্যবহার, ভাষা সম্বন্ধে শুচিবায়ু পরিহার, প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের পুরাণ থেকে গ্রহণ, ঐতিহ্যের সমন্বয়সাধন, প্রচলিত কাব্যগন্ধী শব্দ বর্জন, নতুন শব্দ গঠন, অর্থঘনত্ব সৃষ্টি, উল্লম্ফন সৃষ্টি, প্রচলিত পয়ার, সনেট ও মাত্রাপ্রধান, ছন্দের রূপান্তর, মধ্যমিলের সৃষ্টি, গদাছন্দ ব্যবহার, ব্যঙ্গ, বিতর্ক, অদ্ভুত, বীভৎস রসের ব্যবহার, শব্দালঙ্কার অপেক্ষা বিরোধাভাস ও অন্যান্য অর্থালঙ্কার ব্যবহার, বিষয়বৈচিত্র্য সৃষ্টি ইত্যাদ তীপ্তি ত্রিপাঠীর এই বাংলা দীর্ঘদিন ধরে পঠিত ও আলোচিত। জানা যায়, বুদ্ধদেব বসু তাঁর সন্দর্ভের পরামর্শক, পরিমার্জক ও পরীক্ষক ছিলেন। বুদ্ধদেবের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে রচিত এই গ্রন্থের উপর্যুক্ত ব্যাখ্যায় বুদ্ধদেবের সায় ছিল বলে ধরে নেওয়া যায়। উল্লেখ্য যে, দীপ্তি ত্রিপাঠী ও বুদ্ধদেবের অনুসারণে মাকৃসীয় দর্শন ও সাম্যবাদী চিন্তাকে আধুনিকতার অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

১৯৬৮ সালে প্রকাশিত হয়েছে আবু সয়ীদ আইয়ুবের 'আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ' শীর্ষক এক অসামান্য গ্রন্থ, এই গ্রন্থের ভূমিকায় আধুনিক সাহিত্যের অনেক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে দুটিকে প্রধানভাবে সনাক্ত করে আইয়ুব লিখেছেন; 'আধুণিক সাহিত্যের বহু বৈশিষ্ট্যের মধ্যে কেবল দুটি বৈশিষ্ট্যের কথা তুলেছি এখানে...

GK: কাব্যদেহের প্রতি একান্ত মনোনিবেশ, যার পরিনাশ কাব্ররচনায় ও সমালোচনায় দেহাত্মবাদ, ভাষাকে আধার বা প্রতীক জ্ঞান-না করে আপনারই দুর্ভেদ্য মহিমায় সুপ্রতিষ্ঠিত স্বয়ংসম্পূর্ণ সত্তা জ্ঞান করা। সাত্র র উক্ত হয়তো অতিরঞ্জিত, তবু আধুনিক কাব্যপ্রণেতার পরিচয় পাওয়া যায় তাতেঃ কবিতার ভাষা স্বচ্ছ কাঁচের মতো মোটেই নয়, নিজেরই অনবদ্য ধ্বনিরূপ ফুটিয়ে তোলা তার কাজ।

wØZxq ˆewkó¨: জাগতিক অমঙ্গল বিষয়ে চেতনার আধিক্য আমাকে পীড়িত করে। একজন পাশ্চাত্য সাহিত্যবিশারদ বলেছেন, এ যুগের (বোদলেয়ার-পরবর্তী) সাহিত্যের চারিত্র্য হচ্ছে 'an overwhchuing consciansiess of evif' অর্থাৎ আধুনিক

> সাহিত্যিকরা চারিদকিকার দুঃখ ও পাপ সম্বন্ধে শুধু সচেতন নন, এই অমঙ্গলবোধ তাঁদের চেতনাকে অভিভূত করে রেখেছে। জগৎ ও জীবন বিষয়ে আনন্দ, আগ্রহ, শ্রদ্ধা, বিস্ময় এমনকি কৌতুহল পর্যন্ত বিলুপ্ত হয়ে তার জায়গা জুড়েছে বোরডম, বিরক্তি, বিতৃষ্ণা, বিবমিয়া।' (আইয়ুব, ১৯৮০, পৃ. ৯-১০)।

আইয়ুবের উপর্যুক্ত বক্তব্য আসলে বৈশ্বিক আধুনিকতার দুই মুখ্য লক্ষণ। এই অবলোকন তাঁর পূর্বের অবলোকনের চেয়ে অনেক বেশি অন্তর্ভেদী। তবে এই বিশ্লেষণও পুরোপুরি পক্ষপাতমুক্ত নয়। আধুনিক সাহিত্যে অমঙ্গলকে আশ্রয় করেছে, ধর্মকে ত্যাগ করেছে, 'ভল্টেয়ারীয় আমি কে অস্বীকার করেছে, এ যেমন সত্য, তেমনি সব নঞর্থকতার বিরপীতে জ্বালিয়ে রেখেছে শিল্পেরই স্বসৃষ্ট দীপশিখা, যা শেষ পর্যন্ত আশাও জাগায়। এই আশা শিল্পজাত আশা। তাইতো বিলকে কবিতাকে ধর্মের স্থলভিষিক্ত করতে প্রলুব্ধ হন। স্পেন্ডার স্পষ্ট উল্লেখ করেছেন যে, এই আধুনিকতার অন্যতম দান হচ্ছে, The invention through art of a pattern of hope, influencing society. (The struggle of the Modern', 1965, p. 83) অমঙ্গলবোধের পাশাপাশি আধুনিক সাহিত্যের এই ইতিবাচক লক্ষণটি এখনো ব্যাপকভাবে ব্যাখ্যাত হয়নি। এটি হলে আধুনিক সহিত্যের ইতিবাচক দিকটি পুনরাবিস্কৃত হত।

বুদ্ধদেব বসু ও আবু সায়ীদকৃত আধুনিক কবিতার চরিত্র নির্ণয়ে যেসব বক্তব্র পেশ করেছেন তার অনুসৃতদের মধ্যেই আধুনিকতাবাদী লেখকদের মানসপ্রবণতার বৈশিষ্ট্যাবলী ফটে উঠেছে। এই আধুনিকতাবাদীরা সাধারণত শিল্পী- সাহিত্যেকের জীবনাদর্শ সংক্রান্ত প্রশ্নকে গুরুত্ব দিতে চাননি। শিক্ষা সাহিত্যের মধ্য দিয়ে যে জীবনদর্শন তারা ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন।

শিল্পী সাহিত্যের নৈতিক ও সামাজিক দায়িত্বকে অস্বীকর করার সুযোগ তারা গল্পে উপন্যাসে, নাটকে ব্যক্তির আত্মসর্বস্ব, আত্মরতিনির্ভর, রুগ্ন, অস্বাভাবিক, অদ্ভুত, উদ্ভট, বীভৎস সব আচরণকে মাহিমান্বিত করেছেন।

আধুনিককতাবাদী লেখকদের মধ্যে কাব্যের ক্ষেত্রে স্থান করে নেয়ার জন্যই রবীন্দ্র ঐতিহ্য লালিত গীতল কাব্য ধারা থেকে বেরিয়ে ঋতুভঙ্গির পদ্যভাষা নির্মাণে সচেষ্ট চিলেন।

এরা আত্মসর্বস্বতাবাদী। তাদের গল্প-উপন্যাস, কাব্যেল মধ্যে প্রতিফলিত ব্যক্তি স্বাতন্ত্রবাদের মমার্থ গ্রহণ করলে দেখা যায়, নৈরাশ্যবাদের সমর্থনে যারা জীবন ও পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করেন তাদের মতবাদকে সমাাজিক নিয়তিবাদ বলে অভিহিত করা যায়।

বস্তুত আধুনিকতাবাদী লেখকগণের মানসপ্রবণতা এখনও সাম্প্রতিককালের কবি সাহিত্যিকগণের মধ্যে বিরাজমান। কিন্তু এগুলো আমাদের সাহিত্য কাব্যকলার উৎকৃষ্ঠতা সমৃদ্ধি আনবে এভাবনা রেখেই তাদের কাব্যকলাকে আমরা গ্রহণ করব।

PZ_ Aa¨vq

Dcmsnvi

(K) cvðv‡Z¨ AvaywbKZvev‘ †_‡K DËivawbKZvev‘

L) evsjvq AvaywbKZvev‘ †_‡K DËivawbKZvev‘

M) evsjv fvlvq AvaywbKZvev‘x mwnZ¨ Av‡›‘vj‡bi Ae‘vb

Dcmsnvi:

আধুনিকতাবাদের প্রসঙ্গটা চলে আসে– বিশেষ করে কবিতায় আধুনিকতাবাদ। এ বিষয় নিয়ে কয়েকটি সাধারণ ও সংক্ষিপ্ত পর্যবেক্ষণ হাজির করা যাক।

c_gZ: এই আধুনিকতাবাদ এসেছে উপনিবেশবাদের হাত দূরে এবং পশ্চিমা আধুনিকতাবাদী সাহিত্য, নন্দনতত্ত্ব ও জ্ঞানভাষ্যের প্রভাবেই।

wØZxqZ: উপনিবেশিক ভারত বা বাংলার শিক্ষিত মধ্যবিত্ত এই আধুনিকতাবাদের মূল কর্তা ব্যক্তি, যারা এক ধরনের 'মিমিক ম্যান' ও বটে এবং যারা এমনকি সৃজনশীল হওয়া সত্ত্বেও উপনিবেশিক জ্ঞানতাত্ত্বিক কাঠামো ও তাবৎ ক্ষমতা-সম্পর্ককে প্রশ্ন করতে পারেননি। বরং নান্দনিকতার দোহাই পেয়ে এসব ঔপনিবেশিক মিমিক ম্যান ওই ধরনের প্রশ্ন ও প্রসঙ্গকে এড়িয়ে চলেছেন। বলাই বাহুল্য, এরা উপনিবেমবাদ ও উপনিবেশবাদ বিরোধিতার একটি বিশেষ পর্বে– ধরা যাক, বিশেষ দশক থেকে চল্লিশের দশক পর্যন্ত– উপনিবেশ পীড়িত সর্বসাধারণের অবস্থান ও অনুশীলন থেকে দূরে সরে গিয়ে নান্দনিক নিভৃতির নিমগ্ন চর্চাকে কাব্যিক ও সাহিত্যিক উদযাপনে রূপান্তরিত করেছিলেন।

ZZxqZ: গত শতকের বিশের, তিরিশের ও চল্লিশের দশকে ঔপনিবেশিক কলকাতা মেট্রোপলিটন নগরী না হয়ে উঠলেও ওইসব নান্দানিক মিমিক ম্যান জোর করেই তাদের নাগরিকভাবে ফলাতে গিয়ে বোদলেয়ারের প্যারিসে কিংবা এলিয়টের লন্ডনেই যেন মানসিকভাবে বসবাস শুরু করেছিলেন।

PZ_Z: এসব করণেই ফরাসি প্রতীকবাদী কবিতাকে এবং সাদা আধুনিকতাবাদী ইঙ্গ-মার্কিন কবিতাকে দারুণভাবে আকড়ে ধরেছিলেন এবং বিভিন্ন ভঅবেই চিনে গিযেছি বুদ্ধদেব বসুর বোদলেয়ারকে, সুধীন দত্তের মালার্মে ভ্যালেরি ভেরলেন কে কিংবা এমনকি বিষ্ণু দের এলিয়টকে। তবে জোর দিয়ে বলা দরকার যে পশ্চিমা মৃলুকের সঙ্গে প্রায় সরাসরি যোগাযোগ থাকা সত্ত্বেও ওই পশ্চিমা মুলুকের অভ্যন্তরেই ঘটে যাওয়া তারই অপর দের সমকালীন নান্দনিক, সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনেগুলোকে মোটেই বিবেচনায় রাখেননি বুদ্ধদেব বসু বা সুধীন দত্তরা। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে হয় দুটি আন্দোলনের কথা: ব্যপ্তিকাল ছিল মোটামুটিভাবে বিশেষ দশক থেকে চাল্লিশের দশক পর্যন্ত। প্রথমোক্ত আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন টগবগে কালো বা আফ্রিকি-মার্কিনি। লেখকরা এবং কালেন, ব্লড ম্যাককে, জেমন ওয়েলডন জনসন প্রমুখ। অন্যদিকে প্যারিসে সংঘটিত নেগ্রিচ্যুড আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত

ছিলেন ক্যারিবীয় কবি এমে সেজেয়ার, সেনেগালের কবি লেপোল্ড সেডার সেংঘর এবং গুইয়ানার কবি লিও দ্যমাব। এই কবিরা আন্দোলনের ভেতর দিয়েই মেট্রোপলিটন সাদা আধুনিকতাবাদের সমান্তরালে ও বিপরীতে আরেক ধরনের আধুনিকতাবাদ তৈরী করছিলেন, যা ছিল রাজনৈতিকভাবে লিপ্ত ও উপনিবেশবাদবিরোধীও বটে। কিন্তু বাংলা কবিতার বিরিশী আধুনিকতাবাদ ওই বিকল্প কালো আধুনিকতাবাদকে সঙ্গে নেয়নি মোটেও; একজন ল্যাংষ্টন হিউস বা একজন এমে সেজেয়াবের চেয়ে অধিকতর গ্রহণযোগ্য ছিলেন একজন বোদলেয়ার, একজন এলিয়াট। আর এই নির্বাচনের বিষয়টি মোটেই নিরীহ ছিল না। কিন্তু না, আমি মোটেই বোদলেয়ার বা এলিয়টকে নাকোচ করার পক্ষপাতী নই।

আলোচনার শেষান্তে আমরা বলতে পারি ইউরোপ-আমেরিকার সমাজ সংস্কৃতি, ভুগোলিক ও রাজনীতির পরোটাই ও কর্তৃত্বাবাদিতার কারণে তাদের সৃষ্ট আধুনিকতা তৃতীয় বিশ্বের আমাদের দেশে অবলীলায় গৃহীত হওয়া উচিত নয়।

আমাদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, বুদ্ধিবৃত্তিক ও রাজনৈতিক বিকাশের যৌক্তিক পারস্পরের সঙ্গে আমাদের আধুনিকতর একটি সমন্বয় সৃষ্টি হওয়া জরুরী। পাশ্চাত্য উপাদান তাতে সংশ্লেষিত হতে পারে; তবে তা কিছুতেই যাতে আধিপত্য বিস্তারকারী না হয।

ফরাসি বিপ্লবের মাধমে পাশ্চাত্যে যে যন্ত্রসভাভার বিকাশ সম্ভাবিত হয়েছে তাতে তাদের নগরকেন্দ্রিক আধুনিকতা উন্মোচিত হতে শুরু করেছে। কনস্টানিটনোপলের পতনের (১৪৫৩) কাল থেকে ইউরোপে আধুনিক যুগের সূত্রপাত হয়েছে। ইউরোপীয় রেনেসীয় যে মানবতাবাদ, যৌক্তিকতা, মনের প্রতি অনুরাগ, সৃষ্টিশীলতার প্রতি আকাঙ্ক্ষা প্রতিব্যক্ত হয়েছিল- বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্রম উন্নয়নের মাধ্যমে তা সাম্প্রতিক সময় পর্যন্তও বিকশিত থেকেছে। তবে তা তাদের নিজস্ব দেশেই। তাদের উপনিবেশভূক্ত দেশগুলোতে বিজ্ঞান ও মানবতাচর্চা একটি ক্রুর, নিষ্ঠুর ও চাতুর্থের মধ্যেই আবর্তিত হয়েছে।

আমাদের দেশের অবিভক্ত ভারতবর্ষের কলকাতায় উনিশ শতকের প্রথমপর্ব থেকে রামোহণ রায়, বিদ্যাসাগরের মাধ্যমে আধুনিকতার দরজা উন্মুক্ত হতে শুরু করেছিল। রামমোহনের মানবিক ও প্রজ্ঞাপ্রসূত ধর্মীয় যৌক্তিক দুষ্টিভঙ্গি এবং সতদিাহ প্রথা রোধের মাধ্যমে তাঁর কর্মপ্রচেষ্টা বাঙালির বন্ধু-চিন্তা মানসে মুক্তচিন্তা ও সংস্কারমুক্তি। বাতাররণ সৃষ্টি করতে থাকে। বাল্যবিবাহ রোধ এবং বিধবাবিবাহ প্রচলন প্রচেষ্টার সাহায্যে বিদ্যাসাগর বাঙালি সমাজে ধর্মীয় বন্ধু ভাবনার নিরসনে শক্তিশালী ভূমিকা পালন করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

উনিশ কশতকের প্রথমার্থে কলকাতায় সূচিত আমাদের মানবিকতাবাদ, যুক্তি ও বুদ্ধিবাদ, সংস্কৃতিমুক্তি, জ্ঞান, তৃষ্ণা এবং জীবনের প্রতি ইতিবাচক আকাঙ্ক্ষার যে প্রণোদনা ব্যঞ্জিত হয়েছিল- তার যৌক্তিক পারস্পূ কোনো আধুনিকতা পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশ কোথাও বিকশিত হয়নি বলেই আমি মনে করি।

বিশ শতকের প্রথমার্ধে ১৯২৬ সালে ঢাকায় বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের সূচনা উনিশ শতকের প্রথমার্ধের কলকাতার রেনেসার প্রভাব প্রসূত হতে পারে এ অর্থে তা ঢাকার বুদ্ধিবাদীগণ তৎকালীন বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে শতবর্ষ পূবের্র হিন্দু সম্প্রদায়ের জাগরণকে মনে রেখে মুসলিম সম্প্রদায়ের জাগরণ ভাবনাকে সমান্তরালে স্থাপন করে থাকতে পারেন। তবে মুসলিম সাহিত্য সমাজীদের দৃষ্টিভঙ্গি অবশ্যই সাম্প্রাদায়িক ও উদার ছিল।

এমমোছনের চিন্তা ও কর্মের সূচনা পর্বের (১৮১৪) একশত বছর পরে ১৯১৪ সালে প্রথম মহাযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। এ মহাযুদ্ধের বীভৎসতা ইউরোপে যেভাবে প্রকাশিত হয়েছিল- পশ্চিবঙ্গ ও বাংলাদেশে তৎকালনি অবিভক্ত বাংলা) অবশ্যই তেমনভাবে বিকশিত হয়নি প্রথম মহাযুদ্ধের পর প্রকাশিত টিএস ইলিয়িটের ওয়েন্টল্যান্ডে যে বিকার, নিঃসঙ্গতা, শূন্যতা অভিব্যক্ত হয়েছে, আমাদের সমাজে ও সমাজ কাঠামোতে তা কিছুতেই একই রকমভাবে অনুভূত ও বিরাজিত ছিল না। অথচ কল্লোলের কালে আমাদের সাহিত্যে যে রিরংসা, বিকৃতি ও অশুভের উন্মাদনা এভিব্যক্ত করা হয়েছিল, তা রবীন্দ্রবিরোধিতার নামে এক নতুন সাম্রাজাবাদী বিকৃতি ও অনাচাররের নামান্তর বলে আমি ধারণা পোষণ করি।

আমাদের স্বধেশী আন্দোলন ও অসহযোগ আন্দোলনের যে প্রভাব সুভাস চন্দ্র বস কাজী নজরুল ইসলাম প্রমুখের মধ্যে উচ্চারিত হয়েছিল, তারই রাজনৈতিক ইতিবাচক ধারাবাহিকতা আমাদের আধুনিকতার অংশভুক্ত হওয়া ইচত ছিল। উপবিবশতাবাদী আন্দোলনের পৃষ্টপোষকতা করেছেন নৈরিাশ্যবাদকে জয়ী করে মানুষকে অদৃষ্টবাদী করে মানুষের সংগ্রামী চেতনাকে বিনাশ করে উপনিভেমিক ব্যবস্থার ভিত্তিকে বহাল রাখার অন্যতম কর্মনীতি রূপে। (আবুল কাসেম ফজলুল হকের আধুনিকতাবাদ ও জীবনানন্দের জীবনোৎকণ্ঠা গ্রন্থ, জাগৃতি, ঢাকা, পৃষ্টা-৬১)। আবুল কাসেম ফজলুল হকের উপযুক্ত বক্তব্যের সঙ্গে সঙ্গত কারণেই আমি একমত পোষণ করি।

আমাদের প্রধান পঞ্চ আধুনিক হিসেবে জীবনানন্দ দাশ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বুদ্ধদেব বসু, অমীয় চক্রবর্তী এবং বিত্ত দে কে বিবেচনা করা হয়। কিন্তু তাদের মাতবাদ মুহাআধুনিকতা আমাদের সমাজ ও জীবকাঠামোর প্রকৃতি প্রতীকেকে ধারণ করে অগ্রসর হয়নি বলেই মনে হয ফরাসি কবি

Dhaka University Institutional Repository

বোদবেলয়াতের কাব্যে রয়েছে জীবনের প্রতি প্রচন্ড নেতিবাদী দৃষিভঙ্গি। পশ্চাত্য নেতিবাদী আধুনিকদের মধ্যে তাকে অববেচনাসূলভ অবক্ষয়। অসমন্বয়বাদী রানী আধুনিক হিসেবে আমি চিন্তিত। করতে চাই। টি এস এলিয়ট, টলস্টার রোমা রাণী বার্নাড শা প্রমুকের আধুনিকতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির প্রভাবে বুদ্ধদের বসুর মাধ্যমে আমাদের সাহিত্যে অভিবাত হয়নি বলে আমাদের আধুনকাতার সংকট সুচিন্তা হয়েছে।

জীবননান্দ সংসারে চলতে পারবে কি- করে জীবনানন্দের মায়ের জীবনানন্দ সম্পর্কে এরূপ দুশ্চিন্তা জীবনানন্দের ব্যক্তিগত স্বভাবের সামাজিক অনুপরোগিতাই প্রমাণ করে।

জীবননানন্দের ব্যক্তিজীবন, পারিবারিক জীবন শিক্ষকতা ও কর্মজীবন সম্পর্কিত তথা থেকে তার জীবনের অসুখিতা, দৌর্বল্য, অসহায়তা, নৈঃসঙ্গতা একাকীত্ব, ভয়, ক্লীবত্বকে উদঘাটন করা কোনো কঠিন কাজ নয়। এরূপ মানসিকতাই জীবনানন্দের কবিতা উপন্যাস গল্পে প্রতিভাত হয়েছে। তবে তাঁর রচিত প্রবন্ধ চিঠিপত্র ও সমালোচনাগুলোতে তার সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় দায়বদ্ধতার প্রসঙ্গ অনেকটা ইতিবাচকভঅবে প্রকাশিত হওয়ায় বলা যায়, তার মধ্যে জীবনকে যুক্তি, বুদ্ধি সহনশীলতা ও দুরদর্শিতা দিয়ে আধুনিকভাবে নির্মানের প্রণোদনা কার্যকর ছিল। তবে আমাদের দুর্ভাগ্য, তাঁর কবিতা গল্প ও উপন্যাসে আমরা রুগ্ন, ভোগকাতর, ম্রিয়মান, আশাহীন, মর্মকার্মী, দুঃখবাদী জীবনানন্দকেই ব্রঅপকভাবে পাই। তবে তার ব্যক্তিজীবনের দুঃখ, হতাশা ও যন্ত্রণার কারণে তার সৃষ্টি সম্ভার এমন নেতিবাচকতায় পূর্ণ সাহিত্যকে রিরংসা ও অবক্ষয়ের জ্বলন্ত প্রতিনিধি হিসেবে প্রতিষ্ঠা দেয়া আমাদের সাহিত্য ও সমাজের জন্য অবশ্যই ক্ষতিকর হয়েছে।

সুধীন্দ্রনাথ দত্তের যে নাস্তিকতা তা তাঁর ব্যক্তিপ্রসূত অভিব্যক্তি। দর্শনের বিয়য়েও তার ব্যাপক পড়াশোনা ছিল। তার সে নাস্তিক্যবাদী প্রণোদনা বাঙালি জীবনে ব্যতিক্রমী ও বিরল উদাহরণই স্পষ্ট করে। সুতরাং তার সে নাস্তিকতাবাদ আমাদের সমাজের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে না। আমাদের বিশ্বাসপ্রবণ সমাজে আস্তিকতা ও নাস্তিকতার সহিষ্ণু অধ্যয়ন ও মৌক্তিকতা আমাদের আধুনিকতবোধকে অবশ্যই শানিত করতে পারে; বিভ্রান্ত নয় অবশ্যই।

পাঁচ প্রধান আধুনিককেরই দুজন হলেন অমিয় চক্রবর্তী এবং বিষ্ণু দে। প্রথম জনের মধ্যে জীবন ও স্রষ্টার প্রতি বিশ্বাস এবং ইতবাচক জৈবনিকবোধ কার্যকর ছিল। দ্বিতীযজন সমাজতান্ত্রিক ভাবনার অনুসারী হওয়ায় সামাজিক প্রগতিশীলতা ও ইতিবাচক আশাবাদ তার মধ্যে অভিব্যক্তি হতে দেখি। আমাদের আধুনিকতায় এ ধরনের অনুষঙ্গগুলো জীবন সম্ভাবননার আকাঙ্কাকে উদ্দীপ্ত করতে পারে।

উল্লেখ্য যে, গত শতকের ত্রিশের দশকেই বিভূতিভূষণ, মানিক ও তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়ের মধ্যে আমাদের সামাজিক সাংস্কৃতিক ভাবনার সঙ্গে বৈশ্বিক অনুভব যুক্ত হয়েও আশাবাদী আধুনিকতার বিস্তার ঘঠছে। বিগত শতাব্দীর বিশের দশকে নজরুল ইসলাম, জসীম উদ্দীন এবং চল্লিশের দশকে সুকান্ত ভট্টাচার্য, আহসান হাবীব, ফররুখ আহমদের মাধ্যমেও জীবনের আশাব্যঞ্জক মানসিকতার প্রকাশ ঘটেছে।

বিশ শতকের চল্লিশের দশকের শেষের দিকে ১৯৪৭ সালে আমরা ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক দুঃশাসনে থেকে মুক্ত হয়ে নতুন পাকিস্তানী উপরিবেশের মুখোমুখি হই। সে শতকের ষাট দশকে ৬৬-র ছয় দফা, এবং ৬৯ এর গণঅভ্যুত্থানের ঘটনা সত্যই আমাদের জাতীয় রাষ্ট্রিক আধুনিকবোধকে জাগ্রত করে একাত্তরের বিসয়ের মাধ্যমে আমাদেরকে জাগ্রত প্রণোদনায় উদ্দীপ্ত রাখতে পারতো। অথচ the sad generation এর উন্মলতা, নিরাশাবাদ, যৌনঅস্থিরতা ও আত্মাধাংসকারী প্ররোচনা আমাদের বর্তমান সমাজ-রাজনীতি কাঠামো ও যুবক সম্প্রদায়ের মধ্যে গ্লানিকরভাবে বিরাজমান।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে কারণে ইউরোপ যে ধ্বংসজ্ঞ, অবিশ্বাস, অবক্ষয়, হতাশা, রিরাংসা, আগুক্ষয় বিরাজিত ও বিকশিত হয়েছে- আমাদের সমাজ তা খুবই কম হয়েছে। তৎকালীন বঙ্গদেশের শুধু পশ্চিমবঙ্গে দ্বিতীয় মহাযদ্ধোত্তর দুর্ভিক্ষের মাধ্যমে আমাদের সমাজ কাঠামোর ভিত ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। তবে সে দুর্ভিক্ষের কারণ অবশ্যই ব্রিটিশ উপনিবেশিক শাসকদের সৃষ্টি। দুর্ভিক্ষ ও যুদ্দজনিত ধ্বংসযজ্ঞ নিশ্চয়ই এক ধরনের ব্যাপার নয়। তা ছাড়া, সে দুর্ভিক্ষ সময় অতিক্রান্তির পরই আমরা ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক মুক্ত হয়ে স্বাধীনতা লাভ করেছি। দুর্ভিক্ষের প্রভাব থেকে উত্তরিত হয়ে স্বাধীনতার আবাস পুরণ এবং কাতিগঠনের দরদর্শিতার প্রতি অধিকতর দৃষ্টি নিক্ষিপ্ত হলে জাতি হিসেবে আমাদের আধুনিকতা বাদ আরো স্পষ্টতা পেতে পারতো।

(K) cvðv‡Z¨ AvaywbKZvev‘ †_‡K DËivawbKZvev‘

শিল্প-সাহিত্য ‘ইজম’ হলো শিল্প-সাহিত্যের গতি-পরিধি পরিমাপক মতবাদ। শিল্প-সাহিত্যের ক্ষেত্রে রোমান্টিসিজম ও ক্ল্যাসিসিয়াম বহুল আলোচিত ও পরিচতি বিষয়। রোমান্টিসিজম-এর রাজত্বের পরে ১৮৫৭ সালে বোদলেয়ারেরর ‘লা ক্লাব দ্য মাল’ প্রকাশিত হলে কাউন্টার রোমান্টিক মুভমেন্ট তথা মডার্নিজম-এর সূচনা হয়। ১৭৯৮ সালে ওয়ার্ডসওয়ার্থ ও কোলরিজের ‘লিরকাল ব্যালাডস’ প্রকাশের মধ্য দিয়ে রোমান্টিক আন্দোলনের শুরু এবং মোটামুটি ১৮৫০ সালে ওয়ার্ডসওয়্যার্থের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে এ যুগের সমাপ্তি ঘটে। ওয়ার্ডসওয়ার্থ, কোলরিজ, কিটস, খেলী, বায়রন এ যুগের উল্লেখযোগ্য কবি ছিলেন। সাহিত্যের ক্ষেত্রে রোমান্টিক পিরিয়ডটা নানাভাবেই গুরুত্বের দাবিদার। রোমান্টিসিজম-এর ব্যাপকতা এবং উদ্ভব-বিকাশের বিষয়টি নিচের উদ্ধৃতি থেকে অনেকখানি বোঝা যাবে:

Romanticism is a complex artistic, literary, and interilectaai movement that originated in the second half of the 18th century if Western Europe and gained strength during the Industrial Revolution. It was partly a revolt against aristocratic social and political norms of the Age of Enlightenment and a reaction against the scientific rationslization of nature, Romanticism reached beyound the rational and Classicist ideal models to elevate medievalism and elements of art and narrative perceived to be authentically medieval, in an attempt to escape the confines of popolation growth urban sprawl, and industrialism, and it also attempted to embrace the exotic, unfamiliar, and distant in modes more authentic than chinoiserie, hamessing the power of the imagination to envision and to escape, the ideologies and events of the French Revolution laid the background from which Romanticism emerged. (wikiipdia/Romanticism) রোমান্টিকতার মধ্যে রয়েছে উদ্বেলতা, কল্পনার আতিশয, বিদ্রোহ, অতীতের প্রতি দুর্নিবার আকর্ষণ অতিপ্রাকৃতে

বিশ্বাস এবং আরো অনেক কিছু। অনেকেই একে বলেছেন 'রেনেসেন্স অব ওয়ান্ডার কিংবা 'অ্যাডিশন অব স্ট্রেঞ্জনেস টু বিউটি'। অন্যদিকে ক্ল্যাসিসিজম-এর ধারণার সাথে যুক্ত আস্ত-সমাহিত ভাব 'কনকর্ড অব ইকুইলিব্রিয়ান'। সংহতির মধ্যেই ক্ল্যাসিসিজম-এর প্রাণ অতীত ঐতিহ্যের দিকে এর টান। ইউরোপীয় সাহিত্যের রোমান্টিক মুভমেন্টের ব্যাপকতার বিষয়টি যেমন আমাদের জানা, তেমনি আমরা এও জানি যে, মডার্নিজম আলোচনা মূলত মডার্নিজম থেকে পোষ্ট-মডার্নিজম পর্যন্ত শির্প-সাহিত্যের উদ্ভব-বিকাশে যে মুভমেন্ট কিংবা ইজম-এর বিষয়গুলো আমরা জানি, সে-গুলো নিয়ে একটি সাধারণ আলোচনার সূত্রপাত করা। কোনো তাত্ত্বিকতার আশ্রয় না নিয়ে খুব সোজা কথার এইসব বিষয়কে সাধারণ পাঠকের কাছাকাছি নিয়ে যাওয়া। মডার্নিজম-এর পরিসর বিশাল ও ব্যাপক। এর শুরু ও শেষ নিয়েও রয়েছে বিতর্ক। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "পুজি মিলিয়ে মডার্নের সীমানা নির্ধারণ করবে কে? এটা কালের কথা ততটা নয় যতটা ভাবের কথা "মডার্নিজম-এর স্রোতধারায় মিশে আছে অনেক ছোট ছোট মুভমেন্ট যেগুলো আধুনিকতাবাদের পরিসরকে আরো বিস্তৃত কররেছে। এর মধ্যে সিম্বোলিজম, ডাডাইজম, সুররিয়ালিজম, ইমপ্রেশনিজম এক্সপ্রেশনিজম, ইমেজিজম, কিউবিজম, ভর্টিসিজম, কিউচারিজমসহ আরো অনেক মতবাদ এসব নিয়ে ব্যাপক আলোচনার ক্ষেত্র তৈরি আমার উদ্ধেম্য নয়, সংক্ষিপ্ত পরিসর শিল্প সাহিত্য আন্দোলনগুলোর একটি ছক তৈরির চেষ্টা মুক্ত।

সেই প্রাচীনকাল থেকে হিসাব করলে এই সত্র প্রতিবার হবে সে সব সারী-শিল্পীত তাঁদের নিজ নিজ কালে আধুনিক ছিলেন। আধুনিকতাকে নানাভাবেই ভাবতে যেতে পরে, কিছু শিল্পে সাহিত্যে যে মডার্নিজম বা আধুনিকবাদ তাকে বিশেষভাবে ভাবতে হবে আমাদের। এই মডার্নিজম সাম্প্রতিকতা অর্থে নয়, একটি বিশেষ সময়ের শিল্প-সাহির্তের আন্দোলন আধুনিক ও আধুনিকবাদের পার্থক্যটাও আমাদের বোঝা দরকার। মাইকেল কিংবা রবীন্দ্রনাথকে যদি আমরা আধুনিক বলি তাহলে তিবিশ্বের কবিদের আমরা আধুনিকবাদী বলবো। অবশ্য রবীন্দ্রনাথ আধুনিকবাদের উন্মেষকালের অন্যতম যাত্রিক যদিও পুরোপুরি আধুনিকবাদী নন। মডার্নিজম-এর ধারণাটি অস্পষ্ট, অস্থির হলেও সাহিত্য-শিল্প আলোচনায় এর একটি বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। বিশ্ব শতকের পশ্চিমী শিল্প-সাহিত্য আলোচনায় তো বটেই, বাংলা সাহিত্যের

Dhaka University Institutional Repository

ক্ষেত্রেও এই আধুনিকবাদের বিষয়টি গুরুত্ববহু। উনিশ শতকের যন্ত্র-সভ্যতার বিকাশ ও পুঁজিবাদের চরম পর্যায়ে মডার্নিজম-এর আবির্ভাব। উনিশ শকতকের শেষপ্রান্তে এটি একটি মুভমেন্ট হিসাবে দেকা দেয় এবং বিশ শতকের মাঝামাঝি বিশ্বব্যাপী সংক্রমিত হয় নানা ভাব ও ভঙ্গিতে। এই সময়ে কবিতা, ফিকশন, চারুকলা, নাটক, সঙ্গীত ও স্থাপত্য এক যুগান্তকারী পরিবর্তন দেখা দেয়।

মডার্নিস্ট আন্দোলনটা কখন শুরু হলো আর কখনই বা মেষ হলো, এ নিয়ে মেতান্তর রয়েছে সেকথা আমরা আগেই বলেছি। াকরো কারো মতে, ১৯২০-তে ছিল এর চরম পর্যায় কেউ কেউ মনে করেন ১৯৪০-এর এর চরম পর্যায় এবং পোস্টমডার্নিজম-এর আরম্ভ। তবে স্থান ও সমসয় ভেদে এর শুরু শেষের একটি আলাদা আলাদা হিসেবে রয়েছে। মনে করা হয়, ফরাসী দেশে ১৮৯০ থেকৈ ১৯৪০ পর্যন্ত এর বিস্তৃতি। আবার ইংল্যান্ড বিশ শতকের শুরু থেকে ১৯২০ কিংবা ১৯৩০ পর্যন্ত, আমেরিকায় প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে এর শুরু এবং সমস্ত যুদ্ধব্যাপী এর বিস্তার। এটি ছিল আসলে একটি ইউরো-আমেরিকান সাহিত্যে আন্দোলন যার কেন্দ্র ছিল রাজধানী শহরগুলো, যা পরবর্তিতে সারা পৃথিবীর শিল্প-সাহিত্যে প্রভাব বিস্তার করেছে। Astradur Eysteinsson বলছেন,"There is a rapidly spreadicng egreement that modernism is a legitimate concept broadly signifying a paradigmatic shiftm, a major revolt, beginning in the mid and late nineteenth century, against prevalent literary and aesthetic traditins of Westen world." The Concept of modemism) নগরকেন্দ্রিক সভ্যতা বিকাশের সাতে সাথে আধুনিকবাদী সাহিত্যেরও বিকাশ ঘটেচে। মডার্নিজম-এর লক্ষ্য ছিল গতানুগতিক প্রতিষ্ঠিত নিয়ম-কানুন থেকে বেরিয়ে আসা এবং ফর্ম ও স্টাইল নিয়ে নানা নিরীক্ষা, বিশেষ করে ভাষা ও তার বহুমাত্রিক ব্যবহারের মধ্যে আধুনিকবাদের উজ্জীবন্ যে-কারণে স্ট্রাকচারালিজম প্রথম থেকেই মডার্নিস্ট প্রবণতাগুরোর সাথে সম্পর্কিত।

আদুনিকতাকে প্রমুর্ত করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেচেন, "নদী সামনের দিকে চলতে চলতে হঠাৎ বাঁক ফোরে। সাহিত্যও বরাবর সোজা চলে না। যখন সে বাঁক নেয় তখন সেই

Dhaka University Institutional Repository

বাঁকাটাই বলতে হবে মডার্ন।" আমরা আগেই বলেছি মডার্নিজম-এর হাওয়া রবীন্দ্রনাথের গায়েও লেগেছিল এবং বাংলা সাহিত্যের প্রেক্ষাপটে আধুনিকবাদী সাহিত্যের ভাবধারার প্রবেশ পথে তাঁকে দেখা গেলেও তিনি সেই অর্থে মডার্নিস্ট ছিলেন না। আধুনিকতা নিয়ে সে-সময়ে রবীন্দ্রনাথ ও তিরিশের কবিকুলের মধ্যে নানা বিতর্ক ও বাক-বিতণ্ডা ছিল এবং এর বিষয়ে আমরা সকরেই অবগত। এখানে স্মর্তব্য যে, রবীন্দ্রনাথ ও তিরিশের কবিদের মদ্যে আধুনিক কিংবা আধুনিকতা নিয়ে যে তর্ক-বিতর্কের অবতারণ হয়েছিল, তা কিন্তু মূলত শিল্প-সাহিত্যের যে মডার্নিস্ট মুভমেন্ট বা আধুনিকবাদ সেটিকেই বোজানো হয়েছিল। তখন আধুনিকবাদ শব্দটি কেউই ব্যবহার করেননি।

আমরা আগেই বলেছি মডার্নিজম-এর সাথে যোগ হয়েছে আরো অনেক বিষয় বা মুভমেন্ট যা মডার্নিজম-এর মূল স্রোতধারাকে আরো বেগবতী করেছে। সেইসব আন্দোলনও মডার্নিজম-এর আলোচনায় বিশেষবাবে আলোচিত হবার দাবি রাখে। ১৯১৬ সালের দিকে জুরিখে শিল্প-সাহিত্যের এক নতুন আনেআলন সূচীত হয়, যা দাদাইজম নামে পরিচিত। পূর্ণ স্বাধীনতা নিয়ে শিল্পী-সাহিত্যিকরা সম্পূর্ণ প্রথাবিরোধী উদ্ভট সব সৃষ্টিতে মেতে উঠলেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরপরই প্যারিসে এই আন্দোলন জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। প্রতিষ্ঠিত মূল্যবোধও ধারণাগুলো অস্বীকার করে উন্মত্ততার দিকে এক ধরনের উত্তুঙ্গ আচরণের বহিপ্রকাশ দেখা গেল। তারা বললেন, জীবন অর্থহীন ও উদ্ভটা। ত্রিস্তান জারা, হুগো বল, হ্যান্স আরপ ছিলেন নদাবাদের প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম। বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে এই দাদাবাদীরা পৃথিবীর নানা জায়গায় ছড়িয়ে পড়েন। "দাদা" নামে তারা একটি পত্রিকাও সম্পাদনা করেন। দাদাবাদীরা প্রচরিত সিনট্যাক্স না মেনে এমন ভাষারীতির উদ্ভাবন করতে চাইলেন যা কোনো কিছুই অর্থ করবে না। জার্মানিতে তারা শুধু নানা উন্মত্ততায়হি করতে চাইলেন যা কোনো কিছুই অর্থ করবে না। জার্মানিতে তারা শুধু নানা উন্মত্ততায়ই মেতে ওঠেনি, কমিউনিস্ট রাজনীতিতেও সম্পৃক্ত হয়ে পড়েন এবং নানা রকম কর্মকান্ড চালাতে থাকেন। ১৯২০ সালে বার্লিনে দাদা সম্মেলনের আয়োজনও করা হয়েছিল। বলা যায় দাদাবাদের আধো আলোয় সুররিয়ালিজম-এর ঘর-গেরস্থির পাড়ামো হয়েছিল। একটি আন্দোলন যখন শেষ হতে থাকে কিংবা তার প্রয়োজন যখন ফুরিয়ে যায়, তখন অন্য একটি আন্দোলনের গোড়াপত্তন সময়েরই

Dhaka University Institutional Repository

অনিবার্যতা। সেই ক্ষেত্রে দেখা যায় তখন অন্য একটি আন্দোলনের গোড়াপ্তন সময়েরই অনিবার্যতা। সেই ক্ষেত্রে দেখা যায়, আগের আন্দোলনের অনেক বৈশিষ্ট্যই পরবর্তী সময়ে আন্দোলনে থেকে যায়। সুররিয়ালিজম বা পরাবাস্তববাদ মডার্নিজম-এর পরিসরকে আরো বাঙ্ময় করে তোলে। ফ্রয়েড-ইয়ং-এর অস্থিরতা, অনিশ্চয়তা, অবক্ষয় প্রতিষ্টিত বাস্তবতাকে ভেঙে-চুর দেওয়ায় শিল্পীর মধ্যে সেই তাগিদ দেখা গেল-ভেতর থেকে আরেক বাস্তবেরঅন্বেষণণ। সেইক্ষেত্রে অবচেতনের তলদেশ থেকে আলো নিয়ে যক্তি-তর্ক ও সমস্ত নিয়ম নীতির বিপরীতে দাঁড় করালেন অন্যতর বাস্তব। অন্য কথায় চেতন ও অবচেতনের শিলে যে বাস্তবতা সেটাই সুররিয়ালিজম। এই আন্দোলনটি ১৯২০-তে ফরাসী দেশে শুরু হয় পরাবাস্তববাদীরা তাদের কাজে যক্তির কোন ধার ধারলেন না। তাদের শিল্পকর্ম ছিল অচেতন মনের ক্রিয়াকরাপ। এপোলিনিয়ার (১৮৮০-১৯১৮)একে 'সুপার রিয়ালিজম' হিসেবে চালিয়েছিলেন অন্তত ১৯২৪ সাল পর্যণ্ত। পরবর্তীতে আঁদ্রে ব্রেতোঁ সুররিয়ালিজম-এর প্রথম মেনিফেস্টো প্রকাশের মধ্য দিযে বিষয়টি আরো গতিশীল করে তোলেন। তিনি তাঁর মেনিফেস্টোতে এই মত প্রকাশ করেছিলেন যে, মনকে অবশ্যই লজিক ও রিজন থেকে মুক্ত রাখতে হবে। স্বপ্ন ও অলীক কল্পনার বিষয়টি ছিল পরাবাস্তববাদের প্রাণ। ব্রেতোঁ মনে করতেন, মনের মধ্যে এমন ্কটি জায়গা আছে যেখান তেকে বাস্তবতার বাইরের নতুন জ্ঞানের হদিস পাওয়া সম্ভব।

১৯২৯ সালে আঁদ্রে ব্রেতোঁ তার দ্বিতীয় মেনিফেস্টোতে ব্যাখ্যা করেছিলেন... how the surrealist idea was to revitalizw the psychic forces by a vertiginous discent into the self in quest of that secret and hidden territory where all this is a contradictory in our everyday lives and consciousness will be made plain. (Couddon) এ আন্দোলনের সূত্রপাত, উন্নয়ন ও নিরীক্ষার কাজগুলো মূলত ফরাসি দেশেই হয়েছে। আঁদ্রে ব্রেতোঁ, লউ আরাগঁ, পল এ্যালুয়ার, বেঞ্জামিন পেরে প্রমুখ এ নিয়ে কাজ করেছেন। সুরুরিয়ালিস্ট পেইন্টারদের মধ্যে পিকাসো ও সালভেদর দালির নাম করা যেতে পারে। জীবনানন্দ দাশ ও শক্তি চট্টোপাধ্যায় এর কবিতায় সুররিয়ালিজম-এর চর্চাটা চোখে পড়ার মতো।

Dhaka University Institutional Repository

পৃথিবীব্যাপী সুররিয়ালিজম-এর প্রভাবের কথা সর্বজনবিদিত। কবিতা ছাড়াও উপন্যাস, সিনেমা-থিয়েটার, তৈলচিত্র ও স্থাপত্যের ক্ষেত্রেও এর সুদূরপ্রসারী প্রভাব লক্ষণীয়। অনেক লেখকই চেতন-অর্ধচেতনের অনাবিস্কৃত ক্ষেত্রগুলো খুঁড়ে দেখার, আবিস্কারের নতুন নেশায় মেতে উঠে দেখতে চেয়েছিলেন মনের সেই গোপন প্রকোষ্ঠগুলো। আর এটা করতে গিয়ে তারা 'চেতনাপ্রবাহ টেকনিক'এরও আশ্রয় নিয়েছিলেন। ইদানীংকালের কবিতায় সুররিয়ালিজম-এর বিষয়টি অনেক কমে আসলেও নাটক ও উপন্যাসের ক্ষেত্রে এখনও এর প্রভাব লক্ষণীয়। ইউজিনও আইওনেস্কে, জাঁ জেন, স্যামুয়েল বেকেটে প্রমুখের নাটকে সুররিয়ালিজম-এর ব্যবহার দেখা যায়।

সিম্বোলিজম শিল্প-সাহিত্যের একটি অন্যতম আন্দোলন। ফরাসি দেশে উনিশ শতকের শেষের দিকে সিম্বলিস্ট আন্দোলনের জন্ম। বোদলেয়ার, মালার্মে, র‍্যাবোঁ ও ভেরলেন এই প্রতীকবাদী আন্দোলনের গোড়াপত্তন করেন। পর ক্লদেল, পল ভ্যালেরি এই আন্দোলনেকে এগিয়ে নিয়ে যান। বাস্তববাদ ও প্রাকৃতিকবাদের বিরুদ্ধে এই আন্দোলন। সিম্বলিস্টরা ভেতর জগতের দিকে মুখ ফেরালেন। সরাসরি অর্থকে বাদ দিয়ে সাংকেতিকভাবে মধ্য দিয়ে কবিতাকে বর্ণনা করার কথা ভাবলেন তারা এবং কবিতাকে কড়া ছন্দের শাসন থেকে মুক্ত করে কবিতার সগৌরব বিস্তৃতি বাড়িয়ে দিলেন। ফরাসি সিম্বোলিস্ট কবিদের ইম্প্রেশনিস্ট। রঙের বিবিধ খেলা এবং খোলা আকাশ, প্রান্তর, সমুদ্র ইম্প্রেশনিস্টদের প্রিয় অনুষঙ্গ। ইম্প্রেশনিজম একটি অস্পষ্ট টার্ম হলেও এটি সারা দুনিয়ায় শিল্প-সাহিত্যেকে প্রভাবিত করেছিল এবং মডার্নিজম এর বাহুতে যুগিয়েছিল অমিত শক্তি। ইংরেজ কবি অস্কার ওয়াইল্ড এবং আর্থার সাইমনকে ইম্প্রেশনিস্ট বলা হয়। নভেলের ক্ষেত্রে এটা একটি টেকনিক যেখানে বহিবাস্তবাতার পরিবর্তে চরিত্রের ভেতর জগতের আবিস্কারই মুখ্য হয়ে ওঠে। জেমস জয়েস, ডরেথি রিচার্ডসন এবং ভার্জিনিয়া উল্ফের লেখায় এইসব বৈশিষ্ট্য খুঁজে পাওয়া যাবে। অন্যদিকে বিশ শতকের প্রথম দিকে জার্মানিতে এক্সপ্রেশনিজম আন্দোলনের শুরু।এটিও পেইন্টিং-এর মধ্যে দিয়ে একটি আন্দোলনের রূপ নেয় এবং পরে সাহিত্যের জগতে প্রবেশ করে। একদল পেইন্টার কোনো বস্তুর বহ্যিক বাস্তবতার বর্ণনাকে এড়িয়ে জগতের সবকিছুকে একান্ত ব্যক্তিগত মানসপ্রকিয়ায় আঁকতে চাইতেন, াবচেতন মনের নানা রঙে। ১৯০৯-এর

Dhaka University Institutional Repository

দিকে নাটকের ক্ষেত্রে এর প্রভাব বেশি প্রবল হয়েছিল। নাটকের ক্ষেত্রে এটি ছিল নিত্যন্তই রিয়ারিজম-এর বিরুদ্ধে একটি প্রতিক্রিয়া। ভার্টিসজিমও মূলত শিল্প-সাহিত্যের একটি আন্দোলন। ১৯১২ সালে চিত্রকর ও লেখক উইন্ডহাম লউস-এর নেতৃত্বে এ আন্দোলনটি শুরু হয়। 'ব্লাস্ট' : দ্য রিভিউ অব দ্য গ্রেট ইংলিশ ভর্টেক্স' নামের একটি ম্যাগাজিন ১৯১৪ এবং ১৯১৫ সালে পরপর দুবার প্রকাশিত হয় এবং এই পত্রিকায় লইস ও এজরা পাউন্ড ছিলেন ইউরোপ ও আমেরিকার সংযোগকারী কবি, যিনি হ্যারিয়েট মনরোর চিকানো ম্যাগাজিন 'পোয়েট্রি'-এর কন্ট্রিবিউটিং এডিটর হিসেবে কাজ করেছেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সামান্য আগে কয়েকজন কবি বেশ প্রসিদ্ধ হয়ে উঠেছিলেন। এদের মধ্যে এজরা পাউন্ড, এমি লয়েল, টি.ই.হিউম, রিচার্ড অলডিংটন এবং হিলডা ডুলিটল উল্লেখযোগ্য। এই কবিরা বিশ্বাস করতেন যে, কবিতার জন্য দরকার কঠিন ও স্বচ্ছ ইমেজ। তারা আরো মনে করতেন, কবিতার ব্যবহৃত হবে প্রাত্যাহিক জীবনের ভাষা এবং বিষয় নির্বাচনে থাকবে অবাধ স্বাধীনতা। আমরা আগেই বলেছি এই আন্দোলনের প্রধান পুরোহিত ছিলেন এজরা পাউন্ড। এই ঘরানার নতুন কবিতা আন্দোলনে তিনি কবিতা বিষয়ে নানা ধরনের কথা বলেছেন। পরে তিনি ইতালিতে গেলে ফ্যাসিজম-এর খপ্পড়ে পড়েন এবং ইতালি রেডিওতে ফ্যাসিস্টের হয়ে প্রচারণা চালানোয় বিতর্কিত হন। কিন্তু কবিতার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন সৎ ও সংযমীসাধক, নতুনত্বের সন্ধানী।

পাউন্ড ইমেজিজম-এর বিষয়টি তাঁর নানা প্রবন্ধ, বক্তৃতা এবং একটি সংকলনে বিস্তৃতভাবে তুলে ধরেছেন এবং পৃথিবীব্যাপী এর প্রভাবকে বিশেষভাবে কবিতার ক্ষেত্রে অনিবার্য করে তোলেন। ১৯১৫ সালে মনরোর কাছে লেখা তার এক চিঠিতে তিনি আধুনিক সময়সঞ্জাত ভিজ্যুয়াল কবিতার কথার বলেন, যেখানে থাকবে না গতানুগতিক ধারণা এবঙ বহু-ব্যবহৃত পদসমষ্টি (cliches and set phrases)। ইমেজিজম এবং পাউন্ডকে আলাদা করে ভাবা মুশকিল। এই আন্দোলন ইংরেজি এবং আমেরিকান সাহিত্য বলয়ে ১৯১২ থেকে ১৯১৭ পর্যন্ত বিকাশ লাভ করছিল। পাউন্ডের ভাষায় এই আন্দোলন ছিল rather blurry, messy... sentimentalistic mannerish-এর বিরুদ্ধে এক ধরনের বিদ্রোহ। কবিতার সাঙ্গীতিক দ্যোতনায় তিনি বিশ্বাসী ছিলেন এবং পাশাপাশি এ ব্যাপারে উদ্বিগ্নও ছিলেন-

Dhaka University Institutional Repository

কীভাবে কবিতা কাগজের পাতায় সঙ্গীতের আবহসহ উপস্থিত হয়। musical activity of woras-এর বিষয়টি মূলত ইমেজিস্ট আন্দোলনেরই একটি দিক। A Few Donts of an Imagiste (1913) গ্রন্থে পাউন্ড ইমেজ বলতে সেই বিষয়কে বুঝিয়েছেন যা presents an intellectual and emotional complex in an instant of time. ১৯১৪ সালে তিনি ইমেজিস্ট কবিতার সংকলন Des Imagistes প্রকাশ করন এবং এই সংকলনে ১০ জন কবির কবিতা স্থান পায়। এদের মধ্যে ইউলিয়াম কার্লেস, ইউলিয়ামস, হিলডা ডুলিটল এবং এমি লয়েলের নাম করা যেতে পারে।

পরবর্তীতে এমি লয়েল তিনটি ইমেজিস্ট কবিতার সংকলন প্রকাশ করেছিলেন। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য Some Imagist Poets-এর ভূমিকায় তিনি লিখেছিনে-মুক্তভাবে যে কোনো বিষয়য়ে বেছে নেওয়া, নিজস্ব ছন্দ নির্মাণ, সাধারণ কথ্য ভাষায় ব্যবহার, একটি ইমেজের উপস্থিতি যা হবে সুস্পষ্ট ও ঘন এবং গতানুগতিক কাব্যিক উপকরণ ও কাব্যনির্মাণকৌশলকে ত্যাগ করা-এগুলোই মূলত ইমেজিস্ট কবিতার বৈশিষ্ট্য। পাউন্ডের In a Station of the Metro একটি ইমেজিস্ট কবিতা। কবিতাটি কেন্দ্রীভূত ভাবের সাজুয্যে এবং প্রকাশের সংযমীতায় অতুলনীয়। এটি মাত্র দু'লাইনের কবিতা এবং একটি ইমেজিস্ট কবিতার প্রকৃষ্ট উদাহরণ- The apparition in the faces of the crowd:/Petls on a wert black bough. সামান্য একটু রঙের ছোপে এবং পেইন্টিং-আদলে কবিতাটি গড়ে উঠেছে। এই কবিতাটির লিখন-কৌশলে জাপানি হাইকুর প্রভাব রয়েছে বলে অনেকে মনে করেন। অন্যান্য আন্দোলনের সাথে ফরাসিদের সম্পৃক্ততা থাকলেও ইমেজিজম আন্দোলটা মূলত ইংরেজি ভাষাভাষিদের আন্দোলন। সেসময়ের কিউবিজ-এর চর্চাটাও চোখে পড়ার মতো, বিশেষ করে শিল্প-কলায় বস্তুকে তার নিজস্ব আঙ্গিকে দেখার প্রয়াস এবং জ্যামিতিক আকার দেওয়ার মধ্যে দিয়ে তা প্রকাশ করা। চিত্রকলায় আঁভা-গার্দ আন্দোলনের একটি পর্যায় এটি। এজরা পাউন্ড এবং সাহিত্যবিষয়ক একটি আন্দোলন। এর মূল ধারণা ছিল গতি এক অরোধ্য গতি। এটিও ফরসিদের একটি আন্দোলন। এর দার্শনিক ছিলেন বার্গস রবীন্দ্রনাথ এবং জীবনানন্দ দাশের কবিতায়

ফিউচারিজম-এর লক্ষণগুলো দেখা যায়। এভাবে অনেক মুভমেন্ট তাদের নিজস্ব আলোয় মডার্নিজম-এর সমূহ সম্ভাবনাকে জাগিয়ে তুলেছিল এবং সময়ের আবর্তনে এর তেল ফুরিয়ে এলে তার পথের শেষে পোস্টমডার্নিম-এর আরেকটি আলো জ্বলে উঠল যার মধ্যে মডার্নিজম-এর অনেক প্রাণরসায়নের বৈভব খুঁজে পাওয়া যাবে। The Compact Oxford English Dictionary পোস্টমডার্নিজম-এর ব্যাখ্যা দিযেছে এভাবে- " a style and concept in the arts characterized by distrust of theories adn ideologies and by the drawing of attention to conventions." পোস্টমডার্নিজম কোনো মুভমেন্ট কিনা, এ নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। এটি একটি অনিশ্চিত, সুস্পষ্ট ও অনিয়ন্ত্রিত মতবাদ। এর সঙ্গে যুক্ত নানা অনুষঙ্গ। উত্তরাধুনিকবাদ ও উত্তরোধুনিকতার বিষয়টি এক হলেও উভয়কে এটু আলাদা করেও ভাবা যায়- Postmodernism is an aesthetic, literary, political or social philosophy, which was the basis of the attempt to describe a condition, or a state of being, or something concerned with changes to institutions and conditions (as in Giddens, 1990) as postmodernity, In other words, postmodenism is the cultureal and intellectual phenomenon", expecially since the 1920's new movements in the arts, while postmodemity focuses on social and political outworkings and innovations globally, especially sonce the 1960 in the West" (wikipdia Postmomeism)

উত্তরাধুনিকতা আসলে আধুনিকতার প্রতি একধরনের রি-অ্যাকশন। আধুনিকতা প্রশ্নবিদ্ধ হয় উত্তরাধুনিকতার দরবারে। আধুনিকতার বাহুল্য, অসংগতি, কেন্দিকতা এবং রক্ষণশালতাকে চিহ্নিত কর উত্তরাধুনিকাত। Postmodernism was originally a reaction to modernism. Largely influenced by the Westerm European disillusionment instuce by World War III. postmodernism refers to a cultural, intellectual, or arritic state lacking a clear central

Dhaka University Institutional Repository

hierachy or organizing pronciple and embodying extreme complesit, contradiction, ambiguity, diversity, interconnectedness or interreferentiality, in a way that is often indistinguishable from a parody of itself. It has given rise to charges of fraidulence (wikipdia / Postmodernism) খণ্ডবাদী ধারণা থেকে অখণ্ডবাদী ধারণায় বিশ্বাসী পোষ্টমডার্নিজম। আধুনিকতা কিংবা উত্তরাধুনিকতা উভয়েই পশ্চিম থেকে আসা তত্ত্ব হিসেবে এদের গায়ে সাম্রাজ্যবাদের গন্ধ রয়েছে এটা যেমন সাহিত্য, তেমনি সত্যি যে, শিল্প- সাহেত্যের বিচারে, মূল্যায়নে এগুলি আমরা ব্যবহার করছি এবং করতে হচ্ছে নানা কারণেই। উত্তরাধুনিকতার বিষয়টি কোনো একটি বিশেষ তত্ত্বের মাঝে খুঁজে পাওয়া যাবে না, অনেক অনেক তত্ত্বের, সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক প্রপঞ্চসমূহের মধ্যে এর আশ্রয়। অনেকেই মনন করেন উত্তরাধুনিকতা মূলত কোনো তত্ত্ব নয়, এটি একটি কালখণ্ডের নাম। সমষ্টিক কিংবা মাইনর জিনিসের প্রতি পোস্টমডার্নিজম-এর ঝোঁকটা বেশি। মেলবন্ধন কিংবা অখন্ডতার দিকে, পরিপূরকতার দিকে, এক মহাচেতনার দিকে এর নিরন্তর যাত্রা। ওপেন এন্ডেডনেস এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

পোস্পমডার্নিজমো" শব্দটি প্রথম লিখেন স্প্যানিশভাসী কবি ফেদেরিকো দ্য ওনিস ১৯৩০ সালের দিকে। তিনি ছিলেন ল্যাটিন আমেরিকান কবি। ১৯৬০-এর দশকের শেষের দিকে শিল্প-সাহিত্য সমালোচনার ক্ষেত্রে পোস্টমডার্নিজম-এর প্রবেশ। তবে ১৯৮০-এর দিকে এ নিয়ে আলোচনা-সমালোচনার পথ করে দেন প্রথম লিওতার তাঁর 'দ্য পোস্ট-মডার্ন কন্ডিশন : অ্যা রিপোর্ট অন নলেজ' (১৯৭৯) প্রকাশের মধ্য দিয়ে। এর পর ফরাসি চিন্তক জাঁ বদ্রিলা তার বিখ্যাত গ্রন্থ 'সিমুলেশনস' (১৯৮১-এ পোস্টমডার্নিজম নিয়ে কথা বলেন। পরবর্তীতে পশ্চিমে এই নিয়ে অনেক ডিসকোর্স, অনেক বিতর্কের ঝড় বয়ে গেছে, অনেকেই পোস্টমডার্নিজম বলে কিছু আছে কিনা-এ নিয়েই সন্দেহ পোষণ করেছেন। অতঃপর তা আমাদের বঙ্গদেশেও প্রবেশ করেছে এবং বেশকিছু চিন্তকের এই বিষয়টি মানতেই নারাজ। তথাপিও আমরা মনে করি পোস্টমর্ডার্নিজম-এর অখণ্ডবাদী বৈশিষ্ট্যসমূহ মানবিকীকরণের ক্ষেত্রকে উস্কে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে।

Dhaka University Institutional Repository

Nial Lucy- এ কথায় পোস্টমডার্নিজম-এর বিষয়টি আরো স্পষ্ট হয়েছে- " This, I think, is the basis of the psotodern idea thateverything is a text. For psotmodernism, the problem of inside/outside relations is not confined to the question of literature but extends rathers across the whole field of culture and society. What was once the romantic space of the literary becomes, for postmodernism, a general plane of human existence, on which concepts of identity, origin and truth are seen as multiple and structureless assemblages rather than as grounds for understanding human `being' and culture. ... I think `postmodernism' refers to the generalization or flattening out of the romantic therory of literature which marks it as a radical' therory of the nonfoundational, strucurreless `structure' of truth." (Post Modrn Literary Theor : An Introduction)

অ্যান্টিকলোনিয়াল চেতনার মধ্যে পোস্টমডার্নিজম-এর জন্ম। পোস্টমডার্নিজম ও ম্যাজিক রিয়ালিজম পোস্টমডার্নিজম-এর দুটি বিশিষ্ট স্তম্ভ। বিশ্বায়ন, নারীবাদ, ইকোলজি, ইত্যাদির মধ্যে পোস্ট-মডার্নিজকম কাজ করে যাচ্ছে উন্মুক্ত প্রান্তরে দাঁড়িয়ে। ইহাব হাসান মডার্নিজম এবং পোস্টমডার্নিজম-এর মধ্যে একটি ভেদরেখা টেনেছেন এভাবে:

AvaywbKZvev‘	DËivawbKZvev‘
মডার্নিজম	পোস্ট-মডার্নিজম
ফর্ম	অ্যান্টিফর্ম
পারপোস	প্লে
ডিজাইন	চানচ
হাইয়ারার্কি	অ্যানর্কি
ক্রিয়েশন/টোটালাইজেশন	ডিক্রিয়েশন/ডিকন্ট্রাশন
সেন্টারিং	ডিসপারসাল

Dhaka University Institutional Repository

সিগনিফাইড	সিগনিফাইয়ার
লিসিবল/রিডারলি	স্ক্রিপটিবল/রাইটারলি
ন্যারেটিভ	অ্যান্টিন্যারেটিভ

সাংস্কৃতিক ঔপনিবেশিকতা থেকে মুক্তির এক দুর্নিবার তাগিদ কিংবা ঐতিহ্যসংলগ্নতার সাথে পোস্টমডার্নিজম-এর নিবিড় সখ্য রয়েছে। নিম্নবর্গীয় চেতনা-কাঠামোর বিস্তার ও সংহতি উত্তরাধুনিকবাদের অন্যতম ক্ষেত্র। এটি শুধু পিছনে ফেরা নায়, বরং অনেকানেক সংশ্লেষক স্রোতধারায় উত্তরাধুনিকবাদের প্রাণপ্রবাহের খেলা। অঞ্জন সেন বলছেন-"আমরা সেই আধুনিকতাকে মানি না যার ভিত্তি ঔপনিবেশিক। বোদল্যের, মালার্মে এলিয়ট, পাউন্ড বিলকে, মায়াকোভস্কি, ব্রেশট, আরোগ, লু সু, নেরুদা, ভাসকো পোপা, গ্রাস আজ বাঙালি কবিদের কাছে াবশ্য পাঠ্য হতে পারে, তেমনি লুইপাদ, বড়ু-দ্বিজ : সহজিয়া চণ্ডীদাস, কৃত্তিবাস, কবিকঙ্কণ, গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস, কাশীরাম দাশ, কৃষ্ণদাস কবিরাজ, বিজয় গুপ্ত, মনারম, ভারতচন্দ্র, রাপ্রসাদ বা রামনিধি গুপ্ত: অসংখ্য লোকগাথা, বাউল গান আমাদের সুপরিচিত থাকবে কেন? উত্তর আধুনিকতা সেই সংশ্লেষণ সমন্বয় চায়, উত্তর আধুনিককতা সাহিত্যে সীমাবদ্ধবাবে কেবলমাত্র ইউরোপ অনুসারণের অপক্ষপাতী।" অঞ্জন সেন আরো বলেছেন- "ঔপনিবেশিক চিন্তাধারায় লালিত আমাদের কবি-সাহিত্যিক সমালোচকরা ঔপনিবেশিক ধ্যান-ধারণার বাইরে কিছু ভাবতে পারেন না। ...রবীন্দ্রনাথের পর থেকে ক্রমে ক্রমে ইউরোপীয় সাহিত্য বর্গগুলি বাংলা কবিতায় প্রবল হয়ে উঠেছে এবং বাংলা ভাষার নিজস্ব বর্গগুলি ক্রমশই অবহেলিত।

আমাদের একথা মনে রাখা দরকার যে, পশ্চিমে পোস্টমডার্নিজম নিয়ে যেসব ডিসকোর্স কিংবা আলোচনা-সমালোচনা দেখা যায় তা উপনিবেশ-উত্তর স্বাধীন দেশসমূহে যাদের বাষা ও সংস্কৃতি উপনিবেশ কর্তৃক দলিল কিংবা অবহেলিত ছিল তাদের সাথে পুরোপুরি মিলানো যাবে না। পোস্টমডার্নিজম-এর ধারণাটি নিজস্ব আঙ্গিকে ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে বাঙ্গালি চিন্তকদের যেসব ডিসকোর্স কিংবা আলোচনা-সমালোচনা আমরা পেয়েছি তা উত্তর-ঔপনিবেশিক সংস্কৃতিচর্চায় শিল্পী-সাহিত্রিকদরে আধুনিকবাদী শিল্প-চেতনা থেকে সরে এসে শিকড় সদানী করে তুলতে সাহয়ক শক্তি হিসেবে কাজ করবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

Dhaka University Institutional Repository

ম্যর্কসবাদী চিন্তকেরা পোস্টমডার্নিজমকে সাম্যবিরোধী বলে ভেবে থাকেন। তবে উত্তক্ষ আর্কসবাদ আবার মেলবন্ধনে বিশ্বাসী। সমীর রায় চৌধুরী মনে করেন- "যে সব মার্কসবাদী পোস্টমডর্ন চিন্তাচেতনাকে সাম্যবিরোধী বলছেন, তাঁরা অজ্ঞানতা থেকে এসব কথা বলার স্পষ্টতা দেখাচ্ছেন। তাঁরা মৌলবাদী ও অভিমুখ অজ্ঞানী। এটা পরিস্কার হওয়া দরাকার যে, এ "পৃথিবীকে 'ব্রাত্য'করণ আজ অচল, দ্বিপাক্ষিকতার গোঁড়ামিস অকেজো হয়ে আসছে। ব্যবধান যেটিরে বেলই একমাত্র পথ। এই বোধ দুদিকের পক্ষে সমান সত্য। যেজন্য সর্বত্র ডায়ালগ বা অবিরাম কথা চালাচালির প্রসঙ্গ উঠছে। আলিমুদ্দিনে যাচ্ছেন শিল্পপতি। আর 'মউ' সই করাতে শিল্পপতি খুঁজতে হচ্ছে মার্কসবাদী মুখ্যমন্ত্রীকে। সর্বত্র মেলবন্ধনের বাধ্যবাধকতা দেকা দিচ্ছে।" তবে কোনো কোনো মার্কসবাদী চিন্তকের উত্তর মার্কসবাদী ধ্যান-দারণায় উন্নীত হওয়ার বিষয়টি আমাদের অনেকখানি আশাবাদী করে তোলে।

সাহিত্যের বিশেষ করে ফিকশনের এক অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ টেকনিক ম্যাজিক রিয়ালিজম।

> ম্যাজিক রিয়ালিজম বা ম্যাজিক্যাল রিয়ালিজম বা যাদুবাস্তবাত আসলে সেই জিনিস যে বিসেয়ে পাঠক আগে থেকে অবগত নন, কল্পনার বাস্তবধর্মী বয়ান যা পাঠক বিশ্বাস করে ফলে কিংবা বিস্বাস করতে চায়। এটাকে অনেকেই 'এনহ্যান্সড রিয়ালিটি' বরতৈ চেয়েছেন। ইসাবেলা আলেন্দে যেমন বলেছেন, 'যাদুবাস্তবাত হলো বাস্তব ওপরাবাস্তবের সংমিশ্রণ। এটি বাস্তবতার ভেতরে আরেক বাস্তবতা যা লেখকের বয়ান-ভঙ্গি ও দক্ষতার উৎকর্ষে ব্যাঞ্জয় হয়ে ওঠে। ফ্যানটাসি কিংবা কল্পকাহিনীর সাথে একে গুলিয়ে ফেললে চলবে না। লেখক যখন কোনো ফ্যান্টাসির বর্ণনা দেন, তিনি বিষয়টি যে অবাস্তব সে বিষয়ে স্পষ্ট না। লেখক যখন কোনো ফ্যান্টাসির বর্ণনা দেন, তিনি বিষয়টি যে অবাস্তব সে বিষয়ে স্পষ্ট আভাস দেন, কিংবা তার অবিশ্বাসকে ব্যাঞ্জয় করে তোলেন। যাদুবাস্তবাতর ক্ষেত্রে লেখকও পাঠকের সাথে চরিত্রগুলোর মধ্যে বিলিন হয়ে যান। ঘটনার সত্যাসত্যের ব্যাপারে পাঠক নিশ্চেষ্ট হয়ে যায় এবং বর্ণনার মায়াস্পর্শে পাঠকের কাছে তা সত্য হয়ে ওঠে। ১৯২৫ সালে ফ্রানজ রোহ (জার্মান সাংবাদিক ও চিত্রসমালোচক) মিউনিখে জার্মানির শিল্পীদের একটি চিত্র প্রদর্শনীর পর তাদের সেই শিল্পকর্মের আলোচনায় 'ম্যাজিক

Dhaka University Institutional Repository

রিয়ালিজম' টার্মাটি প্রথম ব্যবহার করেন। এই শিল্পকর্মগুলো ছিল পোস্ট-এক্সপ্রেশনিস্টিক ফর্মের। এবস্ট্রাক্ট-এর বিপরীতে তিনি এই টার্মটি ব্যবহার করেন। এইসব চিত্রকর্মগুলোতে ছিল এক ধরনের স্বপ্নালু ভাব কিছুটা পরাবাস্তবতার ছোঁয়া : " Their work was marked by the use of still, sharply defined, smoothly painted images of figures objecs depicted in a somewhat surrealistiie manner. The themes and subjects were often imaginary, somewhat outlandish and fantastic and with a certain dream-like quality" (Cuddon) পরবর্তীতে চল্লিশের দশকে এর প্রয়োগ দেখা যায় আমেরিকার চিত্রকর্মে। ১৯৪৩ সালে 'নিউইয়র্ক মিউজিয়াম অব মডার্ন আর্ট'-এ যে চিত্র প্রদর্শনী হয়েছিল তার নাম দেওয়া হয়েছিল 'আমেরিকান রিয়ালিস্টস অ্যান্ড ম্যাজিক রিয়ালিস্টস'। তখন থেকেই এর সংক্রমণ ও বিস্তার বিশেষ করে ল্যাটিন আমেরিকা ও আফ্রিকার সাহিত্যের মূর্ত হয়ে ওঠে। হিস্পানি লেখকদের লেখায়ও এর প্রয়োগ দেখা যায়। চল্লিশের দশকের শেষের দিকে অস্ট্রিয়ান নভেলিস্ট জর্জ সাইকো (১৮৯২-১৯৬২) এক ধরনের 'কোয়াসি সুরুরিয়ালিস্টিক' ফ্রিকশন প্রকাশ করতে থাকেন, যাকে তিনি 'ম্যাজি রিয়ালিজম' হিসেবে বর্ণনা করেন। তবে এই ধারণা পুরোপুরি প্রথম সাহিত্যে আসে কিউবান লেখক আলেহে কার্পেন্তিয়ারের (১৯০৪-৮০) মাধ্যমে ১৯৪৯ সালে। গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজের লেখার এর সার্থক প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। বিশেষ কর তার ওয়ান হানড্রেড ইয়ারস অব সলিট্যুড, লাভ ইন দ্য টাইম অব কলেরা, অ্যা ডেবি ওল্ড ম্যান উইথ এনোরমাস উইংস কিংবা কর্নেলকে কেউ চিঠি লেখে নি ইত্যাদি উপন্যাস যাদুবাস্তবতার সার্থক প্রয়োগ দেখা যায়। তার আগেও হোর্হে লুই বোর্হেস, মারিও ভার্গাস য়োসাসহ আরো অনেক লেখকের লেখায় যাদুবাস্তবতার খোঁজ পাওয়া যায়।

পৃথিবীর সবদেশের কথাসাহিত্যেই কারো-না-কারো লেখায় খুঁজলে এই যাদুবাস্তবতার হদিস পাওয়া যাবে। লেখকের নিজের অজান্তেই এটা হয়ত চলে এসেছে। বাংলা ফিকশনেও বঙ্কিম তেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথ, তারাশঙ্কর, জগদীশ গুপ্ত, সতীনাথ

Dhaka University Institutional Repository

ভাদুড়ী থেকে শুরু করে আজকের শূন্যের দশকের কোনো ফিকশন রচয়িতার লেখায় এই যাদুবাস্তবতা, তার কিছুটা প্রয়োগ বাংলা কথাসাহিত্যের ক্ষেত্রে কবেল শহীদুল জহিরের লেখায়ই পাওয়া সম্ভব। যদিও মার্কেজের মতো কিংবা ল্যাটিনো, আফ্রিকান কিংবা হিস্পানি লেখকদের মতো এর সার্থক প্রয়োগ তার লেখায় হয়ত মিলবে না্

পোস্টমডার্নিজম-এর প্রাণপাখির উড়ে চলার সানন্দ গতি লুকিয়ে রয়েছে পোস্টমডার্নিজম-এর মধ্যে। উপনিবেশ-উত্তর স্বাধীন দেশসমূহে উপনিবেশ কর্তৃক আরোপিত ছকে গড়ে ওঠা সাংস্কৃতিক কাঠামোটি ভেঙে দেশ-কাল ঐতিহ্যের মোহানায় দাঁড়িয়ে শিল্প-সাহিত্য করার তাগিদ দেখা গেল। বহুবাচনিক স্বর, লোকায়ত জীবনের বৈচিত্র্য নতুন ভাবে ও ভাষায় স্ফুরিত হলো আফ্রিকা, ল্যাটিন আমেরিকা কিংবা এশিয়ায়।

“ Postcolonial literatures have emerged from heterogeneous linguistic sources comprised of indigenous languages (oral and written) which colonising languages have attempted to stifle. The opposition of language as stasis and language as growth parallels the conflict between political hegemony and human inventiven" (Postcolonial Literatures) উপনিবেশ কীভাবে একটি জাতির সমগ্র জীবন-কাঠামোয় প্রভাব ফেলে, সেই বিষয়টি কলিম খানের কথায় স্পষ্ট হয়ে ওঠে, “ইউরোপ কেবল ভাতে উপনিবেশই স্থাপন করেননি, ভারতীয়দের জীবেনর সর্বত্র তার ভাষায় আচার ব্যবাহরে, মনে জীবিকায় শিল্পে সাহির্তে এককথায় সমগ্র জীবনযাত্রায় উপনিবেশ স্থাপন করছিল।” আফ্রিকার অনেকগুলো দেশই আমরা লক্ষ্য করছি কীভাবে উপনিবেশবাদীরা তাদের ভাষার আধিপত্য বিস্তার করতে গিয়ে সেইসব দেশের ভাষাকে পঙ্গু করে ফেলেছিল। ১৯৭২ সালের আগে সোমালিয়ায় সাহিত্য তৈরির উপযোগী কোনা ভাষারই অস্তিত্ব ছিল না। আফ্রিকার ক্ষেত্রে লিওপোল্ড সেডার সেঙ্ঘর, চিনুয়া আচেরে, গাব্রিয়েল ওকারা আতুকেই ওকাই, নগুগি, ওলে সোয়িঙ্কো প্রমুখ লেখকরা আফ্রিকার নিজস্ব ইতিহাস ঐতিহ্য নিযে সাহিত্য করেছে, যাকে আমরা পোস্টমডানিয়াল সাহিত্য বলতে পারি।

Dhaka University Institutional Repository

এডওয়ার্ড সাঈদ অবশ্য তাঁর 'কালচার অ্যান্ড ইপিরিয়ালিজম' গ্রন্থে ফেননের 'নিড টু রিক্লেইন দ্য পাস্ট'-এর সূত্র ধরে ডব্লিউ. বি ইয়েটসকেও পোস্টকলোনিয়াল লেখক হিসেবে মনে করেছেন। পোস্কলোনিয়াল সাহিত্যের বিষয়টি Peter Barry- র কথায় স্পষ্ট হয়ে ওঠেঃ Characteristically, postcolonial writers evoke or create a precolonia version of their own nation, rejecting the modern and the contermporary, which is tainted with the colonial status of their countries. (Beginnign therory) ইউরোপিয়ান কলোনিস্ট লেখকরা পৃথিবীর বিশাল ভূখন্ডকে ভাবতো, 'blank spaces, lands without narrative' দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে এডওয়ার্ড সাঈদ যেমন বলেছেন, .there has been massive intellectual-and imaginative overhaui and deconstructiono f western representation of the non-Western world. আফ্রিকার ক্ষেত্রে চিনুয়া আচেবে, নগুগি, ক্যারিবিয়ান কবি ডেরেক ওয়ালকট এবং ইন্ডিয়ান লেখিকা অনিতা দেশাই-এর লেখায় উত্তর ঔপনিবেশিক সাহিত্যের পরিণত রূপের সন্ধান পাওয়া যায়। নগুগির কথায় প্রতিধ্বনিত হয়েছে ইউরোপের চৌর্যবৃত্তি এবং আফ্রিকার যা যা করা জরুরি : "In the eighteenth and nineteenth centuries Europe stole art treasures from Africa to decorate their houses and museums; in the twentieth centurey Europe os stealing the treasures of the mind to enrich their languages and cultures. Africak needs back its cconomy, its politics, its culture, its languages and all its pattriotic writers."

এতসব পরেও বলা যায় উত্তরাধুনিকতাবাদ স্পষ্ট হতে সন্দেহ থেকে যায়। আমরা আগেই বলেছি, এ নিয়ে পশ্চিমে যেমন, তেমনি আমাদের বাঙ্গালি চিন্তকদের মধ্যেও রয়েছে নানা বিতর্ক। পশ্চিমে কেউ কেউ 'ইজ দেয়ার অ্যা পোস্টমডার্নিজম? শিরোনামে গ্রন্থও রচনা করেছেন। আমাদের দেশেও অনেক লেখক-বুদ্ধিজীবী পোস্টমডার্নিজম-এর কোনো অর্থ

Dhaka University Institutional Repository

খুঁজে পান না। এসব নিয়ে কথা আরো বাড়তেই পারে। তবে সেসব বিষয়ে আলোচনায় না গিয়ে এটুকু শুধু বরা যায় যে, পোস্টমডার্নিজমকে মাহমিলনের সড়ক হিসেবে ভাবা যায়। পোস্টমডার্নিজম-এর কথা বাতাসে ভাসতে শুরু করলেও সে-বিষয়ে আমার নিজের আগ্রহ এখনো সামান্যই। সময় অনুভবের দরজায় কীভাবে ধরা দেবে, সেটি আমাদের সমূহ প্রস্তুতির বিষয়ও বটে।

Z_¨mÎ:

১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'আধুনিক কাব্য' সাহিত্যের পথে' কতকাতা ১৪১৪

2. Astradur Eysteinsson æThe Concept of modernism" Cornell University Press-1990

3. Nial Lucy, Postmodrn Literary Theery : Abn Introdiction blackwell_ 1997

4. J. A. Cuddon `Dictionary of Literary Ferms Ans Litrary Theorey 1999

5. Peter Barry, Beginning Theory, New York 1995

6. Michael parket & Roger Starkey Posteolonial Literatures, London_ 1995

7. An Outline of American Literature, USIA 1989

8. Ihab Hasan, The Dismembennet of Orpheus : Towards a Postmodern Literature Madison, 1982

9. Ngugi wa Thiog'o, Decolonising the Mind, Zimbabwe, 1987

১০. সমীর রায়চৌধুরী, 'উত্তরাধুনিক প্রবন্ধ সংগ্রহ, কলকাতা বইমেলা০২০০২

১১. অঞ্জন সেন 'সাংস্কৃতিক বয়ান : উত্তর আধুনিকতা বা সংশ্লেষণবাদ, ১৯৮৯

Dhaka University Institutional Repository

L) evsjvq AvaywbKZvev‘ †_‡K DËivawbKZvev‘

ইউরোপে শিল্প বিপ্লবের ফলে যে আধুনিকতার উদ্ভিব ও বিকাশ হয়েছিল, এ সত্য আজ সর্বজনস্বীকৃত। এক সময় আধুনিকতা সারা পৃথিবীর মানুষের কাছে বয়ে এনেছিল মানবমুক্তির বানী; এজন্যই আধুনিক সমাজকে কেউ কেউ আলোকপ্রপ্তির যুগ বলে অভিহিত করেছেন। তারা বিশ্বাস করতেন, আধুনিকতার পথ ধরেই মানব সমাজ এগিয়ে যাবে উন্নতি ও অগ্রগতির দিকে এবং এক সময় লাভে করবে ‘ক্রমমুক্তি’। এই আধুনিরক যুগেই দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্প, সাহিত্য, মনস্থত্ত্ব, নৃতত্ত্ব ইত্যাদি বিষয়ে বিস্ময়কার অগ্রগতি সাধিত হয়। এ কালেরই একটি শ্রেষ্ঠ চিন্তার নাম মার্কসবাদ। আধুনিকতাবাদের উদ্ভব ও বিকাশের কালে পাশ্চাত্য যেভাবে এই ভাবনাকে স্বগত জানিয়েছে ইউরোপের পদপিষ্ট কলোনির মানুষজন এই চিন্তাকে সে ভাবে গ্রহণ করেনি। পৃথিবীর অসংখ্যা মনীষীর সাধনার ফলে যে পরাআখ্যানগুলো (Metanarrative) গড়ে উঠেছিল সভ্যতার উজ্জ্বল স্মারকস্তম্ভ হিসেবে, তা যে কত অন্তঃসারশূন্য ও ভঙ্গুর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সেটাই আমাদের চেখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিল। স্বৈরশাসক হিটলার ও তাঁর বর্বর বাহিনী যে কতটা সূচিন্তিভাবে ও ঠান্ডা মাথায় প্রায় পঁচাত্তর লক্ষ ইহুদিকে বন্দিমিরিরে খুন করেছিল, তা ভাবলে এখনো আমাদের গা শিউরে ওঠে। যে জাতির ভেতর গ্যাটে, কান্ট, মার্কস কিংবা আইনস্টাইনের মতো মনীষীর জন্ম হয়, সেখানে হিটলারের মত একজন বর্বর দানোবের জন্ম হয় কীভাবে? সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত রাশিয়ায় কত মানুষ যে রাজনৈতিক কারণে রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ হয়ে গিয়েছিল,তা ভাবলে অবাক হতে হয়। অন্যদিকে তথ্যকথিত গণতান্ত্রিক স্বর্গভুমি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রাচ্যের একটি দেশ জাপানে পরপর দুটি পারমানবিক বোমা বর্ষণ করল ১৯৪৫ সালে কতটা অনায়াসে! বলা বাহুল্য যে, উপরের সবগুলো বর্বর কাজই বিশেষ বিশেষ দর্শনের দ্বারা বহুলভাবে সমর্থিত হয়েছিল তখন। এই যদি পাশ্চাত্য সভ্যতা, অর্থ্যাৎ আলোকপ্রাপ্তি ও আধুনিকতার আসল স্বরূপ হয় তাহলে তার প্রতি বিবেকবান মানুষ আস্থা রাখবে কীভাবে?

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরপই পাশ্চাত্তোর কোনো কোনো মহল একথা বলতে লাগল যে, আধুনিকতার কাল শেষ হয়ে গিয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ গোটা মানবজাতিকে এক ভয়ংকর পরিনতির সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে।

C.Wright Mill ১৯৫৯ সালে প্রকাশিত তাঁর The sociological Imagination গ্রন্থে এ জাতীয় কিছু রূঢ় মন্তব্য করেন। তিনি আরো বলেন, আধুনিকতার আলোকপ্রাপ্তির আবেদন আর সমাজতন্ত্রের ধারণা বিপর্যস্ত মানবজাতিকে আজ আশ্রয় দিতে অপারগ। রাইট মিলোর এই মক্তব্যের

সঙ্গে জার্মান দার্শনিক ফ্রেডারিক নীৎসের (১৮৪৪-১৯০০) দর্শনের একটি গভীর সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। পরম, ধর্ম, সদাচার, খ্রিস্টবাদ সব কিছুই নীৎসে আক্রমণ করেছিলেন। নীৎসের রচনার সঙ্গে যেমন, তেমনি অস্তিত্ববাদী দার্শনিক হাইডেগারের (১৮৮৯-১৯৭৬) রচনাবলির সঙ্গেও পোষ্ট মর্ডার্ন চিন্তা-চেতানার গভীর সাদৃশ্য লক্ষণীয়। অন্যদিকে জার্মান তাত্ত্বিক জার্গেন হ্যাবারমাস (Jurgen Habermas) ১৯৮০ সালে আধুনিকতা একটি সমাপ্ত প্রকল্প নামে একটি অভিসন্দর্ভ প্রকাশ করেন এই প্রবন্ধে তিনি আধুনিকতার পক্ষে জোড়ালো সমর্থন ব্যক্ত করেন এবং বলেন যে, এর দ্বারাই বর্তমানে সমস্যার সমাধান করা সম্ভব। এতে তিনি সত্তর দশকের উত্তর কাঠোমো বাদী ভাবুক জাক রেিদা ও মিষেল ফুকোর সমালোচনা করেন। কারণ এই দু'জন চিন্তাবিদ আলোক পর্বের আধুনিকতাকে যেহেতু সমালোচনা ও প্রত্যাখান করেছিলেন।

হ্যাবারমাসের বিবেচনায় এইভাবে এ দু'জনতরুণ রক্ষণমীল ভাবুক সত্যানুসন্ধানের পথ থেকে স্বেচ্ছায় বিচ্যুত হয়ে পড়েছেন। জা ফ্রাঙ্কো লিওতার ১৯৮২ সালে প্রকাশিত হয় তার একটি প্রবন্ধে হ্যাবারমাসের বক্তব্যকে অগ্রহণযোগ্য পশ্চাৎমুখী ও বাস্তবতা-বিবর্জিত বলেন। প্রবন্ধটি তিনি শুরু করেন এ ভাষায়। I have read a tinker of repute who defends modernity against those he calls the neo-cones votives. Under the banner of Post–Modernism, the latter would like, he believes to get rid of the uncompleted Project of Modernism, that of the Enlightenment.

তাঁর মতে, হ্যাবারমাস শৃঙ্খলা, একতা ও নিরাপত্তার দোহাই দিয়ে সব ধরনের শৈল্পিক পরীক্ষ-নীরিক্ষার অবসান ঘটাতে চান। এবং আঁভাগার্ডের (avant-gardes) ঐতিহ্যিক উত্তরাধিকারের বিনাশই তাঁর কাম্য। লিওতার বিশ্বাস করেন, হ্যাবারমান আধুনিকতার যে, প্রকল্পটি সচল রাখতে চান তা অসলে খ্রিষ্টবাদম মার্কসবাদ এবং বিজ্ঞানবিষায়ক একটিতথাকথিত মিখ ছাড়া আর কিছুই নয়। এছাগা পরাআখ্রানগুলি আসলে জাতিসমূহের বিরোধও পৃথকত্ব দমনের উদ্দেশ্যেই যে চাতুর্যের সাথে রচিত হয়েছে, তা বলাই বাহুল্য। কাজেই পরাআখ্যানগুলির প্রতি অবিশ্বাস থেকেই যে উত্তর আধুনিকতার উদ্ভব হয়েছে, এমনটাই লিওতারের ধারণা । এ বিষয়ে আর একজন মহান তাত্ত্বিক হলেন সমকালীন ফরাসি লেখক জাঁরোদ্রিলার। তার বিখ্যাত গ্রন্থ Simtdations ১৯৮১ সালে ফরাসি ভাষায় রচিত হলেও ১৯৮৩ সালে ইংরেজিতে অনূদিত হয়। প্রথম দিকে তিনি মার্কসবাদ ও অবয়ববাদের পথ ধীরে ধীরে অগ্রসর হন। এবং শেষ পর্যন্ত নাস্তিকবাদে গিয়ে থিতু হন। তিনি পোষ্ট-মডার্নিটির ছায়া দেখেছেন জীবনের অর্থহীনতায় নিশ্চেষ্টতায়, অস্তিত্বের নিঃশেষিত অবস্থয়

Dhaka University Institutional Repository

ইতিহাস কিংবা আত্মানিষ্ঠার সমাপ্তিতে । তাঁর মতে সবকিছুই প্রদর্শিত হচেছ অশ্লীলভাবে, ঘুরছে অনিঃশেষ গতিতে শূ ণ্যতায় এবং এগুলোর ্পর কারোরই কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। তিনি গভীর মনোযোগের সংঙ্গে লক্ষ করেছেন, আমাদের জীবনে কম্পিউটার, চলচ্চিত্র, টেলিভিশন কিংবা বিজ্ঞাপন প্রতিনিয়তই কল্পনা ও বাস্তবের মধ্যে পার্থক্য ঘুচিয়ে দিতে সচেষ্ট রয়েছে। এভাবে আমরাআমাদের চারপাশে অর্ষখ্য ধান্দা সৃষ্টিকারী প্রতিমুর্তি (Simulacrum) দেখতে পাই। এই যে অধিবাস্তব (Hyper Beality) আমাদের চারপাশে ঘূর্ণায়মান তার মাঝখানে বেঁচে থাকতে গিয়ে আমরা আজ আর সত্য কিংবা প্রকৃত বাস্তবকে খুঁজেপাবো না । এই অধিবাস্থবতার জগৎকেই আমরা আজ আর সত্য কিংবা প্রকৃত বাস্তবকে খু৭জে পাবো না। এই অধিবাস্থবতার জগ॥কেই রোদ্রিলার পোষ্ট-মর্ডান পৃথিবী বলেছেন। রোদ্রিলার বলেন,১৯৯১ সালে ইরাকে কোন যুদ্ধ হয় নি যা আমাদের দেখানো হয়েছে তা আসলে টেলিভিশনের কারসাজি মাত্র। তাঁর এই মন্তব্যটি নিঃসন্দেহে আমাদের বোধের উপর সরাসরি আঘাত করে। তিনি একসাথে বলতে চান যে, আজকাল উন্নত প্রযুক্তির সহায়তায় যে সব ছবি তৈরী হয় ও আমাদের দেখানো হয় সেটাই আমরা বাস্তবের প্রতিচ্ছবি বলে মেনে নিতে বাধ্য হই। অর্থাৎ আমরা এমন একটা অধিবাস্তব পৃথিবীর মধ্যে ঢুকে পড়েছি সেখান থেকে বেরিয়ে এসে বৃহৎ বাস্তব পৃথিবীর সংগে সংযোগ স্থাপন করা আজ আর আমাদের পক্ষে সম্ভব নায়।এর ফলে আমাদের জগতে সত্য, বাস্তব ও প্রেমের মৃত্য হয়েছে।

পোষ্ট-মর্ডান চিন্তাপ্রপঞ্চ যে সব মনীষীর কাছ থেকে পুষ্টি ও রস সংগ্রত করে নিজেকে সমৃদ্ধ করেছে তারা হলেন প্রাক দেরিদ্য মিশেল ফুকো ও রোলাঁ বার্ত প্রমুখ। এছাড়া বিভিন্ন ঘরানার রাজনৈতিক আলোচক নারীবাদী চিন্তক, পোষ্ট-কলোনিয়াল ভাবুক, ভাষাতাত্ত্বিক ও মনঃসমীক্ষকরাও এই আলোচনায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অংশ নিয়েছেন নিজ নিজ সামর্থ অনুযায়ী ফলে স্বল্প সময়ের মধ্যে এই ভাবনার প্রভাব সাহিত্য, দর্শন, চিত্রকলা ও স্থাপত্যকলায় অনুভুত হতে থাকে। সুইম ভাষাতাত্ত্বিক ফার্দিনান্দ দ্য সসুর (১৮৫৭-১৯১৩) মনে করেন ভাষা হলো স্বশাষিত প্রভেদক চিহ্ন দ্বারা গঠিত একটি পদ্ধতি ; একটি চিহ্নায়ক (Signifier) এবং চিহ্নয়িতের (Signified) মধ্যে এখানে প্রতিনিধিত্বমূলক সম্পর্ক ক্রিয়াশীল। যেমন ‘পাখি’ বলতে যে ধ্বনিটি আমরা শুনি তা হলো চিহ্নায়ক; ধ্বনিটি ‘পাখি’ সম্পর্কে যে ধারণা আমাদের মধ্যে তৈরী করে তা হলো চিহ্নয়িত। এভাবে চিহ্নয়িত ‘পাখি ধ্বনিটি আমাদের মধ্যে যে ধরণা তৈরী করে তা ‘মানুষ’ কিংবা ‘বৃক্ষ’ বিষয়ক ধারণা নয়। সসুব মনে করেন, ভাষাই রচনা করে আমাদের পৃথিবী। সমাজে প্রচলিত ভাষার আন্তর শৃঙ্খলাকে তিনি নাম দিয়েছেন (Langue) আর ব্যাক্তির উক্তি তথা ব্যবহৃত ভাষার

নামকরণ করেছেন Parole । তাঁর মতে, ভাষা হলো প্রথার দ্বারা আবদ্ধ সম্বন্ধের নাম এবং ভাষার প্রতীকগুলো অযৌক্তিক।

অবশ্য অবয়ববাদী ভাষা দার্শনিক রোলাঁ বার্ত (১০১৫-১৯৮০) মনে করেন ভাষা বাস্তব জগৎকে ফুটিয়ে তুলতে পারে না এবং তা জ্ঞানকে বিকৃত করে। অবশ্য জীবনের প্রথম দিকে শহরের রাস্তা, যন্ত্রযান, পোশাক, পুতলি , অভিনেত্রীর মুখভঙ্গি, কুস্তিখেলা, আলোকচিত্র সবকিছুই তিনি ভেবেছেন চিহ্নয়াক। এসবের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করে বিশ শতককে তাঁর প্রাচীন পথিক গির্জার মত রহস্যময় মনে হয়েছে।

ফরাসি দার্শনিক তার দেরিদা ১৯৬৬ সালে জন হপকিস বিশ্ববিদ্যালয়ে Stricture Sign and Paly in the Discourse of the Human Sciences `এই শিরোনামে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ প্রদান করেন। এতে তিনি প্রচলিত মূল্যাবোধ প্রথা-বিশ্বাস ও অধিবিদ্যাতে আক্রমন করেন। দেরিদার লেখা উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে Specch and Phenomena Phenomena OF Grcimatology এবং Writing and difference বাস্তত তিনি অধিবিদ্যাকে আক্রমণ করে বর্তমান সভ্যতার অন্তঃসাবশুণ্যতার রূপই আমাদের চোখের সামনে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন। পৃথিবীর তাবৎ মহৎ চিন্তাপ্রপঞ্চের নামই অধিবিদ্যা (Metaphysics) যা যুগে যুগে মানুষকে দিয়েছে আশ্রয়। চূড়ান্ত বিচারে এগুলি এক একটি কল্পজগৎ মাত্র যা রচিত হয়েছে ভাষার দ্বারা । ভাষার দ্বারা নির্মিত যে সব শক্তিশালী ডিসকোর্স পশ্চিমা দর্শনে স্থায়ীভাবে ঠাঁই লাভে সমর্থ হয়েছে, ভাষার ভেতরে নেমে ভাষার শক্তি দিয়েই তাকে প্রতিহত করার কথা বলেছেন জাক দেরিদা; এরই নাম বিনির্মাণ (Deconstruction) । দেরিদা মনে করেন, শব্দ ও তার অর্থের সমএন্ধ যেহেতু খুব জটিল তথা গোলমেলে ফলে সত্যকে জানার ভাষাগত সহজপথ আর নেই। তাছাড়া সমাজের পরিবর্তনশীলতার কারণে শব্দের অর্থ তো প্রতিমুহূর্তে বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে- ফলে শব্দের একমাত্র অর্থ বলে কিছু নেই। যে সব রচনা লিখিত অবস্থায় রয়েছে তার ভেতরে নেমে অনুসন্ধান চালিয়ে রচনাটির অন্তগর্ত দ্বন্দ্বসমূহ খুঁজে বের করতে হবে। তাহলে আমরা জানতে ও বুঝতে পারব যাকে আমরা প্রগতিশীল বলে ভাবছি তিনি আসলে নারীবিদ্বেষী কিংবা ধর্মান্ধ। বস্তুত দেরিদার ঐকান্তিক চেষ্টার ফলে শেষ পর্যন্ত পাশ্চাত্য দর্শন অঘিধবিদ্যার যুগান্তকারী প্রভাব থেকে খানিকটা হলেও মুক্ত হতে পেরেছে। পরবর্তীকালে দেরিদার এই বিনির্মাণ তত্ত্বটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ব্যাপক প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হয়ে। ওখানে যারা এই তত্ত্বটিকে সম্প্রসারিত করেন তারা হলেন পল দ্য মান জেফ্রি হার্টমানম জে হিলিস মিলার এবং হ্যারল্ড ব্লুম প্রমূক। বিগত শতাব্দীর আংশির দশক থেকে

বিনির্মাণবাদের প্রভাবে গিয়ে পড়ল নারীবাদী চিন্তাবাদী চিন্তার, উত্তর ঔপনিবেশিক ডিসকোর্সে, নব্য-,মার্কসবাদী সংস্কৃতি ব্যাখ্যায় এবং মনঃসমীক্ষণমূলক আলোচনায়। এই চিন্তা প্রপঞ্চগুলো শেষ পর্যন্ত গিয়ে মিলিত হলো পোস্ট-মর্ডান ডিসর্কোসে,চূড়ান্ত পর্যায়ে নদী যেমন গিয়ে মেলে সমুদ্রে।

বিগত শতকের একজন বড় চিন্তক প্রখ্যাত ফরাসি দার্শনিক মিশেল ফুকো (১৯২৮-১৯৮৪) তাঁর লেখা The Order of Things (১৯৬৬) গ্রন্থ শেষ কয় লাইন সভ্যতা নির্মাণকারী মানুষের।

আধুনিকতাবাদ, স্বাধীনতা ও আধুনিকতা ফিরিয়ে আনার প্রধান এই সবই অভেদ বিবেচনার বিভিন্ন পরিসর; বাংলাদেশেল পোষ্ট মর্ডান বাংলা কবিতা আধুনিকতার একরৈখিক যুক্তিকাঠামো থেকে সরে যেতে চাইছে বহু স্বরিককতার দিকে যেখানে ছড়িয়ে এছ অনন্ত বৈচিত্র্যময় এক বিপুল পৃথিবী, যার পরতে পরতে যুগ্মরূপের হাতছানি উদ্ভিদ ও প্রাণীজগতের দ্বৈরাজ্য, জড় ও অজেড়র দ্বিবাচনিকতা, স্থাবর ও জঙ্গমের যুগ্মরূপ। আধুনিকতায় প্রশ্রয় পেয়েছিল মানবতন্ত্র, অধুনাস্তিকতা সেখানে উদ্ভিদ, পতঙ্গ, আসবাবসহ সকলের প্রতি সমান গুরুত্ব দিচ্ছে। একারণে তাদের রচনায় কবিতায় ভাষাও পাল্টে গেছে অনেকখানি। বলা বাহুল যে, সমাজ পরিবর্তনের সাথে সাথে কবিতার ভাষা ও আঙ্গিকও যে ধীরে ধীরে পাল্টে যায়, এতো আমরা সবাই জানি। সমাজতত্ত্ব, মনোবিজ্ঞান, ইতিহাস, জ্যোতিমি, ভুগোল, ভূতত্ত্ব, বিজ্ঞান ইত্যাদি বিভিন্ন এলাকার শব্দ এখন নির্বিচারে ব্যবহৃত হচ্ছে পোস্ট মর্ডান কবিতায়। কবিতায় ব্যবহৃত শব্দের পারস্পরিক সম্পর্কও পাল্টে গেছে অনেকখানি। এই কবিতায় কোথাও গুরুত্ব পেয়েছে আয়রনি, কোথাও প্রান্তিক মানুষের জীবন, কোথাও প্যারোডি কিংবা বিজ্ঞান। তবে যেটা লক্ষণীয় তা হলো এই যে, এই ভাষা কোনোক্রমেই একমুখী নয়। পোষ্ট মর্ডান কবিরা গতানুগতিক ছন্দের নিয়ম মেনে এখন আর কবিতা লিখতে আগ্রহ বোধ করেন না। ফলে আধুনিকক কবিতার ভাষা থেকে এই ভাষা অনেকটাই পৃথক। কবিতার ভাষা ও বোধের জগতে এই যে আমুল পরিবর্তন ঘটে গেছে একেই পশ্চিমে বলা হয় Parahigm shit অবশ্য এরা কেউ কেউ আধুনিক কতিবার প্রভাব বলয় থেকে এখনো যে পুরোপুরি দেখিয়া আসতে পারেন নি, একটু মনোযোগ দিয়ে লাভ করলে সেটাও আমরা দেখতে পাবো। এবং এটটা মোটেও অস্বাভাবিক নয়।

বাংলাদেশে আশির দশকে কবিতায় তরুন যখন পোষ্ট মডার্ন কবিতা লিখতে শুরু করেন তখন বাংলাদেশে জেনারেল এরশাদের নেতৃত্বে সামরিক বাহিনী এদেশে রাষ্ট্রক্ষমতা স্বল্প আয়াসেই দখল করতে সক্ষম হয়। ফলে সমাজের স্বাভাবিক বিকাশ রুদ্ধ হলেও আন্তর্জাতিক সমাজের সংগে সংশ্লিষ্টতার কারণে সমাজের একাংশের মানুষের জীবন বয়ে গেল কৃত্রিম সচলতার জোয়ার। প্রগতির দিকে ধাবমান সুস্থ ও স্বচ্ছ রাজনীতি, মূল্যবোধ, সংস্কৃতি ও গণতান্ত্রিক প্রথা প্রতিষ্ঠান এতটাই

Dhaka University Institutional Repository

ক্ষতিগ্রস্থ হলো যে, বিবেকবান মানুষ মাত্রই তখন সাময়িকভাবে হতাশা, বিষাদ ও অক্ষকারকেই একমাত্র সত্য বলে ভাবতে বাধ্য হলেন নীৎশে কিংবা হাইডেগায়ের সাংশয়বাদী দর্শন তখন যদি তরুণদের কাছে আকর্ষণীয় বলে মনে হয়, তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। ইতঃপূর্বে এদেশের মানুষ মুক্তিযুদ্ধের আদর্শের মৃত্যুদৃশ্য অসহায়ভাবে চেয়ে দেখেছে। রাজনৈতিক নেতৃত্বের একটা বড় অংশ আদর্শ নির্জন দিয়ে এরশাদের সংগে হাত মেলালেন রাষ্ট্রক্ষমতার খানিকটা উচিছষ্ট লাভের আশায়। জেনারেল এরশাদের সংগে হাত মেলালেন রাষ্ট্রক্ষমতার খানিক উচিছষ্ট লাভের আশায়। জেনালের এরশাদ বৈদেশিক সাহায্য ও রাষ্ট্রীয় সম্পদের অনুদান বিলোতে শুরু করলেন অনুগত মানুষজনের মধ্যে যারা শেষ পর্যন্ত তার রাজনৈতিক দলের সমর্থক ও সদস্য হলো এভাবে দুর্নীতির বিপুল বিস্তার ঘটল গোটা দেশে। এই রাজনৈতিক দুবৃর্ত্তায়নের অনিবার্য পরিণতি হিসেবে সমাজের ভেতর জন্ম হলো সন্ত্রাসের। মুক্তিযুদ্ধের ইহিতাস বিকৃত করার ফলে তরুণ প্রজন্মের অনেকেই আমাদের মহান স্বাধীনতার যুদ্ধের সঠিক ইতিহাস জানতেও পারলনা। অন্যদিকে প্রযুক্তির দ্রুত উন্নতির ঘটার ফলে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রভাব খুব সহজেই আমাদের চেতনার উপকুলে এসে হাজির হলো।

এরকম একটা শ্বাসরুদ্ধকর বন্দিমুহূর্তে সহজেই আমরা কল্পনা করতে পারি। তাছাড়া স্যাঅটেলাইট প্রযুক্তির বিপুল বিস্তার ও এনজিও সমূহের কার্যক্রম আমাদের সনাতন সৃষ্টি ভঙ্গিকে পাল্টে দিল বহুল পরিমাণে। এর ফলে বাংলাদেশের গ্রামগুলো আর আগের মত স্বয়ংসম্পূর্ণ নিস্তরঙ্গ, বিচ্ছিন্ন ও রক্ষণশীল দৃষ্টি সম্পন্ন রইল না। স্যাটেললাইট ব্যবস্থা হচ্ছে বিজ্ঞানের মেন এক চমকপ্রদ ভিত্তি ও পাশ্চাত্য চলচ্চিত্রের অবাধ যীনতা সরাসরি এসে ঢুকে পড়ছে আমাদের ঘরের ভেতরে। এদেশে অধুন্য যারা স্যাঅটেলাইট ব্যবস্থার সুবিধাভোগী তারা অধিকাংশই ইন্ডিয়ান ও ওয়েস্টার্ন সিনেমা, টিভি সিরিয়াল, ফ্যাশন শো, জিঞান, খেলাধুলা, পপ গান ইত্যাদিসহ নানা অনুষ্ঠানের নিয়মিত দর্শক। এছাড়া পাশ্চাত্যের আর্ট ফিল্ম, হিসটরিক চ্যঅনেলও জিএ গ্রাফিক চ্যঅনেলের বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আমরা দেখতে পাভিন্ত নিয়মিত। এর ফলে আমাদের আবহমান দেশীয় সংস্কৃতি যেমন ধীরে ধীরে বদলে যাচ্ছে, তেমনি আমারেদ গণ-মানুষের উপর প্রবল থেকে প্রবল হচ্ছে বিদেশি সংস্কৃতির ঢাল। অবশ্য এই প্রভাবের পুরোটাই যে নেতিবাচক, এমনটা বলা বা ভাবা উচিত হবে না। আমাদের দেশে এখনো গ্রামাঞ্চলে গরুর গাড়ি ও লাঙ্গলের ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায়। এদেশে এখনো তিন ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলিত আছে; মাদ্রাসা শিক্ষা, ইংলিশ মিডিয়াম শিক্ষা ও বাংলা মাধ্যমের শিক্ষা। এছাড়া আমাদের সমাজে উত্তর আধুনিকতার প্রভাব সব কিছুকে ছাপিয়ে উঠতে পারেনি বলেই অনেক এলাকায় আধুনিক উৎপাদন ব্যবস্থা ও উৎপাদনের সম্পর্ক এিখনো

Dhaka University Institutional Repository

টিকে আছে। Late capitalism সবকিছু গ্রাস করে ফেলেছে, এমনটি বলা ঠিক হবে না। এজন্য আমরা দেখি, একদিকে জনপ্রিয় মমতাজের গান, অন্যদিকে পপুলর ব্যান্ড সংগীত; পত্র-পত্রিকায় আধুনিক কবিতার পাশেই ছাপা হয় পোষ্ট মডার্ন বাংলা কবিতা।

আমাদের আশির দশকে পোসট মর্ডান ধারার যে সব তরুন কবি কবিতা লিখেন। ভূমিকা পালন করেছিলেন তারা হলেন ফরিদ কবির, মনির চৌধুরী, বাত্য রাউস মুমিসর মোহেনী, মতিয়ার রাফায়েল, দগীপকের মাহমুদ, সাজ্জাদ শরিফ, সুব্রত অনাস্টিন, খোন্দকার আশরাফ হোসেন, মাসুদ খান, আবু সাঈদ ওয়ায়দুল্লাহ প্রমুখ। তাদের সকলের লেখার ভেতর অবশ্য একই ধরনর মনোভঙ্গি কিংবা ধারণা প্রকাশিত হয়নি। কেউ পাশ্চাত্যের ধঅরটিকে গ্রহনীয় মনে করে শূন্যতাকেই করেছেন কাব্যের বিষয়বস্তু আবার কেউ স্বদেশ, মাটি ও মানুষের কাছে দায়বদ্ধ থেকে লিখতে চেয়েছেন উত্তর-আধুনিক কবিতা। আবার কখনো একই কবির মধ্যে, বিভিন্ন সময়ে লেখা বিভিন্ন কবিতায়, এ দুই মনোভঙ্গি তথা মানসিকতার প্রকাশও দেখতে পাই। বাংলাদেশে পশ্চিমের পোস্ট মর্ডার্নিজমের সাসবস্তুরকেই মান্যতা দিয়ে বরণ করতে চেয়েছেন তরুন তাত্ত্বিক মঈন চৌধুরী ও সালাউদ্দিন আইয়ুব। অন্যদিকে দেশজ ভাবনার সংগে আন্তর্জাতিকতাকে মেলাতে চেয়েছেন খোন্দকার আশরাফ হোসেন। তত্ত্বগত দিক থেকে তিনি বাংলাদেশ টেরি ঈগলটনের অনুসারী। নব্বুইয়ের দশকে যে সব কবি নতুন স্বরে ও ভঙ্গিতে কবিতা লিখতে সচেষ্ট হয়েছেন তাঁরা হলেন বায়তুল্লাহ কাদেরী, ওবায়েদ আকাশ, তুষার গায়েন, রাকিবুল হক ইবন, রাশেদ মিনহাজ প্রমুখ। আশি ও নববই দশকের কয়েকজন কবির কবিতা থেকে কিছু পংক্তি আরা নিচে উদ্ধৃত্ত করছি:

১. সারাদিন বিভিন্ন রকম হাওয়া বর। হাওয়া।
অনেক দূরেরর দেহে, দুর মেরুরেখায় শোষিত হয়ে হয়ে
আজ পূর্নমুক্ত হচ্ছে এখানেম, এখন
এই মধ্যপ্রকাশ অঞ্চলে।
গোরকের ওই পার থেকে আনে হাওয়া
প্রতিটি বিভাগ আর দিবস রাত্রির দেহে দেহে
স্থির হয়ে আছে।
একদিন সম্ভবত আন্থার অচেনা এক বায়ু প্রবাহের
মধ্যেই মুদ্রিত হয়ে রবো। তার বেশ আগে

আমাদের অসম্পূর্ণ রোধ,

আমাদের অশেষ করে দিয়ে বায়ু বয়ে যায়।

নদীকুলে বংশপরম্পাক্রমে, আমার পুত্রের, তার পুত্রের এবং দৌত্রের

বহুচুল এলামেলো করে দিয়ে

রকমারি, রৌদ্র আর মরু বালুকার মধ্র দিয়ে বয়ে যাওয়া গৌণ সংবাদের মতো

বায় বয়ে যায়।

মৃদু মৃদু, গম্ভীর, বিশিস্ট ভাবমূর্তি সহকারে।

(হাওয়া, মাসুদ খান)।

২. সব কিছু আজ জটিলতার সরব স্বাক্ষরে স্তব্ধ হয়ে আছে। আমাদের ঐ যে বাগান সেখানেও আজ দেখি অসংখ্য রূপক, শুধু কল্পনা করে ছোয়া যায় তাকে বাস্তবে পরিহাস। তাই আমার চিন্তা করি, ভাবি, ইচ্ছে হলেই তো আর বাগানে ফোটেনা ফুল গিরিপথ বেয়ে নামে না সবুজ স্বপ্নের উল্লাস।

আমরা ভাঙচুর দেখি, বিপরীত দেখি, দেখি আমাদের প্রিয় লাশ। জলের বাগানে সবুজ ইকেও আগুনের প্রতিরূপ বারবার আসে, সান্তনা দেয়, বলে ভালবাসা আলোর মতই অচচুত প্রিয় রূপকের অবভাস।

রূপক শুধই রূপক হলেও বাগানে রায়েছে সুখ। তাইতো এখানো আমরা ওখানে আমরা হলাম বাগানেরক্রীতদাস।

(রূপক- মঈন চৌধুরী।)

৩. একটি বাড়ির দিকে উকি দিলো আরেকটি বাড়ি

ভেতরে মানুষ নেই, সিগারেট ঠোটে

বসে আছে জানালার কাচ

বুক শেলফ হেটে গেলো গয়মন্ত চেয়ারের দিকে-

দুলছে চেয়ার

Dhaka University Institutional Repository

(বাড়ি- ফরিদ কবির)

৪. বলো ওগো প্রতিবেশী ফুল

হাওয়াতোমার কি সন্তান?

তার অবোধা সাজতে

প্রাণে জ্বলে ওঠে আরো প্রাণ

তুমি নর্তকীসমুদ্রায়

কেন দিচ্ছ অপ্রণামী?

কেউ বুঝি না তো এই রাতে

তুমি তুমি নাকি তুমি আমি

তবু ভুলোগলের সিলেবাসে

আজও একথা পড়ানো হয়:

এই রাতজাগা উচু গ্রামে

হাওয়াপ্রসঙ্গক্রমে বয়

(প্রতিবেশী- সাজ্জাদ শরিফ)

৫. আমার টেবিলজুড়ে একান্নাটি বই,

তার কোনোখঅনে মাছরাঙা পাখিটা কথা নেই,

না, আমার নগর নিসর্গের কোথাও কোনো শাচরাঙা

কৃষ্নীর পোশাকের মৎস্যমন্য ধ্যানী

বসে নেই কোনো আগডালে

তার লাল তীক্ষ্ম ঠোট মরিচ ফুলের রঙ ঝুটি

আমার এ জানালার নদি নেই নগরীর একপাশে

যদিও বা পানাফুল কন্টকিত বন্দি স্রোতোধারা

আছে বলে জনশ্রুত অনেক শুনেছি।

Dhaka University Institutional Repository

(মাছরাঙা-= খোন্দকার আশরাফ হোসেন)

৬. নিশির ডাকের মতহ একটি মাছ

আমার রক্তের মধ্রে চলাফেরা করে

বড়শী ফেলে চুপচাপ বসে থাকি

চতুর মাছটি গেলেনা আমার টোপ

সকাল বিকাল সন্ধ্যা কাটে

রাত্রি হলে চাঁদ ওঠে

জ্যোৎস্নায় নিজেই

নিজের বড়শীতে গেঁথে যাই

বড়ীশতে দেঁথে বাড়ি ফিরে

বাটনা বাট্টা হয় কোটানা কোটা হয়

কে যেন আমাকে তপ্ত বাড়ইয়ে ভেজে

মচমচ চিবিয়ে চিবিয়ে খায়

রাত্রি শেষে উপরে দেয় সকালের রৌদ্র একটি বিড়াল ভাজা মাছ উলটে খাকে বলে

সাধারণ গিছে পিছে লেগে তাকে।

(মাছ- দীপঙ্কর মাহমুদ)

৭. যেসব ঘোড়ার ফিরে এসেছিল, তাদের সঙ্গে চরণভূতিতে দাড়িয়ে

মনে বৈখল্য আমার অবসেশন। আমি রবি আমার কোনো ভাষা নেই। আমার

শুধুই ফানক্ষেপ। ভদ্রলোকেরা বউরাা দায়িড়ে পড়ে। হাসে। ফটাফট বাদাম ছুড়ে

দেয়। দীর্ঘ আর লালছে স্বামীদের ধরে ঝটকা মারে। চোখ যাবে! এই, তোমার

হর্সপাওয়ার কত গঃ

(স্যানন্টারিয়ার- প্রাত্য রাইসু)

৮. যে ভালোবাসাতে জানে না

তাকে ভালোবাসা দিয়েই

বালোবাসা শেখাতে হয়।

ভালোবাসলে

পাথরও পেতে পারে উর্বরতা

তাতেও ফোটে ফুল

হয়তো গোলাপ নয়,

পাথর চাঁপা।

(পাথরচাঁপা- শামসুল আরেফিন চৌধুরী)

৯. কবিতাসন্দ্যা আজ আমার একক

বনের জরায়ুতে দেওড়ায় মাঠের ছেলেবেলা। মহীরুহ

বীজ হাতে চাষীরা ফিরতি পাখ আবিস্কার করে,

গাছে একটি দুটি মিং ঝুলে আছে?। তোমার। আমার।

মহাপৃথিবীর আজও লাশ ওভঅবে। ওলপকে শুয়ে।

আয়না দেখি একটি সম্পূর্ণ। আয়নাটা ভেজা। বনেরসিংহ দরজামুথ ঘেষে

পেশাদারী ভঙ্গিতে বসা।

ঐ তো আমি। না। অন্য কেউ। আরেকখানা।

মাটির ভাঁড়েতে অতই নীলিমা।

(কে- রাকিবুল হক ইবন)

১০. কিছু কথা গ্রামগঞ্জে ফলে। পাথর নিয়ে অতিরিক্ত কথাগুলো থেকে গেল

আঞ্চলিক ভাষায়। ভেবেছি পাথর শানানো গায়ে কিছু কিছু কৈশোরিক

বিচরণীশীল পা মুছে গেল কিনা।.... এবার মেঘবৃষ্টির ঋতুগুলো বরাদ্দ হলে

ইলিশের মৌসুম ধরে তোমাদের বেড়াবার প্রসঙ্গে যতার্থ ভেবেছি।

তখন তো ধোঁয়া ওটা জলে ভোরের বর্ণনা এলে ব্রিজের তলায় নেমে

Dhaka University Institutional Repository

পাথর সংকান্ত জটিলতাগুলো নিরীক্ষণ করি। প্রচন্ড বরতাময় স্রোতে

মাছেদের ঠোট ঠোটে পাথর সংক্রান্ত কথাগুলো জরুরী হতে ওঠে।

(পাথর সংক্রান্ত আঞ্চলিক কথাগুলো- ওবায়েদ আকাশ)

উপরে বর্ণিত উদ্ধৃতিগুলোর কোনো কোনোটির ভেতরে আধুনিকতার একমুখী ধারাটি প্রবহমান, আবার কোথাও দৃশ্যমান হয়েছে পোস্ট মর্ডান পৃথিবী কিংবা মুক্তি ফাটণের অচেনা এবং। সমাজ বিবর্তনের ধারায় কবিতার আঙ্গিক, ভাষা ও বিষয়বস্তুও যে পাল্টে যাবে কালের দাবিতে, এটাই তো স্বাভাবিক। এই পরিবর্তনের বিরুদ্ধে দাড়িয়ে যারা কথা বলবেন, সময় তাদের সমর্থন জানাবে না। উপরে বর্ণিত অনেক গুলো লেখার মধ্যে আমরা বহুরৈখিক ও বিদিশাময় কে নতুন জগৎ অঙ্কিত হয়েছে দেখতে পাই।

Dhaka University Institutional Repository

M) evsjv fvlvq AvaywbKZvev‘x mwnZ¨ Av‡›‘vj‡bi Ae‘vb

বাংলাভাষায় আধুনিকতাবাদী সাহিত্য আন্দোলনের অবদান অকিঞ্চিতকর নয়। বাংলা কবিতায় আধুনিককতাবাদী ধারণার যারা জন্ম দিয়েছেন, তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন বুদ্ধদেব বসু (স্বগত সংলাপ, বুদ্ধদেব বসু শতবর্ষ সমিতির তত্ত্বাবধানে সংকলিত গ্রন্থ, পৃ. ১৪৬)। আধুনিকতাবাদী আন্দোলনের ফলে ইতিবাচক পথরেখা পরিচালিত হয়েছে তেমনি ‘ভুল প্রচারনারও দেখা মিলে। (যায় যায় দিন, ঈদ সংখ্যা, সেপ্টেম্বর, ২০০৯) পৃষ্ঠা. ২৭১। যা কিনা পরবর্তীতে বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের কবি ও সাহিত্যিকদের বোধ চিন্তা ভাবনাকে দারুণভাবে প্রভাবিত করেছে। আমরা আধুনিকতাবাদীদের সাহিত্য আন্দোলনের ইতিবাচকতার দিকগুলো আলোচনা ক্রমানুসারে করলাম।

GK: আধুনিকতাবাদী সাহিত্যিকগণ বাংলা কবিতা উপন্যাস, গল্পের ক্ষেত্রে বিংশ মতকের পূর্ব শতাব্দীর শ্রেয়োবোধ শান্তি-স্থিতি বর্জন করে নতুন। একটি পথরেখা নির্মান করল। কাব্যের ক্ষেত্রে প্রথম প্রধান তিন নায়ক হলেন জীবনানন্দ দাশ, সুধী নন্দ্রনাথ দত্ত ও সমর সেন, রবীন্দ্রনাথ নজরুল-মোহিতলাল-আচরিত শুভবোধ-কল্যাণবোধ- অসংশয়-বলিষ্ঠতার স্থানে নিয়ে আনলেন নাস্তি, দোলাচল ব্যঙ্গ বিদ্রুপ, অবক্ষয় ও আশাহীনতা।

‘B: রবীন্দ্রনাথ-নজরুলের ঈশ্বরবাধিতা সম্পূর্ণ বিষোঘিত হল। সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায় ঈশ্বরমৃত, জীবনানন্দ, বিষ্ণু দে, বুদ্ধদেব বসু, প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রমুখ ঈশ্বর বিষয়ে থাকলেন নিঃশব্দ, অমিয় চক্রবর্তী মানুষের মধ্যে শেকেই ঐমিকতা’ লক্ষ্য করতে।

wZb: আধুনিকতাবাদীরা বিশ-তিরিশের দেশকে প্রথমবারের মত বাংলা কথা সাহিত্যে একেবারে সাধারন মানুষের স্তরে নেমে আসলেন। নৌকার মাঝি, পাজগাঁর ছেলে, গ্রামের কবিয়াল-এইসব অ-নায়বারাই নায়ক হয়ে উঠল এতদিনে। জসীম উদদীন দীর্ঘ কাহিনী কাব্যকে নতুন করে ব্যবহার্য করে তুলেন তারই কবিতাতে নায়ক নায়িকা হয়ে উঠল গ্রামের সাধারণ মানুষ-মানুষী। বরিশাল, ফরিদপুর বা সাওতাল পরগনার স্থানিকতা কে অতিক্রম করে আঞ্চলিকতাকেও অনেক আধুনিকতা বাদের বোধের দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন জীবনানন্দা দাশ জসীম উদদীন ও বিষ্ণু দে। হিন্দু-মুসলিমের ঐক্যবদ্ধতার কামনা ছিল নজরুল ইসলামের ঘোষণায়, কিন্তু আশ্চর্য অতি স্বাভাবিক ঘোষণা রূপেই যে হিন্দু মুসলমান এদেশে শত শত বছর দরে পাশাপাশি বাস করে আসছে তারই আখ্যানকাব্যিক চিত্ররূপ দিলেন জসীম উদ্দীন। নকসী কাঁথার মাঠ বা সোজন বাদিয়ার ঘাট তারই দৃষ্টান্ত।

Pvi: বাংলা কবিতায় সমাজ-রাজনীতি-চেতনা-নজরুলের ইসলামের দান। নজরুল পরবর্তী ধারায় বাংলা কবিতায় পিয়সী আধুনিক বাংলা কুবিতায় তা এক সম্পূর্ণ নতুন আলোড়ন নিয়ে এল; অমিয় চক্রবর্তী- যে রাজনীতিচেতন কবি বা প্রায়াই প্রচ্ছন্ন থাকে। অ-নাজরুলিক রাজনীতি-সমাজ চেতনা নিয়ে আসেন বিষ্ণু দে, সমর সেন, সুধীন্দ্রনাথ জীবনানন্দ।

cvP: আধুনিক বাংলা কবিতার উত্থানভূমি কলকাতা বটে, কিন্তু আধুনিক বাঙালি কবিগণ গ্রামকের স্পশৃ করে এর সমগ্রতা দিয়েছেন যেমন (জসীম উদ্দীন, জীবনানন্দ বিষ্ণু দে), তেমনি পৃথিবীময় পটভূমি তৈরি করেছেন (অমিয় চক্রবর্তীই) (বিশ্বভ্রামন্ডিত হলেও রবীন্দ্রনাথের কবিতা থেকে আরো স্পর্শময় আরো বিদেশ<-সঘন করে তুললেন।

Qq: রবীন্দ্র প্রবর্তিত পরবর্তীদের অনুবর্তিত লিরিক কবিতাকে এঁরা মূখ্য অবলম্বন করলেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ-নজরুল ও অন্যদের বিস্তারণকে এরা কেলাসিত করে তুললেন। ফলে এঁদের কবিতা সম্পর্কে দুরুহতা-দুর্বোধ্যতার অপবাদ উঠল। সুধীন্দ্রনাথ, বিষ্ণু দে ও অমিয় চক্রবর্তী অনেক অপ্রচলিত শব্দ ব্যবহার করলেন (সুধীন্দ্রনাথ দত্ত তার সপক্ষে লিখলেন, 'শব্দের স্বভাব টাকার মতো... অপ্রচলিত শব্দও অবস্থাবিশেষে কাজে লাগে।)। যে মুক্তি আরাধ্য ছিল আধুনিক বাঙালি কবির, তার জন্যে সবচেয়ে প্রযোজ্য চণ্দ হয়ে উঠল মৃক্তক অক্ষরবৃত্ত ছন্দ– যে ছন্দ আধুনিক বাংলা কবিতায় গত সত্তর বছরের সবচেয়ে ব্যবহৃত ছন্দ। আর প্রবর্তিত হলো গদ্যছন্দ প্রেমেন্দ্র মিত্রের হাতে, সমর সেনের কবিতার প্রায় একমাত্র অবলম্বন, আধুনিক বাঙালির অন্বেষণে এই ছন্দও সর্বার্থসাধক ভূমিকা গ্রহণ করে– গত সত্তর বছরে। গদ্যছন্দ আর মুক্তক অক্ষরবৃত্ত ছন্দ আধুনিক বাঙালি কবির শিল্পান্বেষণের ছন্দ। বিশেষত তিরিশের-চল্লিশের দশকে এবং স্বাধীনা-সার্বভৌম বাংলাদেশে গদ্যছন্দ কবির মুক্তির ছন্দ হিসেবে দেখা দিয়েছে। সুধীন্দ্রনাথ ও জসীমউদ্দীন গদ্যছন্দকে পরিবর্জন করলেও তা বোধ হয় ব্যতিক্রম হিসেবেই গণনীয়। তফাৎ এই অগ্রজদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ গদ্যছন্দের কয়েকটি কবিতাগ্রন্থ রচনা করে শেষ জীবনে এই: অগ্রজদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ গদ্যছন্দের কয়েকটি কবিতাগ্রন্থ রচনা করে শেষ জীবনে ছন্দে ফিরে গিয়েছিলেন ফের; নজরুল ইসলাম গধ্যছন্দকে বিদ্রুপ করে তাঁর একমাত্র গদ্যকবিতাটি লিখেছিলেন; মোহিতলাল মুজমদার রবীন্দ্রনাথের সূত্র ধরে গদ্যছন্দকে ধিক্কার জানিয়েছিলেন এই বলে যে বঙ্গসরস্বতীর উরুড় ইহয়া পড়িতে আর দেরি নাই। আধুনিকদের হাতে পরীক্ষা-সমীক্ষামূলক ছন্দ রচিত হয়েছে ঢের। সংহতির আরাধনা করেছিরেন তিরিশের কবিরা রবীন্দ্রনাথের -নজরুল-আচরিত বাংলা কবিতায় বিস্তারিত কথা বলার ভূমিকার বদলে। এর ফলেই এক-একজনের আকাঙ্খা ও আরধ্য ছিল এক এক রকম।

সুধীন্দ্রনাথ ছন্দধ্রুপদের সাধনা করেন; বিষ্ণু দে ও অমিয় চক্রবর্তী আশ্রয় নেন উল্লম্ফনের; বুদ্ধদেব বসু তাঁর উপান্ত কবিতায় বঙ্কিম প্রকাশরীতি গ্রহণ করেন। চিত্রকল্প, উপমা ও প্রতীক ব্যতীত জীবনানন্দ কোনো কবিতাই রচনা না-করার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেন। সুধীন্দ্রনাথের অপ্রচলিত শব্দ ব্যবহারের মতো জসীমউদ্‌দীন অপ্রচলিত রূপকল্প-দীর্ঘ আখ্যান কবিতা-পুনঃপ্রচলন করন। জসীউদদীনের খণ্ড কবিতাও অনেকসময়ই কাহিনীধর্মী। অন্যেরাও ছোট কবিতায় অনেক সময় অনুভূতিপুঞ্জে, অভিজ্ঞতাপুঞ্জকেই রূপ দিয়েছেন প্রধানত, একই সময়ে কাহিনী বা জীবনের গল্পকে কবিতা করে তুলেছেন। বাঙালির আধুনিকতার অন্বেষণে কবিতাকেও বাঙালি কবি জীবনের সমগ্রতার প্রতিস্পধী করে তুলেছেন। বাঙালির আধুনিকতার অন্বেষণে কবিতাকেও বাঙালি কবি জীবনের সমসগ্রতায় স্পর্শ করেছেন, লোক-ভাষাকে (জসীমউদ্‌দীন, জীবনানন্দ), অন্যদিকে এঁরাই আবার চূড়ান্ত নাগরিক (সুধীন্দ্রনাথ, সমর সেন), এমনকি আন্তর্জাতিক (অমিয় চক্রবর্তী)। আধুনিক বাঙালির শিল্পসাহির্তের অন্বেষণের আর-আর কেন্দ্র যেমন, তেমনি কবিতারও কেন্দ্রস্থল তখন কলকাতা-অবিভক্ত তখনকার বাংলায় পূর্ব বাংলার রূপ নিয়ে উপস্থিত হয়ে তাকে সমগ্রতা দিয়েছিলেন জীবনানন্দ দাশ আর জসীমউদ্‌দীন।

এতোক্ষণ আধুনিকতা বাদীদের ইতিবাদী দিকটির দিকে আলোকপাত করা হল। আধুনিকতা বাদী কবিতার কেন্দ্রভূমি ছিল কলকাতা, এখন ঢাকা তাঁর আবশ্যিক অংশ বৃহত্তর বাংলাদেশকে নিয়ে আছে বাংলাদেশের কবিতা পশ্চিম বাংলা কবিতা তুলনামূলকভাবে কলকাতাকেন্দ্রিক বাংলাদেশের কবিতার শক্তি প্রাণবস্তুতে, প্রতিবাদে, দেশ প্রেম, পশ্চিম বাংলার কবিতার শক্তি, ধারাবাহিকতায়, পরিশীলিত, উপস্থাপনার, নাগরিকতায়, বিশিষ্ট সমালোচনার মতে বাংলাদেশ ও পশ্চিম বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে একটি বিভাজন করেন নিম্নরূপ:

যদিও এটি চূড়ান্ত নয় বলে মত দেন তিনি। এবার আমরা আধুনিকতাবাদের নেতীবাদী মূল সুরগুলো লক্ষ্য করি:

বুদ্ধদেব বসুর আলোচনা প্রচারনাতেই আধুনিকতাবাধ সাহিত্য আন্দোলন মূলত দানা বেধে উঠে। কিন্তু তাঁর বিবেচ্য বিষয়গুলো সর্বাশে সঠিক নয় বলে মত দেন সমালোচক (ইকবাল আজিজ-উত্তরধিকার) বুদ্ধদের বসু রবীন্দ্রনাথের সমকালীন ইউরোপীয় আধুনিকতার সাথে বিচ্ছিন্নতাকে নিয়ে বক্তব্য দেননি। রবীন্দ্রনাথের জীবন বিমুখতা ও আসমানদারিত্ব বিষয়ে আলোচনা না করে তাকে উদার মানবতা বাদী বিশ্ব কবি। বস্তুত এসব ঘটনা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ, সাহিত্যের দু'টি শাখায়

বিদ্রোহ প্রায় যুদ্ধ ঘোষণায় পরিণত হয়েছিল। বাস্তবতার নতুন পসরা নিয়ে নিয়ে 'কল্লোল' কালি কলম-এর পৃষ্ঠায় নতুন কথা সাহিত্যের যে প্রসার পরিলক্ষিত হয়েছিল, তাদের বিরুদ্ধে তার প্রধান অভিযোগ ছিল।

বে আবুতার, অশ্লীলতা, তিরিশের দশকে প্রথম দু-এক বছরের মধ্যে সে সব পত্রিকার অবসান হওয়ায় যে যুদ্ধ শেষ পর্যন্ত শান্তিতে পর্যবসিত হয়েছিল। তাছাড়া তারই আগ্রহে ও পৃষ্ঠপোষকতায় এতদিনে ধীরে ধীরে দেখা দিয়েছেন একে একে তারাশতকর, বনফুল, গোপাল হালদার সহুদ্ধ, বীরূপাক, পরিমল গোস্বামী, শরবিন্দু বন্দোপাধ্যায়ের মতো লেখকরা। বিভূতিভূষণ চট্টোপাধ্যায়, মানিক বন্দোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, প্রমথনাথ বিশী, জগদীশ ভট্টাচার্য প্রমুখ লেখক গোঙ্গীর যথোচিত সম্মান অর্ভ্যথনায় সজনকিান্ত দাসের অগ্রণী ভূমিকার কথাওে অবশ্য উল্লেখ্য। তাঁর ব্যক্তিত্বের আকর্ষণে সমযাময়িত শিল্পীদের মধ্যে অন্যতম দেবী প্রসাদ রায় চৌধুরী, প্রমোদ চট্টোপাধ্যায় কিংবা চৈতন্যদের চট্টোপাধ্যায় তাঁর সঙ্গে আন্তরিকতা স্থাপন করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে 'বঙ্গশ্রী' সম্পাদনার সমসয তাঁর মানসভাবনায় যে পরিবর্তন এসেছিল, তাতে তাঁর বিদুষণের ধরন অনেকটা বদলে গিয়েছিল।

এ কথা স্বীকার করা দরকার, 'বঙ্গশ্রী' সম্পাদনায় সজনীকান্তর স্বরূপ অন্যভাবে বিকশিত হয়েছে- 'বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস' রচনার কাজে সুকুমার সেনকে উৎসাহিত করা তাঁর অন্যতম কীর্তি। আসলে, সাময়িক প্রত্রিকা সম্পাদনার মধ্যে আনন্দ ও কর্তব্য সাধনের যে তৃপ্তি আছে, সেটার প্রতি প্রগাঢ় আকর্ষণে 'চিত্রলেখা', 'বিজলী', 'যুগবাণী', 'নতুন পত্রিকা', 'অলকা', 'যুগান্তর', আনন্দবাজার পত্রিকা' শারদীয়, সর্বোপরি 'সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা'র সম্পাদনায় তিনি নিযুক্ত হয়েছেন।

অতি আধুনিকদের বিরোধিতায় তরুণ কথাসাহিত্যিকদের প্রতি তাঁর উম্মা প্রশমিত হওয়ার কারণ ছিল, বিরুদ্ধবাদীদের প্রায় সকলেই তাঁর দলভুক্ত হয়েছিলেন। কিন্তু তিরিশের দশকে প্রথম প্রকাশিত 'পরিচয়' ও 'কবিতা'কে অবলম্বন করে যে নতুন কাব্য সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল–তার প্রতি তিনি সমর্থন জানাননি/ 'প্রগতি' পত্রিকার প্রধান কবি জীবনানন্দকে আক্রমণ করবার ধরন এই পর্বে তীব্রতা পেয়েছিল আরও কঠিনভাবে সজনীকান্তের অতি আধুনিকতাবাদীদের ভাজনের বিরুদ্ধে ন্যাকমির বিরুদ্ধে, দুর্বল ও অমমের লীলায়িত সৃক্কনীলেহনের বিরুদ্ধে' ধারণা তাঁর মধ্যে এতটাই বদ্ধমুল ছিল যে, ষাটের দশকের শুরুতে, তার জীবনের প্রান্তবেলায় তাই বাংলা কবিতার জনপ্রিয়তা ও অগ্রগতিকে মান্য মনে করতে পারেননি।

নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের সাঁইত্রিশতম অধিবেশনে প্রদত্ত কাব্য সাহিত্য শাখার সভাপতির অভিভাষণে তাই স্বভাবব্যঙ্গচ্ছলে জানিয়েছিলেন: ''আজকাল যে কোনও সাময়িকপত্র, বিশেষ করিয়া একান্তভাবে কবিতার নামে উৎসর্গিত পত্রিকা খুলিলেই কবিতা শিরোনামায় প্রকাশিত বহু বিচিত্র বস্তু দৃষ্টিগোচর হয় যাহার কোটি পাটিগণিত, কোনটি ইতিহাস, কোনটি গদ্য নিবন্ধ, আবার কোনটি বিজ্ঞাপনের খাতে প্রকাশিত হইলে সঙ্গত ও শোভন হইতে ইহার মধ্যে জাল ও ভেজালের সংখ্যাই বেশি।

MšcÄx

১) আলাউদ্দীন আল আজাদ, সাহিত্য সমালোচনা ইতিবৃত্ত ও পরিপ্রেক্ষিত। নবরাগ প্রকাশনী, ঢাকা।

২) আলাওয়াল, পদ্মাবতী (সৈয়দ আলী আহসান সম্পাদিত), আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা।

৩) সৈয়দ আলী আহসান, শিল্পবোধ ও শিল্পচৈতন্য, বাংলাদেশ শিল্পকলা একডেমী, ঢাকা।

৪) অমিয় চক্রবর্তী, শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ, (ফয়জুল লতিফ চৌধুরী সম্পাদিত), মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।

৫) কুন্তল চট্টোপধ্যায়, ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ ও কোলরিজ, নন্দনতত্ত্ব-জিজ্ঞাসা, (তরুণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত), দেজ পাবলিশিং, কলকাতা।

৬) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপধ্যায়, বঙ্কিম রচনাবলী, সাহিত্য সমগ্র, (বিষ্ণু বসু সম্পাদিত)। তুলি-কলম, কলকাতা।

৭) শ্রী ভূদেব চৌধুরী, বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

৮) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সাহিত্যের স্বরূপ, বিশ্বভারতীয় গ্রন্থালয়, কলিকাতা।

৯) জাহাঙ্গীর তারেক, প্রতীকবাদী সাহিত্য, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

১০) বিষ্ণু দে, রবীন্দ্রনাথ ও শিল্প সাহিত্যে আধুনিকতার সমস্যা। প্রতিভাস, কলকাতা।

১১) বুদ্ধদেব বসু, শার্ল বোদলেয়ার: তাঁর কবিতা, নাভানা, কলকাতা।

১২) নরেন বিশ্বাস, ভারতীয় কাব্যতত্ত্ব, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

১৩) জীবনানন্দ দাশ, জীবনানন্দ দাশের প্রবন্ধসমগ্র (দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত)। গতিধারা, ঢাকা।

১৪) সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, সুধীন্দ্রনাথ দত্তের প্রবন্ধ সংগ্রহ (অমিয় দেব সম্পাদিত), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

১৫) অরুণ সেন, বিষ্ণু দে-র নন্দন বিশ্ব, অবসর, ঢাকা।

১৬) হাফিজুর রহমান হাসান (সম্পাদিত), একুশে ফেব্রুয়ারি, দ্বিতীয় সংস্করণ, পুথিপত্র, ঢাকা।

১৭) অশ্রুকুমার সিকদার, আধুনিক কবিতার দিগ্বলয়, পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত তৃতীয় সংস্করণ, অরুণা প্রকাশনী, কলকাতা।

১৮) জীবেন্দ্র সিংহ রায়, আধুনিক বাংলা কবিতা, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ধমান।

১৯) আবুল কাসেম ফজলুল হক, আধুনিকতাবাদ ও জীবনানন্দের জীবনোৎকণ্ঠা, জাগৃতি প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৩

২০) Malcom Bradbury & James MeFarlane, Modernism, Penguing Books Ltd. Middlesex, First Published 1976.

২১) David Crystal, The Cambridge Encyclopedia of Language, Cambridge University Press, Cambridge.

২২) Herbert Read, The Meaning of Art, Pelican Book.

২৩) http://en.wikipedea.org./wiki

২৪) I.A. Richards. Principles of Literary Criticism, First Routledge Classics, London & New York.

mnvqKcÎ cwÎKv

২৫) উত্তরাধিকার, বুদ্ধদেব বসু সংখ্যা, বাংলা একাডেমি।

২৬) কালি ও কলম, আবুল হাসানাত সম্পাদিত।

২৭) একবিংশ, খন্দকার আশরাফ হোসেন সম্পাদিত।

২৮) লোকায়াত, আবুল কাসেম ফজলুল হক সম্পাদিত।

২৯) উলু খাগড়া, সৈয়দ আকরম হোসেন সম্পাদিত।

Dhaka University Institutional Repository